যখন যেমন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

প্রথম মুদ্রণ :
১৫ই আগস্ট, ১৯৫৮

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে :
দিবাকর মুদ্রণ
৫৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০[illegible]

ব্লক :
বি, ডি, কনসার্ন

প্রচ্ছদ চিত্র :
সুব্রত চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

যখন যেমন

প্রথম অধিবেশন

আপনারা আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্বের আমি উপযুক্ত কিনা জানি না। অতীতে আমি বিপ্লবী ছিলুম, তখন আমার কাজ ছিল ধ্বংসের। বোমা, বন্দুক, সত্যাগ্রহ। আমার বয়েস হয়েছে। এই বয়েসে মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়াই সাজে। বললেই ত আর সাজা যায় না। গদিতে গদিয়ান হতে হলে দল চাই, বল চাই, ছল চাই। শুনেছি ভাল জনপদবধু হতে হলে ভাল 'ছেমো-ছলা-কলা' শিখতে হয়। সে যাই হোক এখন কাজের কথায় আসা যাক। বহুকাল আগে এই শহরে সি. এস. পি. সি. এ. নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল—ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনসান অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস। সেই সোসাইটির এখন কি অবস্থা, কি তাঁদের কাজ আমি জানি না। সারা শহরের এখানে ওখানে এখনও কিছু পরিত্যক্ত মরচে ধরা লোহার জলপাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন তার আর কোনও ফাংশান নেই। অতীতের স্মৃতি মাত্র। ঘোড়া নেই, ঘোড়ায় টানা ট্রাম নেই। জলাধারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শহরে এখন যে পশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী তা হল মানুষ। সেই মানুষের ক্লেশ নিবারণের জন্যে আমাদের প্রস্তাব একটি সমিতি স্থাপন, যার নাম হবে, সি. এস. পি. সি. এম, ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনসান অফ ক্রুয়েলটি টু ম্যান। ক্লেশ নিবারণ করতে হলে জানা দরকার, আমাদের কি কি ক্লেশ, কিসে আমরা ক্লিষ্ট। আমি বসছি, সদস্যরা এইবার একে-একে আলোচনা করুন।

মাননীয় সভাপতি, সমবেত পশুগণ, আপনারা জানেন, জানা না থাকলেও জেনে নিন, সারা পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য যে কোনও পশু সম্পর্কে ভয়ানক চিন্তা ভাবনা চলছে। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, হায়না, কুমির, সাপ, পাখি, গিরগিটি প্রভৃতি

সংরক্ষণের জন্যে বিশ্বসংস্থা, প্রাদেশিক সংস্থা, রাষ্ট্রপুঞ্জ জলের মত অর্থব্যয় করছেন. আইন তৈরি করছেন, কি না করছেন। এদিকে মানুষের ক্লেশ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে কলকাতায়। এই শহরে মোস্ট নেগলেকটেড অ্যানিম্যাল হল মানুষ। মোস্ট টরচারড অ্যানিম্যাল হল মানুষ। যে হেতু আমরা দ্বিপদ সেই হেতু আমরা চতুষ্পদদের সুযোগ-সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। দিন-দিন আমাদের বঞ্চনা বেড়েই চলেছে। অন্যান্য পশুরা জন্মেই স্বাধীন, আমরা কিন্তু জন্মেই পরাধীন। দেহের দাসত্ব, পরিবারের দাসত্ব, সমাজের নামের দাসত্ব, অর্থনীতির দাসত্ব। সবচেয়ে বড় ক্লেশ হল এই দাসত্ব। সেই কবিতার লাইন ক'টা আমার এখন মনে আসছে ঃ—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়
কে পরিবে পায়॥

আমাদের যা খুশী আমরা তা করতে পারব না কেন? বাঘ পারে, সিংহ পারে, কুকুর পারে। আমরা দুর্বল, আমরা ভীতু, আমরা অভ্যাসের দাস। কোড অফ কনডাকটের বাইরে গেলেই ছি-ছি পড়ে যাবে– লোকটা নরপশু, পশ্বাচার। এইটাই হল ফ্যালাসি নাম্বার ওয়ান। সাইকো-ল-জিক্যালি আমাদের মেরে রাখা হয়েছে। আপনারা ফ্রয়েডের নাম শুনেছেন। সাহসী মানুষ, তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন—

Most of what we are conscious of is not real and the most of what is real is not in our consciousness.

এখনও জানা গেল না, হোয়াট ইজ 'রিয়েলি রিয়েল'।

আপনাদের কথা আমি জানি না। আপনাদের সামনে আমি নিজেকেই নিজে অ্যানালিসিস করছি। মনে হয় আমার আয়নাতেই আপনাদের চেহারা দেখতে পাবেন। আমার দুটো ভাব, একটা বায়োফিলিয়া। তার মানে লাভ অফ লাইফ। জীবনকে ভালবাসা। তার অর্থ কিন্তু জীবে প্রেম নয়। জিভে প্রেম। নিজের জীবনকে

ভালবাসা। আমি বাঁচতে চাই, প্রভুত্ব করতে চাই, ভোগ চাই, সুখ চাই, সম্পত্তি চাই, ভাল খেতে চাই, পরতে চাই, অধিকার করতে চাই। অনায়াসে সব কিছু পেতে চাই? আমি একটা **homme machine**। এসব ব্যাপারে আমি প্রতিযোগিতা পছন্দ করি না, ভাগাভাগির মধ্যে যেতে চাই না। এই দিক থেকে আমি ডুয়েলিস্ট। আমি আর আমার প্রাচুর্যে ভরা পৃথিবী, এর বাইরে সবাই আমার অপরিচিত। কিন্তু ইয়েস, দেয়ার ইজ এ বিগ বাট। আমি ত আর জায়েণ্ট নই যে সব কিছু নিজের ক্ষমতায় দখল করে নেব। তাই আমার দু'টো দিক, একটা হল হোমো সেকসুয়ালিস, আর একটা হল হোমো ইকনমিকাস।

ফ্রয়েড সায়েবের মডেল অনুসারে আমার মধ্যে দু'টো শক্তি কাজ করছে, একটা হল নিজেকে রক্ষা, সেলফ প্রিজারভেটিভ আর একটা প্রজননেচ্ছা, সেকসুয়্যালড্রাইভ। আমার এই দু'টো ইচ্ছে প্রতিমুহূর্তে খর্বিত, খণ্ডিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত। সমাজ এর ওপর চেপে বসে আছে, সংসার এর মধ্যে গোঁজামিল ঢুকিয়ে দিয়েছে। কালচার মনের মধ্যে ঢুকে দু'টো শুম্ভ নিশুম্ভ তৈরি করেছে— আচার, অনাচার। আমি অসুস্থ, আমি ক্লান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে খণ্ড খণ্ড। কোনটা আচার, কোনটা অনাচার বুঝতে গিয়ে জীবনটাই জেবড়ে গেল। আবার সেই ফ্রয়েডঃ

Society imposes unnecessary hardships on man which are conducive to worse result rather than the expected better ones.

বায়োফিলিয়া থেকে আমার মধ্যে এখন প্রবল হয়ে উঠেছে নেক্রোফিলিয়া। মৃত্যুকেই আমি এখন ভালবাসতে শুরু করেছি— মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। যে অবস্থায় পড়ে মানুষ মৃত্যুকে ভালবাসতে শেখে সেই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এই অবস্থা যাঁরা তৈরী করেছেন তাঁরা কারা। তাঁরা হলেন এক ধরনের পোচার।

কাজিরাঙা ফরেস্টে যে সব পোচার গণ্ডার মারে তাদের জন্যে কড়া আইন তৈরী হয়েছে। আমাদের যারা মারছে তাদের জন্যে কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাই। সাপ্রেসান, অপ্রেসান এসব

কি অপরাধ নয়? অবশ্যই অপরাধ। কে সেই অপরাধী? সভ্যতা। সভ্যতাই হল রিয়েল অপরাধী। 'রিয়েল রিয়্যালটি' হল, আমি একটা পশু। আমি দেবদূত নই, দেবতা নই। একটা জীবন, একটা জীব।

জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে সভ্য করে তোলার জন্যে কম অত্যাচার হয়েছে! কম মগজ ধোলাই দেওয়া হয়েছে আমাকে একটা ক্রীতদাস করে তোলার জন্যে! আমি যদি বাঘ হতুম, গরিলা কি গণ্ডার হতুম, তা হলে কি আমাকে অত সহজে পোষ মানান যেত? যেত না। ভয়ের ব্যাটারি চার্জ দিয়ে সার্কাসের রিং মাস্টাররা আমাদের বশে রেখেছেন, একটি মাত্র সত্তাই আমাদের জেগে আছে—হোমো ইকনমিকাস। নো ওয়ার্ক, নো পে। নো সাবমিসান, নো প্রোমোসান।

ছেলেবেলায় মা বলতেন, কথা না শুনলে কিছু পাবি না। বাবা বলতেন, উনিশের নামতা মুখস্ত না দিতে পারলে খাওয়া বন্ধ। মুখে-মুখে তর্ক কোরোনা, কান ধরে নিলডাউন করিয়ে রেখে দেব, বলতেন শিক্ষক মশাই। বয়েস হলেও ভুলিনি সেইসব দুঃস্বপ্নের দিনের কথা। বাঁদরটাকে মানুষ করার জন্যে জাঁদরেল একজন শিক্ষক চাই। উঠতে বসতে পিটুনিই হল একমাত্র ওষুধ। এই পিঠের ওপর কত কিছুর স্মৃতি চিহ্ন—জুতো, ঝাঁ্যাটা, লাঠি, বেল্ট, দাদুর খড়ম। দুটো কানের দু'রকম লেংথ। ডান কানটা পণ্ডিত মশাই টেনে-টেনে বাঁ-টার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশী লম্বা করে দিয়েছেন। এর থেকে আমি একটা সহজ অঙ্ক পেয়েছি। ব্যাকরণ কৌমুদীর একের চার ভাগ আয়ত্ত করতে কান এক ইঞ্চি লম্বা হয়, পুরোটা আয়ত্ত করতে হলে কানের চেহারা আর মানুষের মত রাখা যায় না, হাতি কিংবা খরগোসের মত হয়ে যায়।

ভেবে দেখুন ভাই সব সেই অতীতের কথা। শৈশবে আমাদের কেউ মানুষ বলে মনে করতেন কি? এই দেখুন আমার শৈশব পরিচয়ের একটা লিস্ট তৈরী করেছি, বিভিন্ন পশুর সমন্বয়ে আমার শৈশব—গাধা, গরু, বাঁদর, হনুমান, শুকর, উল্লুক, পাঁঠা সব মিলিয়ে জানোয়ার। একমাত্র অবতারদেরই একই আধারে এত রূপ কল্পনা করা চলে। প্রেমিকের পক্ষেই প্রেমিকার শরীরে

এতরূপ দেখে গান গেয়ে ওঠা চলে—একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি ত আগে। শৈশবের নামরূপেই আমার রূপ প্রকাশিত। ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন পশুর পশ্বাচারে জগৎ প্রমাণিত করেছি—ম্যান ইজ এ বাইপেড অ্যানিম্যাল উইদাউট এনি উইংস।

এইবার আসা যাক ব্যবহারিক দিকে। কি ভাবে সেই মধুর মানব-শৈশবে আমি ব্যবহৃত হয়েছি। কখনও ফুটবলের মত, কখনও চটি জুতোর মত, পাপোশের মত, তবলার মত, পাখোয়াজের মত, আবর্জনার মত। শরীরের ওপর কোনও স্বাধীনতা ছিল না। যিনি যেভাবে পেরেছেন তিনি সেইভাবে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন—মানুষ জন্মায় না, আদিতে সবাই অকৃত্রিম পশু। শুধুমাত্র নির্বিচার পেটাই আর ধোলাইয়ের সাহায্যেই মানুষ তৈরী হয়।

পৃথিবীতে এখন বর্ষপালনরীতি চালু হয়েছে। এখন চলছে শিশুবর্ষ। শিশু ক্লেশ নিবারণের, শিশু নির্যাতনের নানা কথা শুনতে পাচ্ছি। যদিও আমি শিশুর পিতা তবু আমি আমার নির্যাতিত শৈশবের জন্যে উপযুক্ত বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। সেদিনের সেই নির্যাতিত শিশু আজকের নির্যাতক পিতা, তবু বিচার চাই।

এই সভা আজকের মত মুলতুবি রইল। ক্লেশের ক্ল্যাসি-ফিকেসান ও কোডিং-এর জন্যে প্রয়োজন হলে আমাদের একাধিকবার বসতে হবে। যাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন উঠে বসুন। বাড়ি যান। আজ থেকে প্রত্যেকেই লিখতে থাকুন কার কিসে ক্লেশ!

গত সভায় আমাদের মাননীয় বক্তা অনেক আবোল তাবোল বকেছেন।

বাঙালীর স্বভাবই হল, যারা একটু বলতে-কইতে পারেন তাঁরা আর মাইক ছাড়তে চান না। যদিও এ সভা অ-মাইক। এটাও কিন্তু মনুষ্য ক্লেশের মধ্যে পড়ে। আমরা শুনব না, শুনতে চাইছি না, তবু জোর করে শোনাবার চেষ্টা। দেখো আমি কত বড় পণ্ডিত। কত কি জেনে বসে আছি। বক্তারা চিরকালই শ্রোতাদের ক্লেশের কারণ। এর নাম দেওয়া যাক 'বকর-বকর ক্লেশ'।

যিনি নোট নিচ্ছিলেন, সভাপতি নীচু গলায় তাঁকে বললেন, বাঁদিকে ওপরে লিখুন, 'বকর বকর ক্লেশ', বড় ক্‌... লিখুন, হ্যাঁ, আণ্ডার লাইন করুন।'

এই বকরমবাজদের মধ্যে পুংলিঙ্গও আছে স্ত্রীলিঙ্গও আছে সুতরাং বকরমবাজরা হলেন উভলিঙ্গ জীব। ইংরেজীতে এঁদের বলে—হারমা-ফোডাইট। এঁরা অফিসে সহকর্মী, যানবাহনে সহযাত্রী, মঞ্চে নেতা সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথি, বেতারে বক্তা, গৃহে শয্যাসঙ্গিনী! একবার দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই হল। দম মারো দমাদম।

সভাপতি ফিসফিস করে বললেন, 'শেষ লাইনটা বাদ দিন। ও দমটা গ্রামোফোনের দম নয়, যদ্দুর জানি গাঁজার দম।'

কথা কম, কাজ বেশী, এদেশে তা সম্ভব হল না। চৈত্র মাসে, গাজনের সন্ন্যাসীরা চড়কের দিন জিভে বাণ ফোঁড়েন, এর নাম হল বাণ-ফোঁড়। উদ্দেশ্যটা কি? বাক্যের উৎসস্থলে বাণ মেরে বাক্য-বাণ বন্ধ করা। যে কুকুর বেশী ঘেউ ঘেউ করে তার মুখে মাজল বেঁধে দেওয়া হয়। যে বাছুর সব সময় বাঁটের দুধ খাবার জন্যে বেশী ছোঁক ছোঁক করে, তার মুখে জাল বেঁধে দেওয়া হয়। আমি

স্বীকার করছি, মানুষের মুখের গঠনটাই বেয়াড়া। থ্যাবড়া। শেয়াল বা কুকুরের মত ছুঁচোলো নয়। মাজল পরাবার কোন উপায়ই ঈশ্বর করে রাখেন নি। ঠোঁট দুটো গুণছুঁচ দিয়ে সেলাই করে দিলেই বকরম-বকরম বন্ধ হতে পারে! কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, কাঁদুনে খোকার মুখে যেমন চুষি বা 'সাকার' ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেইরকম একটা কিছু যদি চালু করা সম্ভব হত, তা হলে মন্দ হত না। চুষলেই চাটনি, বেশ নেশা ধরান চাটনি। এত বড়-বড় চুষি, সি এস পি সি এম ছাপ মারা। যেই মনে হবে লোকটা বড় বিপজ্জনক, ক্লেশদায়ক, সুযোগ পেলেই বকতে আরম্ভ করবে, দাও মুখে চুষি পুরে।

যেমন ধরুন কোনও মহিলা এসে বললেন, কত্তার জ্বালায় বাড়িতে আর টেঁকতে পারছি না, চব্বিশ ঘণ্টা বকর-বকর করে পাগল করে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সংস্থার তৈরী স্পেশ্যাল একটা নিপলস তার হাতে তুলে দেওয়া হল। সঙ্গে এক শিশি চাটনি।

সভাপতি প্রশ্ন করলেন, 'কিসের চাটনি? আমের না আমড়ার? মিষ্টি মিষ্টি চাটনি। এমন চাটনি যার মধ্যে কিছু নেশার উপাদান থাকবে। বক বক করার নেশার চেয়েও জোরালো নেশা। ফর্মুলাটা ধরুন এইরকম হবে, কাঁচা আম এক কেজি, চিনি ৫০০ গ্রাম, এক ভরি আফিমের জল, অভাবে পোস্তর খোলা, সেদ্ধ জল, বেলসুঁট চূর্ণ ২০০ গ্রাম। বেল দেবার কারণ, আফিমে একটু কনস্টিপেসান হতে পারে, বেলে সেটা কেটে যাবে। কনস্টিপেসানে বায়ু বেড়ে যায়. বায়ু উর্ধমুখী হলে বকবকানি আরও বেড়ে যেতে পারে।

এখন আম সেদ্ধ করে কাৎ বের করে মিহি মোলায়েম করে ছেঁকে ফেলুন। চিনি রস করে মিশিয়ে দিন। সামান্য জিরে গুড়ো অল্প একটু লঙ্কা, আফিমের জল, বেলচূর্ণ দিয়ে বেশ করে ফুটিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে শিশিতে ভরে ফেলুন। গায়ে লেবেল মেরে দিন—নাম 'ফর্মুলা ১', মনুষ্য ক্লেশ নিবারণী সমিতির মোক্ষম দাওয়াই। বয়স্কদের বকম বকম, কানের কাছে অনবরত হাঁচি অথবা কাশির মতই বিরক্তিকর। ফাঁপা চুষিতে এক চামচে

'ফর্মুলা ১' ভরে কত্তাকে চুষতে দিন, গিন্নীর মুখে গুঁজে দিন, শ্বশুরের মুখে ঠুসে দিন, শাশুড়ীর ঠোঁটে পুরে দিন। অব্যর্থ দাওয়াই! অভ্যাস হয়ে গেলে চুষি একবার ধরে গেলে, কেউ আর বক্তা থাকবেন না, সবাই তখন শ্রোতা।

সভাপতি একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আফিম পাবেন কোথায়, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রোকিউর। এই ত আমার পা ফুলছে বলে, কবরেজ বিধান দিয়েছেন, একগুলি করিয়া সরষেভর অহিফিম দুধসহ সেব্য। তার জন্যে কার্ড চাই, আবগারি বিভাগের পারমিট চাই। তা ছাড়া ওই বস্তুটি যৌবন ধরে রাখে, খিদে বাড়ায়, গালে গোলাপী আভা আনে, মানুষকে মৌতাতে রাখে। কিশোর ন্যাচারাল প্রসেসে যুবক হবে। সংসারে প্রবেশ করবে। ধাক্কা আর মার খেতে খেতে অকালে বুড়িয়ে ঝরাপাতার মত চেহারা হয়ে যাবে। ডিসপেপসিয়া, ন্যাবা, বুক ধড়ফর, কন্যাদায়, পুত্রদায়, পিতৃঋণ সব নিয়ে একদিন অকালে বল হরি হরিবোল। ফিনিশ। সেখানে আফিম ইনট্রোডিউস করে জীবনকে মধুর করে তোলা অপরাধ। আমরা ত আর কনস্টিটিউসানের অ্যাগেনস্টে যেতে পারি না। জীবনবিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়।'

'কোন কনস্টিটিউসান? ভারতীয় সংবিধানের কথা বলছেন, যে সংবিধানের দুশো বার অ্যামেণ্ডমেণ্ট হয়েছে, যে সংবিধানে বলেছে, ইকোয়াল অপারচুনিটিস ফর অল, অ্যামে ফ্রীডাম অফ স্পিচ, ফ্রীডাম ফ্রম পভার্টি স্লেভারি, এট অল।'

'ও নো নো সে সংবিধান অতি পবিত্র বস্তু, পার্লামেণ্ট ছাড়া তাতে হাত দেবার অধিকার কারুর নেই। আমি মিন করেছি আমাদের কনস্টিটিউসান, হিউম্যান সামথিং দেবভোগ্য বস্তু আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। আমি একটা বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছি।'

'হোয়াট ইজ দ্যাট।'

'আমরা কালা হয়ে যাবার সাধনা করি। কথায় আছে, ধরো আর মারো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো অরে ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো।'

'তার মানে আপনি ফাংশানাল ডিজঅর্ডার চাইছেন ?'

'অফকোর্স। ইতিহাসে দেখুন এক-একটা যুগ এসেছে, ডার্ক এজ, গোল্ডেন এজ, রেনেসাঁস, রিভাইভ্যাল অফ রেনেসাঁস, এইভাবে আমরা এসে পড়েছি—এজ অফ ব্রেকডাউনে! রাস্তায় গাড়ি ব্রেকডাউন, পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্রেকডাউন, পেট্রল আর ডিজেল সাপ্লাই ব্রেকডাউন, রেলে ব্রেকডাউন, মর্যাল ব্রেকডাউন, পারিবারিক শান্তি ব্রেকডাউন, সব সার্ভিস ব্রেকডাউন, হেলথ ব্রেকডাউন, সামাজিক কাঠামো, মানুষ মানুষের সম্পর্ক সব ব্রেকডাউন। ডাউন ডাউন, নিলডাউন। হাম হাম গুড়িগুড়ি।'

'সুর করে বলি, ম্যায় চলি, হাম হাম হামাগুড়ি।'

'কিন্তু সভাপতি স্যার, কালা হব বললেই কি হওয়া যায়? শুনেছি বিল্বমঙ্গলবাবু কাম জয় করার জন্যে প্রেমিকার খোঁপা থেকে কাঁটা খুলে নিয়ে চোখে খোঁচা মেরে অন্ধ হয়ে বলেছিলেন, প্রাণপ্রিয়ে দিলুম বারোটা বাজিয়ে, তুমি কে, কে তোমার, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন, পেঁচীও যা পরীও তাই। তা হলে আমরাও কি স্ব-স্ব পত্নীর বাড়-খোঁপা থেকে ইস্টিলের কাঁটা খুলে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করে এককালে সব বধির হয়ে যাব ?'

'না তার প্রয়োজন নেই, বিল্বমঙ্গলের পরিবর্তে কর্ণমঙ্গল কাব্য আর তেমন মার্কেটে চলবে না। শ্রবণশক্তি ইতিমধ্যেই নয়েজ পলিউশানে কমে আসছে। নেতারা চোঙা ফুঁকে প্রায় আধকালা করেই দিয়েছেন। আর একটু ধৈর্য ধরতে পারলেই ফুল-কালা হয়ে যাব। এর মাঝে আর একটি পথ আছে—অভ্যাসযোগ। শুনেও শুনব না, দেখেও দেখব না।'

'রাইট। রকে বসে ছেলে আমার স্যাঙাতদের নিয়ে খুব গুরু গুরু করে যাচ্ছে। ভীষণ ইরিটেশান হচ্ছে ভেতরে ক্লেশ, ভীষণ ক্লেশ...'

'গুরুর নাম শুনে ক্লেশ ?'

'আজ্ঞে এ গুরু সে গুরু নয়। এই জেনারেশানের কথার ধরন। একদিন কি একটা কথা বললুম, উত্তর দিলে, কি যে বল, গুরু। অবশ্য তক্ষুণি সামলে নিয়ে সরি বলেছিল, গর্ভধারিণী মাকে একদিন বলে বসল, হায় সখি।'

'ও, এই ব্যাপার। হ্যাঁ, এখানে অভ্যাসযোগ চলবে। শুনেও শুনবেন না।'

'যেমন ধরুন মাসের শেষে। সকাল থেকেই স্ত্রী বলছেন, শুনছ বড় জামাই আসছে কানপুর থেকে, শুনছ বড় জামাই। সকালের চায়ের সময় বড় জামাই, বাথরুমে ঢোকার মুখে বড় জামাই, অফিসে বেরোবার সময় বড় জামাই, লাস্ট বিছানায় শুয়ে মাঝরাতেও বড় জামাই! শেষে তেরিয়া হয়ে বলতেই হল, মানে মুখ ফকসে, সরি ফকসে নয় ফসকে বেরিয়ে পড়ল—বিগজামাই আসছে ত আমার বাপের কি! সঙ্গে-সঙ্গে আবিষ্কার করলুম, আমি আর খাটে নেই। মশারি ঝুলে লাল মেঝেতে।'

'ভুল করেছেন? সকাল থেকে যেমন বধির ছিলেন, তেমনি থাকাই উচিত ছিল। একটা টোটকা শিখে রাখুন, যখনই কোনও ক্লেশদায়ক কথা শুনতে থাকবেন, তখনই মনে-মনে গুনগুন করতে থাকবেন, আমি বনফুল গো, আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে, আমি বন '

তৃতীয় অধিবেশন

'সভার কাজ তাহলে শুরু করা যাক, বলে সভাপতি হুঁকুকু হুঁকুকু করে কেশে উঠলেন। সিজন চেঞ্জ। কাশি হয়েছে। সম্পাদকের চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। পেছন থেকে কে চেপে ধরেছিল ছেঁড়া স্ট্র্যাপে নীচু হয়ে একটা পেপার ওয়েট ঠুকে-ঠুকে ড্রয়িং পিন লাগিয়ে টেমপরারি মেরামত করতে-করতে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু করে দিই।' টেবিলের তলা থেকে পুরনো খানকতক চেয়ারের গা বেয়ে সম্পাদকের সমর্থন সভ্যদের কানে এল।

'জুতোর আবার কি হল'?

'আর বলেন কেন ম্যাগনাম সাইজের এক মহিলার পদপাতে স্ট্র্যাপ ফটাস। এতটা রাস্তা স্রেফ টানতে-টানতে এসেছি। এখন দেখছি যদি কিছু করা যায়।'

'ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন ও আপনার কম্ম নয়। যার কাজ তার সাজে। উঠে চেয়ারে বসুন।'

'দাঁড়ান এক মিনিট, একটা হাতুড়ী পেলে এতক্ষণে হয়ে যেত। গোলাকার পেপারওয়েটে তেমন জোরাল ঠোক্কর লাগাতে পারছি না।

সভাপতি আর এক পশলা কাশি ছাড়লেন। ছেড়ে বললেন, 'আজ একটু সকাল-সকাল সভা শেষ করতে হবে। তোমার ওই পাদুকাপর্ব এখন রাখ। রমণী আর চটি দুই বস্তুই সহজে বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। যত ঠুকবে ততই বিগড়োবে।'

'কথাটা বড় জব্বর বলেছেন কিন্তু। মনুষ্য জীবনের দুটি ক্লেশ, রমণীয় রমণী এবং এই চটি। অপরিহার্য অথচ অবাধ্য। সৃষ্টিরক্ষার জন্যে সব স্পিসিজেরই মেল ফিমেল প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজন ফুরোবার পরও এই যে টেনে-টেনে চলা এর কি কোনও প্রতিকার নেই।'

'অবশ্যই আছে।'

'যেমন ?'

'যেমন মাকড়সা। স্ত্রী মাকড়সা প্রয়োজন মিটে গেলেই, পুং মাকড়সাকে খেয়ে মুখ মুছে জালের ভেতর গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। চলো আও কোন আয়েগা আ যাও।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন স্ত্রী মনুষ্য বিশেষ একটি সময়ের পরে পুং মনুষ্যকে কড়মড়িয়ে শেষ করে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বলবে, আ যারে ম্যায়তো কবসে খাড়ী হুঁ। হরিবল, সিম্পলি হরিবল। ভাবা যায় না দাদা।'

'ভাবা যায় না দাদা। সত্যি কথা বললেই হরিবল। মাকড়সা তৎক্ষণাৎ যা করে মহিলা মনুষ্য সেই একই কাজ ধীরে-ধীরে ওভার দি ইয়ার্স সিসটেমেটিক্যালি করে। কেন তুলসীদাস মনে নেই ঃ

দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউড়া হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

বিশুদ্ধ বাংলায়, যে দিবাভাগে মোহিনীসদৃশী ও নিশাভাগে বাঘিনীতুল্য হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে দেহের শোণিত চুষিয়া খায়, জগতের লোকে উন্মত্ত হইয়া প্রতি গৃহে সেই বাঘিনীকে প্রতিপালন করিতেছে।

সম্পাদক জুতো মেরামতের ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে মনমরা হয়ে বসে ছিলেন, তিনি এইবার সোৎসাহে বললেন, ঠিক বলেছেন। রাতের কথা ছেড়ে দিন, সে অনেক কথা, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে, বলতে হবে, দোষ কারোও নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, এই দিবাভাগেই দেখুন না, পেছন থেকে চেপে ধরে চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে দিলে। কি করতে পারলুম ! নাথিং শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ! লাল করমচার মত দুটি ওষ্ঠ। নাভিদেশ ঘিরে গোল করে বিন্দু বিন্দু চন্দনের ফোঁটা। ফিনফিনে ছাপা শাড়ি। বাতাসে সুগন্ধ। এ্যারম করতে-করতে, এ্যারম করতে করতে, নাচতে-নাচতে, দুলদুলের ঘোড়ার মত চলে গেল। গ্রাহ্যই নেই। যেন চটি ছেঁড়ার জন্যই জন্মেছেন। অথচ···

সভাপতি হাত তুললেন, থামানর ইঙ্গিত, স্টপ-স্টপ। এ সম্পাদক শুড রিমেন নন কমিট্যাল। কাগজে চিঠিপত্রের কলমে লেখা থাকে দেখেনি, মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নহে।'

'না, আমি থামব না, আমার ভীষণ ফিলিংস এসে গেছে। সম্পাদক হলেও আমি একটা মানুষ ত। ডাউন দি মেমারী লেন আমাকে বছর তিনেক পেছিয়ে যেতে দিন। সেই দিনটা আমি কিছুতেই স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। ডান গালে হাত বোলালে এখনও পেরেকের দাগ।'

'পেরেকের দাগ!'

'ইয়েস, পেরেকের দাগ, জুতোর কাঁটা পেরেক।'

'নিজের কেরামতি বুঝি। নিজের গালটাকেই স্যাণ্ডেল ভেবে ঠোকাঠুকি করেছিলেন।'

'অফকোর্স নট। আই অ্যাম নট দ্যাট ফুল। জনৈকা মাজা সুন্দরী গালে পাদুকাঘাত করেছিলেন।'

'মানে জুতো মেরেছিলেন।'

'ইয়েস জুতো।'

'কে সেই জুতো মারা সুন্দরী, 'ইওর ওয়াইফ!'

প্রোভোকড্ অর অনপ্রোভোকড্? টিজ করেছিলেন? তখন কি আপনি কলেজে পড়তেন?'

'আমার এখনকার বয়েস দেখলে তাই মনে হয় কি! এই ধরনের বোকা বোকা কথাও ভয়ঙ্কর ক্লেশের কারণ। এ বোকা শুড রিমেন সাইলেণ্ট।'

'আমি বোকা।'

'আপনি ইডিয়ট।'

'আপনি ক্রিস্টালাইজড ইডিয়েট। চরিত্রহীন।

'লম্পট।'

'লম্পট।'

'ইয়েস লিচেরাস, ট্রেচারাস, তা না হলে একজন অপরিচিতা মহিলা পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আপনাকে হঠাৎ জুতো মারতে যাবে কেন। নিজের স্ত্রী হলে কিছু বলার ছিল না, যে হাত সোহাগ করে যে হাত পেঁপে, কাঁচকলা দিয়ে মাছের ঝোল

বাঁধে, সে হাত জুতোও মারতে পারে, মারার অধিকার আছে, বাট ..।'

'ব্যাট। ইও আর এ ঘৃণ্য স্ত্রৈণ। চটি লেহী নিন-কম-পুপ স্বামী।'

'হ্যাঁ, তাই তাতেও গৌরব আছে। আপনার মত পরনারীর পশ্চাদ্ধাবন করে গালে জুতো ইনভাইট করতে চাই না। আই হেট দ্যাট। জুতো মারনেঅলা যখন বাড়িতেই আছেন, তখন হোয়াই শুড আই হ্যাংলার মত গো টু আদারস।'

সভাপতি ট্যাপ ট্যাপ করে টেবিলের ওপর বারকয়েক নস্যির ডিবে ঠুকে শব্দ করলেন, 'অর্ডার, অর্ডার। এটা কি হচ্ছে। এভাবে চললে মনুষ্য ক্লেশ নিবারণের ক্ষমতা কারুর বাবার সাধ্যে হবে না। ঠাকুরই বলে গেছেন, জগৎ হল একটা আস্ত পেঁয়াজ। খোসা ছাড়িয়েই যাও, শেষে কিসু্য পাবে না। এ দুনিয়া ধোঁকার টাটি।'

'হু ইজ দ্যাট ঠাকুর। দারুণ বলেছেন।'

'হে হে বাবা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস। যাক আসল ইস্যুটাই গুলিয়ে গেল। নো মোর উত্তেজনা। তবে জানা দরকার সম্পাদক কেন জুতো খেয়েছিলেন তিন বছর আগে। মধ্যবয়েসে জুতো, আনইউজুয়াল ব্যাপার। ছাত্রজীবনে হলে কেসটা অন্যরকম হত। জাস্টিফায়েবল ভাইস। হি মাস্ট বি অ্যালাউড টু ডিফেন্ড হিজ ক্যারেকটার। তিনি যে ক্লেশ পেয়েছিলেন, তা কারণে না অকারণে। অকারণে হলে আমাদের প্রসিডিংস-এ নোট করা হবে। গো অন. কনটিনিউ ইন সেলফ ডিফেনস।'

'হাতিবাগান।'

'ইয়েস হাতিবাগান।'

'সময় সন্ধ্যা।'

'কাল? মিনস ঋতু।'

'বসন্ত।'

'আই সি, আই সি।'

'আই সি, আই সি করে লাফাবার কিছু নেই। কলকাতায় তেমন উতলা বসন্ত আসে না, মানুষ তেমন কাককু নয়, যে বসন্ত এলেই খাঁচায় বন্দী থেকেও কুহু কুহু করে উঠবে, তেমন ফ্যারিয়া

আর যে বায়োলজিক্যাল ইমপালসে ভাদ্র এলেই কেঁউ কেঁউ করবে।'

'কি বলেরে মানুষের সারা বছরই ত ভাদ্র।'

'ইয়েস সারা বছরই ভাদ্র, দ্যাটস ট্রু তবে বসন্ত শুনে আই সি, আই সি করার কি আছে। আমি কি মোগল সম্রাট, না বৃন্দাবনের কেষ্ট ঠাকুর। আই স্টে নিয়ার হাতিবাগান।'

'বেশ ত, হাতিবাগানে স্টে করেন বলে সাত খুন মাপ না কি! জানেন দ্যাট ইজ এ বাজার এলাকা। কত নিরীহ মহিলা সেখানে বাজার করতে যান, অ্যাণ্ড এ ডেনজারাস ক্যারেকটার লাইক ইউ···।'

সভাপতি বাধা দিলেন, 'ব্যাপারটা আবার ঝগড়ার দিকে চলে যাচ্ছে কিন্তু। সম্পাদক ইউ গো অন।'

'আমি ত যাচ্ছিলুমই।'

'অ্যাণ্ড আই ওয়াজ ফলোইং।'

'আঃ আবার বাধা।'

'আচ্ছা চলুন, চলুন।'

'বাস থেকে নেমে আমি হন-হন করে হাঁটছি, ভীড় বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে।'

'হন হন করে কেন? নর্মাল স্পিডে নয় কেন?'

'প্রকৃতির ডাকে!

'আই সি, শুনলেন সবাই? নিজেই বললেন, প্রকৃতির ডাকে।' ধ্যার মশাই, আচ্ছা বুদ্ধু ত? এ প্রকৃতি সে প্রকৃতি নয়। নেচার নেচার, নেচারস কল। দেশী শব্দটা সভায় বলা যায়!'

'আই সি।'

'হ্যাঁ, আই সি, সারাজীবন দেখেই যান, কিছু বুঝে আর দরকার নেই।'

'আচ্ছা আচ্ছা তারপর কি হল বলে যান।'

'হন হন করে হাঁটছি। বড় বড় পা ফেলে হঠাৎ কি হল আমার ডানপায়ের ডগাটা সেই মহিলার চটির পেছন দিকটা কুটুস করে চেপে ধরল।'

'কুটুস করে ত কামড়ায় শুনেছি, চেপে ধরে নাকি! অক্লেশে যত্রতত্র যাতা বিশেষণের প্রয়োগ।'

'এই লোকটি বড় ইনটারাপ্‌সান করেন।'

'ঠিক বলেছেন বিরোধী দলের এম এল এ হবার যাবতীয় গুণ এঁর মধ্যে বর্তমান।'

'অথবা স্ত্রীজাতির। বুঝলেন, হয় এম এল এ না হয় স্ত্রীলোক দুটোর যে কোন একটা হবার চেষ্টা করুন।'

'চটিতে পা পড়তেই তিনি সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার মত হলেন, কিন্তু পড়লেন না। যদি পড়ে যেতেন তাহলে আমাকে হাত ধরে তুলতে হত এবং যদি তুলতে হত তাহলে আমাকে দুহাত ধরেই তুলতে হত। একহাতে আমি তুলতে পারতুম না কারণ তিনি ছিলেন বেশ ওজনদার টাটকা মহিলা। তাহলে আমি দুহাতেই তুলতুম এবং জনসাধারণ দেখতেন। বলা যায় না হয়ত কোনো চেনা লোক দেখতেন এবং বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে রিপোর্টিং করতেন। তারপর কি হত, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।'

'সভাপতি মহাশয়!'

'বলুন।'

'এই মনুষ্যটির কথায় একটি জিনিস অতি প্রকট সেটি হল উদ্বেগ, সেই উদ্বেগের উৎস স্ত্রীজাতি। একটি স্ত্রীলোক পথে যাঁর চটির পেছন দিকটা উনি ডানপায়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছেন, দ্বিতীয় স্ত্রীলোক গৃহে যিনি এই মনুষ্যটির গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এখন প্রশ্ন হল, বেসিক প্রশ্ন স্বামীরা কি স্ত্রীর কেনা গোলাম। আমরা কি জরুকা গরু।'

'একটু ব্যাকরণগত ভুল হল বোধহয়। বলুন আমরা কি জরুকা বুল।'

'নো-নো, বুল বললে অসহায় অবস্থাটা তদ্রূপ প্রস্ফুটিত হয় না। বুল অনেক বেপরোয়া, অনেক স্বাধীন নিঃশঙ্ক। ইংরেজীতেই বলি বাঙলায় বললে অশ্লীলতার দায়ে পড়ে যাব। এ বুল ক্যান চেঞ্জ এনি কাল। বরং বলুন জরুকা বলদ। খাটাসীনা স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে ভক্ত স্বামী গাইছেন—মা আমায় ঘুরাবি কত এমন চোখ বাঁধা শ্বশুরের বলদের মত।'

'শ্বশুরের বলদ আবার এল কোথা হতে। গানে আছে কলুর বলদের মত।'

'ওই ত ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া না করার ফল। বাঙলা পাঠশালা কি টোলে পড়লে ওই রামপ্রসাদ পর্যন্তই যাওয়া যায়। ইংলিশ ফোক ব্যালাডে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে মেয়ে গান গাইছে, মাই ফাদার উইল পারচেজ এ বুল ফর মি লালা টালালা।'

'আই সি, আই সি।'

'আবার দেখার মত কি হল আপনার, বেশ ত চুপ চাপ ছিলেন এতক্ষণ।'

'এতক্ষণে অরিন্দম কহিল বিষাদে, এ ফিউ ডেজ ব্যাক, টৌরিফিক দাম্পত্য কলহের সময় আমার স্ত্রী বললেন, বাবা পয়সা খরচ করে একটা ষাঁড় কিনে এনেছেন।'

'সেকি?'

'ইয়েস শি সেড দ্যাট।'

'বব না লম্বা?'

'তার মানে?'

'স্ত্রীর ডেসক্রিপসান, কি জাতীয় স্ত্রী, ববকরা চুল না বড়-লোকের বিটি গো লম্বা লম্বা চুল।'

'না বব, না লম্বা, বেঁড়ে রেগে সব চুল উঠিয়ে ফেলেছে, এক সময় অবশ্য এই চুলের ঢল ছিল।

'হাই না ফ্ল্যাট'?

'তার মানে?'

'হাই হিল না ফ্ল্যাট হিল জুতো?'

'ও আই সি। এক সময় হাই ছিল, তাতে আমার চেয়ে দু ইঞ্চি হাইট বেড়ে গেল। দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোলে রকের ছেলেরা টণ্ট করত, এ ল্যাম্ব, এ ল্যাম্ব। স্ত্রীর ভেড়া হয়ে বাঁচতে চাই না। আমিও হাইট বাড়িয়ে নিলুম, এক ইঞ্চি ওপরে উঠে গেলুম। সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রী আরও হাফ বেড়ে গেলেন। কে হারে, কে জেতে। ভগবান আছেন মশাই। গীতায় বলেছেন, স্ত্রীজাতির অহঙ্কার খর্ব করার জন্যে পুরুষ জাতির সম্ভ্রম রক্ষার্থে সম্ভবামি যুগে যুগে।'

'এটা আবার গীতায় পেলেন কোথায় ?'

'কতরকম গীতা আছে জানেন কিছু ? এই আশার বাণী আছে স্বামী গীতায়। মনে রাখবেন অর্জুন শুধু যোদ্ধা ছিলেন না, সংসারীও ছিলেন, নট ওয়ান ওয়াইফ সেভারেল ওয়াইভস। ন্যাগিং ওয়াইভস। এক দ্রৌপদীকে সামলাতেই পাঁচ পাঁচটা স্বামীর হাতে হারিকেন।'

'সে ত যুধিষ্ঠিরের জন্যে। বেচারা আফিং খেয়ে দাবায় বসলেন অ্যাণ্ড লস্ট হিজ লিমিটেড ওয়াইফ।'

'যুধিষ্ঠির আফিং খেতেন, হু টোলড ইউ, স্ল্যাণ্ডার অ্যাগেনস্ট শাস্ত্রস।'

'ধীরে যামিনী ধীরে। দুই আর দুইয়ে চার। অত প্রবলেম তবু যুধিষ্ঠির দাবায় বসলেন, কেন বসলেন ? ফ্রাসট্রেশান, কেন ফ্রাসট্রেশান, পেটের গোলমাল, অ্যামিবায়োসিস।'

'এ তথ্য আবার কোথায় পেলেন ?'

'অ্যাজাম্পসান। তখন ফিলটারড ওয়াটার, ক্লোরিন এসব ছিল না, পুকুর পানি, সেই পানিতে শত শত অদৃশ্য প্রাণী অ্যাণ্ড ক্রনিক আমাশা, ন্যাচারালি দুর্বল, দুর্বল বলেই ধার্মিক, সত্যবাদী। পেটের ব্যামোর সবচেয়ে প্রাচীন ওষুধ আফিং, আফিং মানেই ইমপোটেন্সি, অ্যাণ্ড দ্যাটস হোয়াই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কৃষ্ণের আবির্ভাব, ভীমের গদাযুদ্ধ, অর্জুনের বিষাদযোগ।'

সভাপতি সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সভা আজকের মত এখানেই পণ্ড হল'।

চতুর্থ অধিবেশন

'গত সভা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আমার একটু তাড়া ছিল। কেন ছিল তাও আমি অকপটে ব্যক্ত করছি। আমার গৃহিণী নাইট শোয় সিনেমা যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।'

'কি সিনেমা? বাংলা না হিন্দি, ধর্মীয় না সামাজিক?

সভাপতি হাসি হাসি মুখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকালেন, হিন্দি সিনেমা অবশ্যই, কারণ ওই বস্তুটিই একমাত্র ফর্মুলা যাতে প্রেম আছে, সংগীত আছে, আকাশ আছে, বাতাস আছে, জরা আছে, যৌবন আছে, প্রাচুর্য আছে, দারিদ্র্য আছে, সবার ওপরে আছে অধর্মের পরাজয়, ধর্মের জয়।'

'কি বই, কোন হল?'

'বইয়ের নাম, ডোন্ট নো, জানি না। হল নয় প্রতিবেশীর বাড়ি, টি, ভি, ছবি।'

'আপনার ভূমিকা?'

'আমার ভূমিকা, বাড়ি পাহারা দেওয়া এবং বেবি সিটিং।'

'এখনও আপনার বেবি? বিলম্বে বিবাহ অথবা...।'

'কোনটাই নয়। আমার নাতি, গ্র্যান্ড সান।'

'কেন পুত্রবধূ কি উদাসীন।'

'না তিনি শশ্রূমাতার অনুগামী। এই একটি ব্যাপারে দুজনের অদ্ভুত মিল। রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু।'

'স্ত্রী এবং পুত্রবধূ দুজনকেই কি আপনি ভাল্লুক বলতে চাইছেন।'

'আজ্ঞে না, দুজনেই রত্ন। স্ত্রী রত্ন। কিন্তু এ সবই হল সভাবহির্ভূত প্রসঙ্গ। সভার কাজে ফিরে আসা যাক।'

'সম্পাদক, সম্পাদক কোথায়?'

'এই তো এসে গেছেন। সুদীর্ঘ পরমায়ু।'

'কি হে বিলম্বের হেতু ! তোমার আঙুলে ব্যাণ্ডেজ কেন ? আঙুল হাড়া ?'

সম্পাদক বসতে-বসতে বললেন, 'আঙুল-হাড়া নয়, আঙ্গুলের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছি।'

'সে আবার কি ! আলুরই তো খোসা ছাড়ায়, তোমার আঙুলটা আলু না কি হে।'

'ধরেছেন ঠিক, আলুর খোসাই ছাড়াতে গেসলুম, গিয়ে আঙুলের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছি।'

'গৃহিণী কি ধর্মঘট করেছেন ?'

'আজ্ঞে না, তিনি হেড মিসট্রেস হয়েছেন।'

'হাইলি ইণ্টারেস্টিং। কারুর স্ত্রী হেড মিসট্রেস হলে তাকে কি আলু ছাড়াতে হয়।'

'তা হলে খুলে বলি। ব্যাপারটা হল এই রকম। আমার একার রোজগারে সংসার চলে না. আমার স্ত্রী ফরচুনেটলি একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। সকালে স্কুল। ভোর সাড়ে পাঁচটায় তিনি বেরিয়ে যান। আমি চা করে দি, ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দি। কোলের ছেলেটাকে খাঁচায় ভরে, তার ওপরেরটাকে পাহারায় রেখে বাজারে যাই। ফিরে এসে দ্রুত কুটনো কেটে বাটনা বেটে, দুধ জ্বাল দিয়ে, ডিমের ডালনা ভাত ইত্যাদি রাঁধি। দাড়ি কামাই, দুধ খাওয়াই। মাছের লোভ, কাটতে জানিনা। তাই নেমন্তন্ন-বাড়িতে চেয়ে চেয়ে ছ-সাত পিস মাছ খাই। খেয়ে পরের দিন কাত হই। তার পরের দিন অফিসে যাই। দিস ইজ মাই লাইফ।'

'অ্যাণ্ড লাইফ ইজ লাইক দ্যাট।'

'দুঃখ করো না যদু, রাম-শ্যাম-যদু-মধু, টম-ডিক-হ্যারী, সকলের জীবনেই এমনি কিছু কিছু কাঁটা খোঁচা মেরে আছে। লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোজেস। গোলাপের সঙ্গেই কাঁটা থাকে। গালিব সাহাবকে স্মরণ করুন ঃ

কয়দে হায়াৎ ও বন্দে গম, আসল মে দোনো এক হ্যায়।
মওৎ সে পহলে আদমী. গম মে নেজাৎ পায়ে কিঁউ।'

'কিস্যু বোঝা গেল না।'

'বাঙলা করলেই বুঝবেন—জীবনের বন্ধন আর দুঃখ বন্ধন,

দুটোই এক। মরার আগে দুঃখ থেকে পার পাবার উপায় নেই দাদা, চিতাতেই চরম শান্তি। এই দেখুন আমার দুটো হাত, বাম হস্ত আর দক্ষিণ হস্ত।'

বক্তা জামার আস্তিন গুটিয়ে দুটো হাত সভার সামনে তুলে ধরলেন। এগজিবিট নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'হাতে আবার কি হল মশাই, মাশুল না হস্তশূল ?'

'ভাল করে দেখুন, দেখে বলুন, এনি ডিফারেনস ? ইয়েস দেয়ার ইজ এ ডিফারেনস। বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতটা মোটা।'

'হ্যাঁ। তাই তো ঠিকই তো। কেন এমন হল। আপনার বাঁ হাতের কারবার কি তেমন চলে না, উৎকোচ ইত্যাদি।'

'দিস ইজ অ্যানাদার স্টোরি। তা হলে শুনুন। নাইনটিন ফিফটিতে আই গট ম্যারেড।'

'লাভ অর নেগোসিয়েটেড ?'

'বর্ণে না অসবর্ণে ?'

'নর্মাল, নর্মাল। নর্মাল ডেলিভারির মত নর্মাল ম্যারেজ। কিন্তু আনফরচুনেটলি ছানা কেটে গেল।'

'সে কি মশাই, বিবাহ কি দুগ্ধ, বাসী হলেই ছানা কেটে যাবে। না হরিণঘাটা, ছানা কেটেই আসবে।'

'প্রেসার-প্রেসার। প্রেসার কুকারের মত ভালভ খুললেই তিন তিনবার সিটি। বউয়ের ঠোঁট ফাঁক হলেই ফ্যাসস, বাড়ি মাত। সবেতেই তেনার অসন্তোষ।'

'তা অমন প্রেসার কুকারের মত বউ বিয়ে করলেন কেন ?'

'এ ব্যাপারে এক এক একসপার্টের এক এক মত। আহা বিয়ের পরেই ত প্রেসার কুকারের মত হয়ে গেল। শাশুড়ী বলেন, মেয়ে তো আমার অমন ছিল না বাবা, একটু রাগী ছিল, সামান্য বায়না-টায়না করত, কোনও জিনিস মনে না ধরলে, পা ঠুকে ঠুকে খানিক কেঁদে সারাদিন ঘাড় কাত করে গোঁ হয়ে বসে থাকত, সেই সময় অবশ্য তালে তাল রেখে না চলতে পারলে খামচে টামচে দিত, কাপ ডিশ ছুঁড়তো। তা সে রেগে গেলে কে না অমন করে। খোঁচাখুঁচি করলে মরা বাঘও হালুম করে ওঠে। আর হবে নাই

বা কেন, আমার হাই, বাপের হাই, বংশটাই হাই, হাই ফ্যামেলির হাই-হাই ব্যাপার।'

'তা হলে দেখছেন, বিবাহের পূর্বে কত কি দেখা উচিত, ফ্যামিলি হিসট্রি, হেরিডিটি, প্রেসার, সুগার, দাঁত-চোখ-নাক-কান, ব্লাড ইউরিন, স্পুটাম, স্টুল, মাণ্টু একসঙ্গে ইর্সাজি।'

'তার মানে মেডিক্যাল বোর্ড বসানো উচিত।'

'অফ কোর্স। ব্যাপারটা যখন সারা জীবনের তখন মাল টেস্ট করে নেওয়াই উচিৎ। এই তো আমার ফার্মে যে সব মাল কেনা হয় সব স্যাম্পেল আগে ল্যাবরেটারিতে টেস্ট করে রিপোর্ট দেখে তারপর কেনা হয়।'

'থামুন। ও সব টেস্ট মেস্ট আমাকে দেখাবেন না। আমার এক জানা কেমিস্টের কলকাতায় দুটো বাড়ি হয়ে গেল। টু বিগ হাউসেস। সেরেফ সাপ্লায়ারের পয়সায়। একটা করে বড় পাত্তি ছেড়ে দিলেই অচল মাল সচল।'

'যেমন প্রেমে। প্রেম হল আঁধি। ব্লাইণ্ডিং এফেকট অফ লাভ। প্রেমিকের চোখে ঘেঁটু ফ্লাওয়ারও লোটাস।'

'আহা, এনার তো প্রেম নয়, ফিফটিতে প্রেম তো এমন বুবোনিক প্লেগের মত ঘরে-ঘরে, মনে মনে, জনে-জনে, ছড়িয়ে পড়েনি। প্লেগও গলায়, প্রেমও গলায়। প্রেমের ফাঁস পরেছি গলে, এমন আড়াই হাত জিভ সামনে পড়েছে ঝুলে।'

'আই থিংক।'

'কি থিংক!'

'আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথি ক্যান সলভ দি প্রবলেম।'

'আমার বউকে আমি বিশাল হোমিওপ্যাথি দেখিয়েছি। এক এক চোটে সিক্সটি ফোর।'

'না-না, আমি তা বলছি না হোয়াট আই মিন টু সে, বিয়ের আগেই বিফোর ম্যারেজ, একটা ডোজ।'

'সে আবার কি। অসুখ না জেনেই ওষুধ। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ।'

'আহা পুরোটা না শুনেই উত্তেজিত হন কেন! শুনুন প্রকৃত অভিজ্ঞ ডাক্তার মানুষের মুখ দেখেই মাল চিনে ফেলেন। ডক্টর

রায়ের কথা মনে নেই। দশ হাত দূর থেকেই রোগ ধরে ফেলতেন। চেম্বারে রুগী ঢুকছে না ত রোগ ঢুকছে। আড়চোখে অ্যানাটমিটা একবার দেখে নিলেন। ইয়েস লিভার ঝুলে কুঁচকির তলায় লতর পতর করছে। গলব্লাডার থেবড়ে গেছে কি হার্ট এনুসের কত ফুলে উঠেছে, হাড়ে হাড়ে আর্থাইটিস ঘুণ পোকার মত কটর মটর করছে, ব্রেন একবগগা হয়ে গেছে।'

'ডকটর রায়ের মত ডাক্তার এ যুগে পাচ্ছেন কোথায়। পেলেও বাবা তারকনাথের মত অবস্থা। চেম্বারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে, ভোলেবাবা পার লাগাও।'

'সেই জন্যেই তো হোমিওপ্যাথি। হোমোইয়স মিনস লাইফ। প্যাথস মিনস ফিলিং তার মানে একাকার অনুভূতি। একজন হোমিওপ্যাথের চোখে মানুষ হল 'সোরা', যেমন ঋষির চোখে মানুষ হল কামিনী-কাঞ্চনের দাস, ব্যবসায়ীর চোখে গলায় চাকু চালাবার মুরগি। পলিটিসিয়ানের চোখে ব্যালট পেপার। সেই রকম সব মানুষই সোরা না হয়··।'

'হোয়াট ইজ সোরা। সোরা, গন্ধক আর কাঠ-কয়লা, বাজির মশলা। সোরা মিনস একসপ্লোসিভ। তার মানে মানব হল সোরা, মানবী হল গন্ধক, দুয়ে মিলে গানপাউডার।'

'আজ্ঞে না, সে সোরা নয়। মানুষের নেচার, মানুষের অসুখ কনট্রোল করছে তার হেরিডিটি। বংশানুক্রমে বিষাক্ত রক্ত লক্ষ লক্ষ রুগী তৈরি করে চলেছে। ফর একজামপল ইওর টাক, রেসপনসিবল সোরা। আমার রাতকানা চোখ, সোরা, সম্পাদকের ব্লাড প্রেসার সোরা, সভাপতির হাঁপানি সেই সোরা।'

'কি তখন থেকে সোরা-সোরা করছেন, কবরেজ মশাই আমাকে বলেছেন, দেয়ার আর ওনলি থ্রি থিংস, জানবা। তিনটি মাত্র জিনিস, বায়ু পিত্ত আর কফ। মধ্যমা, অনামিকা আর তর্জনি পাশাপাশি নাড়ির ওপর স্থাপন করিয়া কায়মনে অনুভব করো। কোন নাড়ি বেগবান, বায়ুর কি পিত্তের, কি কফের।'

'ও হল ভৌতিক চিকিৎসা, বার্ধক্যের সান্ত্বনা। হোমিওপ্যাথির রুট চলে গেছে ইতিহাসে, শিল্পে, অলঙ্কার শাস্ত্রে, আমরা পেট থেকে স্ট্রেট নেমে আসছি এক একটি সিমটমের আকারে।

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা নয়, ঘুমিয়ে আছে অসুখের অঙ্কুর সব মানুষের রক্তে।

রূপভেদা প্রমাণানি ভাব-লাবণ্য-যোজনম।

সাদৃশ্যম বর্ণিকাভঙ্গম ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম ॥

'যা বাব্বা ঘুরে ফিরে সেই সংস্কৃত চলে এল? মানুষ হয়ে জন্মাবার মহা জ্বালা ত। এর চেয়ে আমার বেদান্ত ফার বেটার। এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছে। তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। হে মায়া প্রপঞ্চময়, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'

সভাপতির বোধ হয় একটু ঘুম ঘুম এসে গিয়েছিল, তিনি একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'আপনাদের আলোচনা আমি হাফ শুনেছি, হাফ শুনিনি। এটা মনুষ্য ক্লেশ নিবারণী সভা না আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা। সম্পাদক, সম্পাদক গেলেন কোথায়'?

'এই তো পাশেই আছি।'

'তোমাকে আমি বার বার বলছি সকলের চোখের সামনে একটা নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে দাও, মনুষ্য ক্লেশ চোখে পড়ুক তা না হলে এই আবোল তাবোলই চলবে। নাও এখন তোল, টেনে তোল।'

'কাকে তুলব?'

'আ মূর্খ। ডিরেইলড আলোচনাকে টেনে লাইনে তোল।'

'আমি তুলে দিচ্ছি।'

'না আপনি আবার হোমিওপ্যাথিতে চলে যাবেন।'

'গেলেও সিমিলিয়া সিমিলিরাস কিওরেনটুর, বিষে বিষে বিষক্ষয়। উফ্‌! কি যে একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে না। ধরুন আমি বিয়ে করব।'

'এখনও করেননি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে ভুল আমি অনেক আগেই করে বসে আছি। সাপোজ, সাপোজ আমি বিয়ে করব, এখন কনজারভেটিভ পদ্ধতিতে আমার মেয়ে দেখার অধিকার নেই। প্রথমে আমার এলডার্স'রা দফায় দফায় যাবেন-আসবেন। অনেকটা বাজার করার কায়দা। টিপে-টাপে, উলটে পালটে, দরদস্তুর করে পছন্দ। একবার অবশ্য আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলা হবে, এইবার তা হলে ছেলে একবার মেয়েকে দেখে আসুক অর্থাৎ আমাদের পছন্দটাকে 'ডিটো' মেরে

আসুক। এই যে মেয়ে বাছাই হচ্ছে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞদের দিয়ে, মোস্ট আনসায়েন্টিফিক ওয়েতে। ইয়েস, চুল ঠিক আছে, ট্যারা নয়, হাসলে গালে টোল পড়ে না, খুব লম্বাও না খুব বেঁটেও না, হাতে পায়ে লোম নেই, পায়ের আঙুল ফাঁক নয়, কপাল উঁচু নয়, চিরুন দাঁতী নয়, সব ঠিক আছে লেকিন···

'এর পরও লেকিন ?'

'ইয়েস লেকিন। নো অ্যাস্ট্রোলজার। ফাইন্যাল দেখা দেখবেন ছেলের পক্ষে একজন হোমিওপ্যাথ। চৌষট্টি হোক, একশ আঠাশ হোক লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। মেয়ের বাবা নগদের সঙ্গে এই টাকাটা ধরে দেবেন। ওটাই হবে স্টেক মানি। ছেলে হল ঘোড়া, বাজী-বাজী, বাবাজি। হড়কে গেল ত সামান্য টাকাতেই গেল, ধরা পড়ল ত মেয়ের আস্তাবলে সারাজীবন বাঁধা রইল বাহন হয়ে। পক্ষিরাজের পক্ষসাতন। মুখে লাগাম, পিঠে জিন তার ওপর কন্যা আরোহী, সারাজীবন টগবগ, বগাবগ।

'লেকিন হোমিওপ্যাথ কি দেখবেন, ভেতরটা ? জিভ গলা চোখের তলা, কানের ভেতর, নাকে পেনসিল টর্চ ইত্যাদি।'

'ধুর, ওসব অ্যালোপ্যাথিক অভদ্রতা। হোমিও হল আর্ট-ক্যাকালটি—ভাব-লাবণ্য যোজনম। খাজুরাহোর মূর্তি সাধারণ মানুষের চোখে একরকম, পুরাতত্ত্ববিদের চোখে আর এক রকম। আমাদের চোখে পাত্র-পাত্রী, সুন্দর, অসুন্দর, বহিরঙ্গ বিচার, অন্ত-রঙ্গ বিচার হোমিওপ্যাথের হাতে। তিনি হিস্ট্রি নেবেন ছাপান ফর্মে—মানসিক ভাবসমূহ এবং সর্বাঙ্গীন তাবৎ লক্ষণচয়। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। মেয়ের বসার ধরণ, মুখের ভাব, কপালের ভাঁজ, কানের লতি, নাকের ডগা, চোখের পাতা চুলের গোড়া, দাঁতের পাটি। এরই মাঝে সার্চিং আইস ঘুরছে চারপাশে, আত্মীয় স্বজন, তাঁদের চেহারা, কণ্ঠস্বর হাসির শব্দ, হাসতে গেলে কাশি আসে কিনা। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি। দেখছেন আর নোট করছেন, বর্তমান থেকে অতীতে' পূর্বপুরুষ, তার পূর্ব-পুরুষ, পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, বংশের ডালে ডালে পাতায় পাতায় বিচরণ, লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন, শেরশাহ, ঔরঙ্গজীব, আকবর, বাবর, মহম্মদ ঘোরী, ভায়া

খাইবার পাশ, বোলান পাশ, কাবুল, ঘজনি, কান্দাহার, ইরান. ইরাক ·'

'সে কি মশাই আমাদের বউরা সব অতদূর থেকে রোল করতে করতে, রোল করতে করতে এসেছি নাকি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাব্বা ইসকো বোলতা হ্যায় এথনোলজি। সামনে পাত্রী, তার দেহলক্ষণ ফুঁড়ে দৃষ্টি চলেছে রক্তের ধারা অনুসরণ করে কচ্ছু বিষের সন্ধানে।'

'হোয়াট ইজ কচ্ছু ? ইজ ইট বিচ্ছু ?'

'বিচ্ছুর চেয়েও সাংঘাতিক হল কচ্ছু, কচ্ছু মিনস·· যা লোড-শেডিং হয়ে গেল মোশা।'

অন্ধকারে সভাপতি হাই তুলিলেন এবং সভা এইখানেই বিপর্যস্ত হইল।

'একটা বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে।'

'দাম কত?

'চার পাঁচ টাকা হবে।'

'তা হলে আমরা সকলে পঞ্চাশ পয়সা করে চাঁদা দি।'

'আবার চাঁদা স্যার। শ্রবণেই ভীতি। দুর্গা পুজো থেকে সরস্বতী পর্যন্ত [illegible]মাতার চাঁদা। মুঠোমুঠো চাঁদা। সংসারী মানবের পক্ষে বড়ই ক্লেশের কারণ।'

'সামান্য পঞ্চাশ পয়সায় এত ক্লেশ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পঞ্চাশ পয়সা আমার এক পিঠের বাস ভাড়া। পঁচিশে একটা পাতিলেবু, দুটো সিগারেট, পাঁচটা বিড়ি কিংবা পঞ্চাশ গ্রাম লাল লাল কাঁচা লঙ্কা। লিটল ড্রপস অফ ওয়াটার, লিটল গ্রেনস অফ স্যাণ্ড।'

'উঃ কি যন্ত্রণায় যে পড়া গেছে। ছেলেবেলার পাঠ্যপুস্তকে গোটাকতক কবিতা, সেই কবিতার কোটেশান শুনতে-শুনতে কান পচে গেল। এই এক লিটল ড্রপস আছে আর একটা আছে জন্মিলে মরিতে হবে, আর একটা আছে টু আর ইজ হিউম্যান, আর একটা আছে লোকে যারে বড় বলে, আর একটা আছে ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন, আর একটা আছে জীবে দয়া করে যেই জন, আর একটা আছে…।'

'ওরে কেউ তোরা থামা না ওকে।'

'এই মশাই স্টপ, একদম চুপ, ক্লেশদায়ক মানুষ।'

'হবে না। উনি যে একজন প্লিডার। প্লিড করে করে কত মক্কেলকে কত জজ সাহেবকে খতম করে দিলেন। ইহাকে বলে ভার্বাল টর্চার।

সভাপতি মৃদু কেশে বললেন, 'আমরা শুরু করেছিলাম ফিউজ বাল্ব দিয়ে। সেখান থেকে চলে গেছি জীবে দয়াতে। খুব হয়েছে

ভাই সকল, একটা আলো না জ্বললেও ক্ষতি হবে না। এখন কাজের কথায় আসা যাক। কাজ না করলে চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সমিতির অধিবেশন বসছে।'

'দীর্ঘদিন কোথায় মশাই। চারটে অধিবেশন হয়েছে, আজ হল পঞ্চম।'

'আমার কাছে দীর্ঘ। বয়স ভেদে সময় স্লো ফাস্ট হয়। শেক্ষপীয়র পড়েছেন আপনারা।'

'শেক্ষপীয়র নয় শেকসপীয়র, মোক্ষমূলর নয় ম্যাকসমূলার।'

'ধ্যার মশাই! শেকসপীয়র নয় পীয়ার, শেকসপীয়ার।'

'আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। ই আর এ ডিপথং হয়ে হয়ে অ।'

'ডিপথং। ডিপথং আবার পেলেন কোথায়।'

সভাপতি মৃদু হেসে ঝগড়া থামালেন, 'আমি শেক্ষপীয়র, শেকসপীয়র, পীয়ার সব উইথড্র করে নিলুম। মনে করুন আমিও পড়িনি, আপনারাও পড়েননি।'

'না, তা কেন? তা মনে করব কেন? আমরা শেকসপীয়ার পড়েছি অনেকে।'

'আমি বাদ। আমি পড়েছি শেকসপীয়র। ডেফিনিটলি পড়েছি।'

সভাপতি দু হাত তুলে বললেন, 'কি বিপদেই পড়া গেল।'

'বিপদ ত আপনি নিজেই তৈরি করলেন। হচ্ছে মনুষ্য ক্লেশ, আমদানী করলেন ছাত্রজীবনের ক্লেশ শেকসপীয়ারকে।'

'শেকসপীয়ার ক্লেশদায়ক? বলেন কি।'

'ঠিকই বলি, যে কোন পাঠ্যবস্তুই মনুষ্যক্লেশের কারণ, যে কোনও অপাঠ্যই চিত্তবিনোদনের হেতু। যে কোনও মানুষকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, কজনের ছাত্র-জীবন সুখের ছিল। কজনের মনে আছে শেকসপীয়ার।'

'আমার রয়েছে—টাইম ট্র্যাভেলস ইন ডাইভার্স পেসেস উইথ ডাইভার্স পার্সনস। আই উইল টেল ইউ হু টাইম অ্যাম্বলস উইথাল হু টাইম গ্যালপস। বলুন ত কোথায় আছে।'

'আমি একটু বাইরে থেকে আসছি।'

'ওই দেখুন কুইজ কনটেস্ট হচ্ছে ভেবে পালাচ্ছে।'

'না তা নয় ছোট বাইরে।'

'ছোট বাইরে। স্কুলে কলেজে সর্বত্র তুমি এই করে এসেছ। পড়া ধরা শুরু হলেই ছোট বাইরে।'

'আজ্ঞে না আ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ অ্যা.। ছোট.বাইরেতে যেতে হয় যান, বলে যান কোথায় আছে।'

'আপনি বলুন না।'

'আপনি বলুন না।'

সভাপতি নস্যির ডিবে টেবিলে ঠুকে বিবদমান দুই পক্ষকে থামিয়ে দিলেন. 'শান্তি শান্তি।'

'হোয়াই শান্তি, আমি একবার বলবই, দুয়ো হেরে গেছে দুয়ো।'

'হেরে গেছি। বাঃ বেশ মজা। আপনি আবার জিতলেন কখন ?'

'আমি নিউট্রাল। না নেগেটিভ না পজেটিভ, হ্যা হ্যা ব্বাবা, কমপ্লিটলি নিউট্রাল। হেরেছেন আপনি, গো হারান হেরেছেন। নিউট্রালরা কখন হারে না। গুম মেরে বসে থেকে মৃদু মৃদু হাসে, হারজিতের খেলা তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

সভাপতি গলা ঝেড়ে বললেন, 'মনুষ্য ক্লেশ নিবারণী সমিতিটাই এখন দেখছি দারুণ ক্লেশের কারণ হয়ে উঠেছে। ক্লেশ ত কমবেই না উলটে আরও ক্লেশ যোগ করে ছাড়বে। এটাকে তুলে দেওয়া হোক।'

'না-না-না। তোলা চলবে না।' সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—'তুলে দিলে এই সন্ধ্যেবেলাটা আমরা যাব কোথায় ? সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার মত ক্লেশদায়ক আর কি আছে। আমাদের বাড়ি ··।'

বক্তা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন 'আমাদের বাড়ি, সেই হোম-হোম, সুইট-হোম। স্বামী স্ত্রী যেন দুটি খত্তাল। একটি ঘরে আর একটি বাইরে। যতক্ষণ দুজন দুদিকে, অলরাইট, শান্তি। যেই কাছাকাছি স্ট্রাইকিং ডিসটেনসে.

দুদিকে, অলরাইট' শান্তি। যেই কাছাকাছি স্ট্রাইকিং ডিসটেনসে এল, ঝমা ঝমা ঝমা ঝমা ঝং। চীনে বাদ্যি শুরু হল। তা সেই পুংখতালের আটক থাকার জায়গাটাকে আপনারা উঠিয়ে দেবেন? আমরা এখানে থাকলে গেরস্তা তবু একটু শান্তিতে থাকে।'

বক্তা বসলেন। সভাপতি বললেন, দ্যাট মিনস এই সমিতি কিছু কাজের হয়েছে।'

,অফকোর্স হয়েছে। এই ত হোমিওপ্যাথিক কায়দার সেদিন মেয়ে দেখে এলুম। উঃ সে এক একসপিরিয়েনস মশায়।'

'কি রকম, কি রকম।' সকলে উৎসাহী হলেন শোনার জন্য।

'ভাইপোর বিয়ে। মেরে দেখা হচ্ছে। সেদিনে সেই উনি বললেন না, মেয়ে বাজিয়ে নিতে হয় বাড়িতে বললুম, ব্যাপারটা আমি হ্যান্ডল করব। একটা বউমা আনব তবে বাজিয়ে আনব। সকলেই রাজি, দেখা যাক তোমার কেরামতি। আর ফ্রেন্ড পঞ্চানন হোমিওপ্যাথি করে। সোস্যাল সার্ভিস নয়, ফ্রীঅলা হোমিওপ্যাথ। চল পঞ্চু দেখি তোমার কেরামতি। স্পাইগিরি করতে হবে। ভাবলক্ষণ দেখে বুঝতে হবে একটি মেয়ের ভেতরে কি আন্ডার কারেন্ট বইছে। জেনেটিক স্ট্রাকচারটা ধরে ফেলতে হবে ওপর থেকে। ছেলের দুই কাকা সেজে, বড়কাকা আর ছোটকাকা…।'

'হাসলেন মশাই কাকা আবার বড় কি। কাকা বড় হলেই ত জ্যাঠা হয়ে যায়। বলুন মেজকাকা, সেজকাকা।'

'সেকি! ব্যাপারটা তা হলে ত খুব কালো হয়ে গেছে মশাই। আমরা ত ছেলের বড়কাকা আর ছোটকাকা বলে মেয়ে দেখে এলাম তিন ঘন্টা ধরে।'

,ধরে ফেলবে, ফিশি অ্যাফেয়ার। বড়কাকা হর না।'

'কে বলেছে হয় না, ছোট হলে বড়ও হয়। সেই পড়েননি বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।'

'লাও এ আর এক পন্ডিত। আরে মশাই এ বড় সে বড় নয়। বয়েসে বড়।

'আপনি মশাই আর এক মুর্খ। ছোট বয়স বেড়ে বেড়েই ত

পিতা বড় হতে শুরু করলেন, পইতে হল, আরও বড় হলেন, হতে হতে আমার পিতা হলেন।'

'গবেট, ফাষ্টক্লাস গবেট। স্ট্যাটাস, সম্মান, সম্মানের কথা হচ্ছে, হাইট, বয়স ওজন এসব কোনও ফ্যাকটারই নয়। যে কোনও ছোট কাকার বয়স পাঁচও হতে পারে, বেঁচে থাকলে একশও হতে পারে। দে আর বর্ন লাইক দ্যাট, ছোটকাকা, মেজকাকা, সেজকাকা, বড়কাকা, মেজজ্যাঠা, সেজজ্যাঠা অ্যান্ড সো অন।' '

'দাঁড়ান-দাঁড়ান, ব্যাপারটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কই আমি ত পিতা হয়ে জন্মাইনি। জন্মে তবে পিতা হয়েছি। তবে হ্যাঁ পড়েছি, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। তার মানে কাকা হয়ে, জ্যাঠা হয়ে জন্মান যায় একসেপ্ট পিতা। পিতাস আর মেড নট বর্ন। মাথাটা কেমন করছে। আমি সভাপতির সাহায্য চাই। প্লিজ এই ঘোঁটপাকান ব্যাপারটা একটু সমঝে দিন।'

সভাপতি বললেন, 'ব্যাপারটা হল রিলেশানের ব্যাপার। একটা ব্ল্যাকবোর্ড থাকলে বোঝান সহজ হত। যাক এই কার্ডবোর্ডটায় এঁকে বুঝিয়ে দি। দশটা লোক পাশাপাশি। ধরা যাক তিন নম্বর ব্যক্তি কারুর পিতা। তাহলে কি হল?'

'আজ্ঞে তিন নম্বর ব্যক্তি তাহলে কারুর পিতা হলেন।'

'ইয়েস। এ পর্যন্ত তাহলে ক্লিয়ার?'

'হ্যাঁ ক্লিয়ার।'

'তাহলে তিন নম্বর ব্যক্তি যাঁর পিতা, দু নম্বর ব্যক্তি তাঁর মেজজ্যাঠা, প্রথম ব্যক্তি তাঁর বড়জ্যাঠা। এই হল ওপর দিকের রিলেশান। এইবার পিতার নীচের দিকে যাঁরা তাঁরা সব কাকা, ছোটকাকা, নকাকা, রাঙাকাকা।'

'দাঁড়ান পজিশনটা একটু সরিয়ে নি, ধরা যাক ওই সারির চতুর্থ ব্যক্তি আমার পিতা, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তিতে আমার পিতা হলেন না, তিনি আমার জ্যাঠা হলেন, কোন জ্যাঠা?'

'সেজো জ্যাঠা।'

'পঞ্চম ব্যক্তি কে হলেন!'

'নকাকা।'

'তার মানে ছোটকাকা উবে গেলেন!'

'উবে নয়, যাঁর ছোটকাকা হবার কথা ছিল তিনি হয়ে গেলেন বাবা। সম্পর্ক বুঝতে গেলে সারেগামা বুঝতে হবে। এই সারির দশটি লোক হল, বড়, মেজ, সেজ, ছোট, না, রাঙা, নতুন, গোলাপ ইত্যাদি। এইবার এদের ছেলেপুলে, ডালপালায় নানা সম্পর্ক।

'কি আশ্চর্য ভাই, এই প্রথম আবিষ্কার করলুম জন্মেই বাবা হওয়া যায় না তবে জ্যাঠা কি কাকা হওয়া যায়, বাবাস আর মেড নট বরন।'

'খুব জ্ঞান বেড়েছে মশাই। এদিকে মনুষ্যক্লেশ নিবারণী। মেয়ে দেখা কেমন হল তা আর শোনা হল না।'

সভাপতি বক্তাকে মেয়ে দেখার কথা বলতে আদেশ করলেন। বক্তা আবার শুরু করলেন।

'আমি ছোটকাকা, পঞ্চু ডাক্তার বড়কাকা। পঞ্চুকে দেখতে-শুনতে বড় বড়ই লাগে, বেশ ভারিক্কি। মেয়েকে তখনও আসরে ছাড়া হয়নি। মেয়ের বাবা সামনে বসে আলাপসালাপ করছেন। কোলের ওপর নিজের থ্যসকান উদর, মুখটি গোলাকার, নাকের ডগাটা গণ্ডারের মত, ঈষৎ লাল। চুল বুরুশের মত কালো কুচকুচে। একটা চোখ সামান্য ছোট। হাতের আঙুল চাঁপাকলার মত। প্রথম পাবে ছাড়াছাড়া চুল, শূন্য নম্বর পেন্টব্রাশের মত; সোজা-সোজা হয়ে আছে। কথা বলতে বলতে কলার মত আঙুল দিয়ে হাঁটুতে বাজনা বাজাচ্ছেন কেটল ড্রামসের মত। মাঝে-মাঝে হাঁটু নাচাচ্ছেন, ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। পঞ্চু ডাক্তার সব লক্ষ্য করছে। আমি দেখছি বুঝছি না কিছুই, একটু অস্বাভাবিক লাগছে এই যা। পঞ্চু দেখছে এবং বুঝছে। পঞ্চু হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনার বাবার সামনের দাঁত দুটো কি ফাঁকা ছিল? ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, কেন বলুন ত?

না এমনি।

ভদ্রলোক ঢেউ করে একটা ঢেঁকুর তুললেন। ডকটর পঞ্চানন সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, আপনার মায়ের কি অম্বল ছিল? ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, কি ছিল! আছে। মা এখনও জীবিত। আর ওই একটাই অসুখ! পঞ্চানন হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে

চলে গিয়ে প্রশ্ন করল, আপনার ঠাকুর্দা কি শীতকালে কনকনে ঠাণ্ডা জলে চান করতে ভালবাসতেন ? ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, ঠিক বলতে পারব না। পঞ্চানন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, আপনার বাবার ছিল ঠিক উলটো, শীতকালে জল দেখলেই ভয়ে সাত হাত দূরে সরে যেতেন। ভদ্রলোক এইবার বেশ রাগভাবেই বললেন, এ সব প্রশ্ন কেন ? পঞ্চুর উরুতে অদৃশ্য চিমটি কেটে বললুম, ইনি অল্প বিস্তর ডাক্তারী করেন তো, হোমিওপ্যাথি, ভীষণ নামডাক।

ভদ্রলোকের রাগ কমেছে বলে মনে হল না। তিনি বললেন, আপনারা তো মেয়ে দেখতে এসেছেন রুগী দেখতে আসেননি। সবিনয়ে বললুম, তা ঠিক, তবে কিনা ভাল ডাক্তারের চোখে সবাই রুগী, যেমন, ভাল জ্যোতিষীর চোখে সবই গ্রহ, ভাল ধর্মগুরুর চোখে, সবাই পাপী।

পঞ্চানন উৎসাহের চোটে উঠে পড়েছে। দূরে দেওয়ালে একটা অয়েল পেণ্টিং ঝুলছিল। রুদ্রাক্ষের মালা পরা তেঁটিয়া এক বৃদ্ধ আসনে বসে আছেন। পঞ্চানন ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, পায়ের আঙুলে কড়া ছিল এনার ? প্রস্রাবের দোষ ছিল কি ? শীতে হাঁপানি হত ? মুদ্রাদোষ ছিল ?

ভদ্রলোক আসন ছেড়ে উঠে আমি কিছু করার আগেই ভীমবেগে তেড়ে গিয়ে ডকটর পঞ্চাননের গালে এক থাপ্পর—ইডিয়েট আমার গুরুদেবকে নিয়ে রসিকতা। গেট আউট, গেট আউট।

ন্যাজ তুলে দুজনেই রাস্তায়। পঞ্চাননের গাল লাল।

আমি বললুম, 'পঞ্চানন, তুমি সবছেড়ে গুরুদেবকে নিয়ে পড়লে কেন ? মেয়ে, মেয়ের বাপ, মা, বাপের বাপকে দেখতে পার, গুরুদেবকে ধরে টানাটানি করে কি পেতে ?'

পঞ্চা বললে, 'বেঁচে গেলে। গুরুর ধরে টানতেই হাই-প্রেসার বেরিয়ে পড়ল। জেনেটিক্যালি ওদের বংশে পাগলের বীজ ঘুরছে।'

নিপ ইন দি বাড। হ্যাঁ ভ্রূণেই হত্যা। বিবাহই হল মনুষ্য জাতির নাইনটি পার্সেণ্ট ক্লেশের কারণ। ওই হোমিওপ্যাথি দিয়ে কিস্যু হবে না, মশাই। একবার জোড় লেগে গেলে সারাটা জীবন ত্রিভঙ্গ-মুরারী হয়ে বয়ে বেড়াতে হবে। বদহজমের দাওয়াই আছে বদ-বিবাহের কোনও দাওয়াই নেই। বিয়ের আগে পাত্রীপক্ষের চাল-চলনই আলাদা। মেয়ে আমার, তুলনা হয় না, মশাই ; রূপে ত আর মানুষের হাত নেই কিন্তু গুণ। একেবারে ট্রেইনড জিনিস। যেমন চলন, তেমনি বলন, একেবারে ডোম্যাসটিকেটেড টাইগ্রেস। লেজ ধরে হিড় হিড় করে টানাটানি করলেও ফিকফিক করে হেসে যাবে। একবার যাচাই করে দেখুন। পতিপ্রাণা, সংসারসেবিকা, মৃদুভাষী, কর্মনিপুণা, স্বল্পভোজী, সমুদ্রের মত হৃদয়, ফোয়ারার মত দয়ালু, আকাশের মত উদার। ঠিক যেমনটি আপনি চান তেমনটি।

ও-মমশাই যেই না বিয়ে শেষ হল, ফুলশয্যার খাট থেকে সংসারের চাতালে নেমে এল আর এক মূর্তি। দুর্গ দখল। আঁচলে বাঁধা স্বামী, হামভি মেলেটারি তোমভি মেলেটারি। শানবাধানো গলা। নাচের পুতুলের মত হাত-পা নাড়া। তেরছা চাউনি। দুম দুম চলন। নাও শালা এখন ম্যাও সামলাও।

শালা বলছেন কেন ?

ও কিছু না রামকৃষ্ণ বলতেন।

তিনি ত অনেক কিছুই বলতেন। সব ছেড়ে তাঁর শালাটাকেই ধরলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ বোনটিকে ত সারা জীবনেও ম্যানেজ করতে পারলুম না. শ্যালককে ধরেই টানাটানি করি। লাস্ট টোয়েণ্টি ইয়ার্স ব্যাঙ্কশালে প্র্যাকটিশ করছি। লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে ফাইভ হাণ্ড্রেড ডিভোর্স কেস ট্যাকল করেছি ! ফেড-আপ। আমার কুকুর হতে ইচ্ছে করছে ! আমায় দে মা কুত্তা করে, আমার কাজ নেই আর মনুষ্য জীবনে।

আপনার মতে এই ঝামেলা থেকে মুক্তির কি উপায় ?

উপায় একটাই। খাও-দাও আর বগল বাজাও। আপনি আর কপনি। খাল কেটে কুমির ঢুকিও না।

মেয়েরা মেয়েদের জগতে থাক ছেলেরা ছেলেদের জগতে। ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, দি টোয়েন শ্যাল নেভার মিট।

বাঃ বাঃ। তা হলে সৃষ্টি কি করে রক্ষা হবে ? ভগবানের কিংডাম ধরে টানাটানি।

আর্টিফিসিয়্যালি হবে। ভেটিনারী ডাক্তার ডাকা হবে। নো বিবাহ। যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। ও সব চলবে না। মনুষ্য ক্লেশ যদি নিবারণ করতে চান ফটাফট বিয়ে বন্ধ করুন। পেট যদি ভাল রাখতে চান তেলেভাজা খাবেন না। স্বাস্থ্য যদি ভাল রাখতে চান যোগব্যায়াম। মন যদি ভাল রাখতে চান উচ্চ চিন্তা। চোখ যদি ভাল রাখতে চান সবুজ। সুখী যদি হতে চান ব্যাচেলার।

বুড়ো বয়েসে কে দেখবে ?

ও। আপনাদের ধারণা বউ দেখবে। মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আগেও দেখেনি এখনও দেখবে না। শঙ্করাচার্য কি লিখেছিলেন—কা তব কান্তা কস্তে পুত্র। সেই গানটা আর তেমন কানে আসে না, আগে শোনা যেত, বোম্বে আউট করে দিয়েছে, সেই প্রেয়সী দেবে-এ এ ছড়া অমঙ্গল হবে বলে। দেখেননি স্বামী পটল তুললে মেয়েদের গতর বাড়ে।

ই হি হি। অশ্লীল শব্দ। গতর অত্যন্ত গ্রাইম্য ভাষা গ্রামারে নাই।

কোন পণ্ডিতে কইসে ? সংস্কৃত গাত্র শব্দ হইতে গতর আসিয়াছে।

আপনারা বড় ঝগড়া করেন।

আজ্ঞে জীবধর্ম। পাশাপাশি থাকলেই লাঠালাঠি বেঁধে যাবে। দু জন ইংরেজ ক্লাব করে, দু জন স্কচ ব্যাঙ্ক করে, দু জন বাঙালী ঝগড়া করে, দল করে। একেই বলে বাঙালীদের প্রপার্টি। স্বভাব না যায় মলে।

আপনি সিনিক।

তবে শুনুন। দু বউয়ের টেপ করা কনভারসেসান। আমার

এক ক্লায়েন্ট তাঁর বসার ঘরে টেপের ফাঁদ পেতে তাঁর স্ত্রীর কথা ধরেছেন এবং প্রমাণ হিসাবে কোর্টে পেশ করার তালে আছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম রমা। রমার বাড়িতে এসেছেন বান্ধবী শ্যামা। এইবার শুনুন।

রমা ঃ বল তোর খবর কি! হঠাৎ এত মুটোতে শুরু করলি কেন? বিয়ের আগে ত বেশ শেপ ছিল। দিন দিন যেন ঢাকের মত হয়ে যাচ্ছিস।

শ্যামা ঃ ধ্যাস, জীবনে অরুচি ধরে গেল শালা।

রমা ঃ কেন মিঞা, প্রেম করে বিয়ে করলে, ঢাক ঢোল পেটালে এখন নিজেই ঢোল মেরে গেলে?

শ্যামা ঃ ঠিক হল না। যা ভেবেছিলুম তা পেলুম না। লোকটা বেয়াড়া।

রমা ঃ আগে বুঝিস নি?

শ্যামা ঃ ধ্যার, ফলস পার্সোন্যালিটি। তখন শ্যামা শ্যামা করত। ফুল, বেলপাতা, চীনেবাদাম, পার্ক, গঙ্গার ধার, সিনেমা সব ফলস। ভেবেছিলুম শ্যামা, শ্যামা মা হয়ে বুকে উঠে নাচব, ওরে বাপস, এখন আমাকেই বগলদাবা করে রেখেছে। টঁ্যা ফোঁ করার উপায় নেই। কি মেজাজ। ভয়ে মরি, যদি ঝেড়েফেড়ে দেয়। বলে, প্রেম ইজ প্রেম, সংসার ইজ সংসার, দুটোকে মিকসস-আপ করে ফেল না।

রমা ঃ ভেরি স্যাড। আবার একবার লড়ে যাবি তারও উপায় নেই। চেহারাটা বিপর্যয় করে ফেলেছিস।

শ্যামা ঃ শাড়িটা নতুন কিনলি?

রমা ঃ হ্যাঁ।

শ্যামা ঃ রোজ একটা করে কিনিস?

রমা ঃ রোজ না হলেও সাতদিনে একটা দুটো হয়ে যায়।

শ্যামা ঃ এত টাকা পাস কোথা?

রমা ঃ ক্লিন ঝাড়ফুঁক।

শ্যামা ঃ সেটা আবার কি?

রমা ঃ গরু দেখেছিস। সেরেফ দুয়ে যাও।

শ্যামা ঃ তোর গরুর এত দুধ?

রমা ঃ ফুকো দিয়ে বের করি। কায়দা জানতে হয়, ম্যান

বগল দাবা করার টেকানক আছে। ম্যারেজ ইজ এ কনট্র্যাকট। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে কি ছিল জানিস। ছেলেকে মেয়ের বাপের কাছে কথা দিতে হত, আমি আপনার মেয়েকে রোজ হ্যাম, পর্ক, এগ, বাটার, পরিজ খাওয়াব, বছরে এক ডজন গাউন দেব প্লাস বাহাত্তর পাউণ্ড মধু খাওয়াব। নো মামার বাড়ি। চুক্তি করে বউ।

শ্যামা ঃ বের না করলে জোর করে বের করাবি ?

রমা ঃ টেকনিক আছে ভাই, টেকনলজির যুগ।

শ্যামা ঃ (দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ) আমার ভাই, একেবারেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। স্লেভ হয়ে পড়ে আছি।

রমা ঃ আমার ফুল ফ্রীডাম প্লাস ম্যানিপুলেশান।

শ্যামা ঃ কি রকম ?

রমা ঃ প্রথমে প্রেম দিয়ে মাথাটা চিবিয়ে সব সিক্রেট জেনে নিয়েছি। তোর বর মাসে কত রোজগার করে জানিস ?

শ্যামা ঃ না রে।

রমা ঃ অনেক মেয়েই জানে না। ওইটাই হল হাজব্যাণ্ডদের ট্যাকটিকস। রোজগারটা চেপে রাখবে, বউরা যেন গাটকাটা। আমি সেই সিক্রেটটাই আউট করে নিয়েছি। তা হলে প্রথমে গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার পরে গামছা নিঙড়োন। ছাড় মাল। অমর এখন পকেট খলি, কদুনি গাইবার পথ বন্ধ। পয়সা না ছাড়লে সংসার হয় না। বউ বশে থাকে না। ফিনকি হাসি, দুলকি চলন, ঝুমকি মিলন, সব পয়সার খেলা। তুমি আমার স্ত্রী গো, শুকনো কথায় চিড়ে ভেজে না, মানিক। চরকায় তেল দিতে হয়।

শ্যামা ঃ তুই ত সাংঘাতিক কথা বলছিস রে। সংসার ত রসাতলে যাবে।

রমা ঃ এ সব হল ইমপোরটেড কথা। তুমি বব চুল চাইবে, ঠোঁটে লিপস্টিক চাইবে, কামানো ভুরু চাইবে, ম্যাঙ্গিকাট ব্লাউজ চাইবে, আর মেজাজটি চাইবে সতী বেহুলার স্বামী অন্তপ্রাণ, তা কি করে হয়, গুরু ? আমি ভালবাসতেও পারি নাও পারি, আমি সংসার ভাঙতেও পারি, গড়তেও পারি, আমি মা হতেও পারি, ডাইনীও হতে পারি, আমার খুশি। শেকসপীয়র পড়িস নি, ফ্রেইলটি দাই নেম ইজ উওম্যান। ওফেলিয়া বলছে, ইট ইজ ব্রিফ মাই লর্ড। হ্যামলেট সঙ্গে সঙ্গে বলছে, অ্যাজ উওম্যানস লাভ।

আমাদের অখ্যাতি যখন যাবার নয় কেন সতী সাবিত্রী হবার ব্যর্থ চেষ্টা। ইফ দাউ উইলট নিডস ম্যারি, ম্যারি এ ফুল, ফর ওয়াইজ মেন নো ওয়েল এনাফ হোয়াট মনসটারস ইউ মেক অফ দেম। আমি ভাই এক ফুলকে বিয়ে করে বেশ সুখেই আছি।

শ্যামা : আমার যদি সামান্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও থাকত! স্বামীর হাততোলা হয়ে দিন কাটাচ্ছি রে, রমা!

রমা : মাঝে মধ্যে পকেট মার না।

শ্যামা : ধরে ফেলে মাইরি।

রমা : ধরে ফেলে মাইরি! কিছুই শিখলি না বিয়ে করে বসলি। আমার কত রকমের সোর্স অফ ইনকাম। বাজারে মারি রেশানে মারি, মুদিখানায় মারি, স্টেশনারিতে মারি।

শ্যামা : কিভাবে? তুই নিজে বাজার করিস?

রমা : নিজে কেন করব? চুক্তি, এগ্রিমেণ্ট, অ্যারেঞ্জমেণ্ট। মুদিকে স্টেশনারকে বলে রেখেছি ডবল বিল করবে। বোকা লোকটা মুখ বুজে মাসের প্রথমে পেমেণ্ট করে আসে, আমি পরে গিয়ে আমার হাফ পাওনা বুঝে নিয়ে আসি। হে হে বাবা টেকনিক। বিশ্বাসের জমির ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা। স্ট্রেচারি দাই নেম ইজ উওম্যান।

কাট। এরপর আর টেপে কিছু নেই। দুই সখীর নিভৃত আলাপন। বন্ধুগণ, এরপরও কি আপনারা চাইবেন জীবনে কোনো আধুনিকা আসুক বধূরূপে। ও নো নেভার। মেরি ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর পড়েছেন? স্যার জন ফলসটাফকে ফোর্ড বলছেন : আমার প্রেমের সৌধ আমি কোথায় খাড়া করেছি।

Like a fair house built upon
another man's ground,
So that I have lost my edifice by
mistaking the place
Where I erected it.

মিঃ লর্ড, টলষ্টয় লিখেছিলেন,

Don't trust a horse in the pasture or a wife in the home!

বিশ্বাস করেছ কি মরেছ, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস। ঘরে ঘরে

নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস। ছাঁদনাতলাই আমাদের বধ্যভূমি। মিঃ লর্ড, দেশের বড় বড় ওষুধ কম্পানীর উচিত, গর্ভনিরোধক বটিকা নয়, বিবাহ-নিরোধ বটিকা, প্রেম নিরোধ বটিকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি করিয়া পথিপার্শ্বস্থ জলসত্র হইতে একঘটি গঙ্গোদক সহ জনে জনে পরিবেশন করা। আমার মক্কেলের বিবাহ করিয়া খুব আক্কেল হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে তিনি ঘুঘু দেখিয়াছিলেন এখন ফাঁদ দেখিতেছেন। ইহা এমন এক আক্কেলদন্ত যাহা আজীবন উঠিউঠি অবস্থায় থাকিয়া মনুষ্যকুলকে চক্ষে সরিষাফুল দেখাইতে থাকে মিঃ লর্ড··

কি তখন থেকে মিঃ লর্ড, মিঃ লর্ড করছেন। এখানে কে আপনার লর্ড।

ও আই সি। আমি ভেবেছিলুম কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল করছি। একসকিউজ মি।

আপনি কি ব্যাচেলার ?

আজ্ঞে না।

তবে আপনার এত সাহস এল কোথা থেকে! তখন থেকে নারীবিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন !

মাই প্রফেসান। যখন যার পক্ষে দাঁড়াই তখন তার জন্যেই লড়ে যাই। ডাক্তার, পলিটিসান, বিজনেসম্যান, ফিলমস্টার, পুলিস-ম্যান এঁদের সাত খুন মাপ। আমার স্ত্রীর অ্যাপ্রুভ্যাল আছে।

শুনুন, শুনুন। বিবাহ বন্ধ করা যাবে না। পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ মারবেই। তা ছাড়া এটা হল এজ অফ সেকস। যেদিকেই তাকাও মোহময়ী নারী। সিনেমার পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে, রাস্তায় ঘাটে, বাসে-ট্রামে, ঘরে-বাইরে, নাটকে নভেলে মায় মন্দিরে শ্মশানে। এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে। তবে হ্যাঁ একটা উপায় আছে। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। একটু ডিটেকটিভগিরি করে তারপর মেয়ে ঘরে আনলে মনুষ্যক্লেশ মনে হয় সেভেনটি পার্সেন্ট কমে যাবে। বাবলা গাছে বাঘ বসেছে।

সে আবার কি ?

হঠাৎ মনে হল। একটা দৃশ্য, হবু বেয়াই ছদ্মবেশে বাড়ির

সামনের রকে বসে বসে বিড়ি ফ‍ুঁকছেন। ফ‍ুঁকছেন আর দেখছেন। লোকে ভাবছে কোথা থেকে পাড়ায় এক নতুন পাগল এসেছে। আসলে পাগল না বেয়াই। মেয়ে এলোচ‍ুলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে স্বভাবটি কেমন? কার দিকে নজর? কটা ছেলে সকাল থেকে সাইকেল নিয়ে চক্কর মেরে গেল। মেয়ে কখন বেরোয় কত রাতে ফেরে। বেয়ানটি কেমন? কত্তার অ্যাবসেনসে দ‍ুপ‍ুরে সিনেমা। বাড়িতে কে ঢ‍ুকছে কে বেরোচ্ছে, কতটা হই হই হচ্ছে? একসট্রোভার্ট না ইনট্রোভার্ট। ঝগড়ার পরিমাণ। কার গলা কত উঁচ‍ু। মেয়ে হারে না মা হারে। ঝগড়ার সময় কি ধরনের ল্যাঙ্গোয়েজ বেরোয়! কতক্ষণ রেডিও চলে? ছ‍ুটতে ছ‍ুটতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে না ধীর পায়ে? রাস্তা দিয়ে পরিচিত কেউ গেলে চিৎকার করে ডাকে কি-না? ফেরিঅলার সঙ্গে ঝগড়া করে কি-না? ছাদে উঠে লাফায় কি-না? রাস্তার দিকে বেশী থাকে না বাড়ির ভেতর? প্রেমঘটিত কোনও ঝামেলা আছে কি-না? বাড়ি সম্পর্কে পাড়ার লোকের ওপিনিয়ান কি! বাবলাগাছে বাপ, আই মিন উড বি ফাদার ইন ল বসে উড বি প‍ুত্রবাঘিনীর চালচলন লক্ষ্য করছেন। একট‍ু খাটতে হবে কিন্তু স‍ুফল অনেক। ইনটারেস্টিং ব্যাপার! ম্যারেজ আর ওয়েলডিং সেম ব্যাপার। ধাতুতে ধাতুতে জোড়াজ‍ুড়ি। সমানে সমানে জোড় লাগাতে হবে। দ‍ুটো দ‍ুরকমের হলেই খ‍ুলে পড়ে যাবে। চিড়িক ধরে যাবে। সাপের ছ‍ুঁচো গেলা। না পারছে গিলতে, না পারছে ওগরাতে। এইভাবে, এইভাবেই আমরা মন‍ুষ্যক্লেশ কিছ‍ু কমাতে পারি। জনহিতকর কাজের পাচনটা তা হলে বলেই ফেলি:

Take a dozen Quakers be Sure
they're Sweet and pink.
Add one discussion program
to make the people think;
……Garnish with Compassion-just
a touch will do.
And served in deep humility
your philanthropic stew.

ঘরে ঘরে বউ জাতির অত্যাচার। সেই অত্যাচার সম্পর্কে আমারও কিছু বলার আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন। আমরা শোনার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছি। হাটে হাঁড়ি ভাঙুন।

আমার দাম্পত্য জীবনে বয়েস নিয়ারলি টোয়েণ্টি ইয়ারস। সেই টোয়েণ্টি ইয়ারস আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেছে।

বউটি কেমন? কত রকমের বউ আছে জানেন?

আজ্ঞে না। রকম রকম বউ নিয়ে ঘর করার সুযোগ হল কই?

বেশ তা যখন হয় নি তখন শুনে নিন। এক বোকা বোকা ভালো মানুষ ধরনের। এঁদের ঠোঁট তেমন পাতলা নয়। নীচের ঠোঁট সামান্য ঝুলে থাকে। দাঁত ইঁদুরের মত নয়। নাক তেমন তীক্ষ্ম নয় একটু থ্যাবড়া মত। গোল গোল চোখ। গোল গোল মুখ। চুল মোটা বালামচির মত। এসরাজের ছড়ে ব্যবহার করা চলে। কপালে বড় টিপ পরেন। সেটা কখনই সেণ্টারে প্লেস করতে পারেন না। হয় একটু বাঁয়ে না হয় একটু ডাঁয়ে সরে যায়। যত বয়েস বাড়তে থাকে ততই চর্বিযুক্ত হতে থাকেন। চুলের বহর কমতে কমতে শেষে মাথার টঙে একটি বড়ি খোঁপা। গলার স্বর বীণার মত নয় ফ্লুটের মত। শব্দে রফলা থাকলে জিভে জড়িয়ে যায়। ঋ-ফলারও সেই অবস্থা। দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ ঠিক মত উচ্চারণ না হয়ে এই রকম শোনাবে দাবিড় উতকল বঙ। তুমি হাড় কৃপণ বলতে গিয়ে বলবেন—তুমি হাড় কিপটে। এঁদের হাঁটা চলায় ভূমিকম্পের এফেকট। সিসমোগ্রাফে ধরা পড়বে। রেগে কথা বললে তানসেন। ঘটি বাটি গেলাস আলমারির কাঁচ ঝিন ঝিন করে উঠবে। দু একটা বাল্ব ফিউজ হয়ে যেতে পারে। ফ্লুরসেণ্টের স্টার্টার কেঁপে উঠবে। এঁরা চুরি করে স্বামীর ব্যাগ থেকে পয়সা বের করতে গেলে মেজেতে ঝনঝন করে ছড়িয়ে ফেলবেনই। হিসেবে কাঁচা। দরজায় ফেরিঅলা ডাকার অভ্যাস। দরদস্তুর করে ছ টাকার জিনিস আট টাকায় কিনবেন এবং অম্লান-

বদনে ছেঁড়া নোট ফেরত নেবেন। বয়েসে বাত হবে। ঘন ঘন সর্দির ধাত। এই হল টাইপ ওয়ান।

টাইপ টু। বুদ্ধিমান। পাতলা পাতলা ছিমছাম চেহারা পাতলা ঠোঁট, পাতলা নাক। নাকের ডগা ঘামে। চোখ টানা টানা, রাগী রাগী। হালকা হরধনু ভুরু। পাতলা চুল। সামান্য কোঁচকান। বেশ লম্বা সামান্য কটা। একটু খোঁচাখোঁচা চেহারা। কপালের টিপ বিন্দুর আকারে সেণ্টারে। এঁদের অভিমানের চেয়ে রাগ বেশী। রাগলে নাকের পাটা ফোলে, ঠোঁট কাঁপতে থাকে থিরথির করে। মন ভাল থাকলে গুনগুন গান। হিন্দি ছবির, বাংলা ছবির, সবই অবশ্য দুলাইন করে। সময় সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত। এঁদের হাঁটা চলা হালকা পায়ে। প্রসাধন প্রিয়। সপ্তাহে একটা বড় সাবান খরচ করে থাকেন! মাসে দু শিশি শ্যাম্পু। মাথায় খুসকির উপদ্রব। লিভার কমজুরি। মধ্যবয়েসে হাঁপানি হতে পারে। রাগের অভিব্যক্তি গুম হয়ে থাকা। মিনিমাম সাতদিন স্পিকটি নট। তোষামোদ প্রিয়। পিঠে হাত না বুলোলে রাগ পড়ে না। স্বামীদেরই এগিয়ে যেতে হয়—ওগো রাগ কোর না লক্ষ্মীটি যা হয়ে গেছে গেছে এবারের মত ভাব।

এই হল দুটো একসট্রিম টাইপ। এদেরই পারমুটেশান কম-বিনেশানে আমাদের দেশের যাবতীয় বউ। সকলেই রাগী। কেউ বদরাগী কেউ আবার নিমরাগী। কেউ রেগে গেলে কেঁদে ফেলেন, কেউ খামচাখামচি করেন, কেউ কাপ-ডিশ, জুতো, ঝাঁটা ছোঁড়েন কারুর হাঙ্গারস্ট্রাইক শুরু হয়ে যায়, কেউ বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন, কেউ বাপের বাড়ি যাব বলে সুটকেস গুছোতে থাকেন। সংসারের স্হির জলে এঁরা হলেন উড়ুক্কু মাছ। দেওয়ালের গায়ে বসে শুঁড় নাড়া আরশোলাও বলতে পারেন। থেকে থেকেই সংসারের এ দেওয়াল ও দেওয়ালে ফরফর করে উড়ে বেড়ান।

এখন বলুন আপনার বউ কোন প্রজাতির?

আজ্ঞে মিকসড টাইপ। আপনি যে সব লক্ষণ বললেন তার কিছু কিছু মেলে তবে ইনি রেগে গেলে গান করেন আর খাওয়া বন্ধ হয় না বরং বেশী বেশী খেতে থাকেন।

হুঁ, এঁরা খুবই সাংঘাতিক ধরনের। কোল্ড অ্যাণ্ড ক্যাল-

কুলেটিং টাইপ। এঁদের সঙ্গে ঘর করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা মোটা সোটা গাবদাগোবদা একটু ব্লান্ড টাইপের। সামান্য ভুঁড়ি থাকবে হাতে বড় বড় খসখসে চালের মত লোম। চোখ ঘোলাটে লাল। নাকের ছিদ্রে চুল। ঘুমোলে গাঁক গাঁক করে নাক ডাকে। খেয়ে বাছুরের মত ঢেঁকুর তোলেন। গুঁতিয়ে বাসে ট্রামে ওঠেন। নামার স্টপেজ এলে আর ধৈর্য ধরতে পারেন না, সিট থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সদ্যোজাত ছাগলের মত চাঁট ছুঁড়তে ছুঁড়তে হুড়মুড় করে নেমে যান। স্নানের পর মাথার চুলে সেরখানেক জল থাকবেই আর সেই অবস্থায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সরু চিরুনি দিয়ে ফচাক ফচাক করে সামনে টেনে পেছনে উলটে চুল আঁচড়াবেন। আয়নার কাচে তেল জলের ছিটে। স্নানের পর স্ত্রীর শাড়ির দুভাঁজ করে কোমরে ফাঁপা গেঁট দিয়ে একটু উঁচু করে পরবেন এবং খেতে বসার সময় কাঁধে একটা ভিজে লাল গামছা অবশ্যই থাকবে। হাত ধুয়ে প্রথমে পাছায় ভিজে হাত লেপটাবেন তারপর শাড়ির সামনের দিকে মুছবেন। এঁদের কেউ কেউ মোটরবাইক চালাবেন। হিন্দি সিনেমা প্রিয় হবেন। তারকাদের মধ্যে গব্বরকে ভাল লাগবে, নায়িকাদের মধ্যে আমান। আড্ডাবাজ হতে হবে। তাস দাবা চলতে পারে। পরস্ত্রীর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি। ঘরে লালসুতোর বিঁড়ি বাইরে সিগারেট। সারি আসনে বসলে পা দুপাশে যতদূর সম্ভব ফাঁক করে থাকবেন। প্যান্টের পকেট থেকে পয়সা বা রুমাল বের করার সময় পাশে যিনি থাকবেন তাঁর কোমরের ওপরে পাঁজরে ইনভেরিয়েবলি খোঁচা মারবেন। ঘুমের ঘোরে হাত পা ছোঁড়ার অভ্যাস থাকবে। হুড়ুম করে পাশ ফিরবেন। পাশে আর কেউ শুয়ে থাকলে খাট থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা হবে। সস্ত্রীক বেড়াতে বেরোলে শিশুটিকে নিজেই বুকে বহন করবেন। যানবাহনে স-বুক-শিশু যাঁর সামনে দাঁড়াবেন তাঁর প্রাণ বের করে দেবেন। শিশুর পায়ে ধুলোকাদা গোবর মাখা জুতো। সেই জুতো কখনো কপালে, কখনো গালে, কখনো ধবধবে জামার বুকে এসে সিলমোহরের মত লাগতে থাকবে। বিরক্ত হলেও ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যাকে তেল দেবার দরকার তাঁকে তেল দেবেন এবং কাজ মিটে গেলে তাকে আর চিনতে পারবেন না। বাড়িতে অচেনা কেউ এলেই ফিউরিয়াস হয়ে জিজ্ঞেস করবেন—কি

চাই ? বারোয়ারি পুজোর চাঁদা দেবার সময়ে প্রতিবারেই একটা করে লাঠালাঠি ফাটাফাটির নায়ক হবেন।

আপনি কি ওই রকম ?

আজ্ঞে না। কিছু কিছু মিলছে তবে পুরোটা নয়।

তা হলে ত নির্যাতিত হতেই হবে। আচ্ছা শোনা যাক।

অতীতের ইতিহাস আমি বলতে চাই না। সে যা হবার হয়ে গেছে। একবার আমাকে চুড়ি মেরেছিল।

সে আবার কি ?

আমার শ্বশ্রুমাতা আত্মরক্ষার জন্যেই বোধহয় মেয়ের হাতে কিরিকাটা দুটো বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন একবার ঘসে দিলেই বিহারী পোকা।

বিহারী পোকা ?

সাঁওতাল পরগনায় বর্ষাকালে সন্ধ্যেবেলা একরকমের পোকা ওড়ে। গায়ের পাশ দিয়ে একবার উড়ে গেলেই হল। ছাল ছিঁড়ে কালো ঘা। আমার বউয়ের বালা দুগাছা সেই মাল। বেশী জোরজার করলেই যাও বলে একবার হাতঝামটা। ব্যাস দাগবাজি। সপ্তাহখানেক ভোগ। সুগার থাকলে যা শুকোতে মিনিমাম এক মাস। তার ওপর একা রামে রক্ষে নেই দোসর লক্ষ্মণ। হাতে একটি নোয়া আছে। মুখটা সামান্য ফাঁক ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষুরধার। মাথার ওপর দিয়ে একবার হাত ঘোরালেই এক খামচা চুল গন। তার ওপর ব্লাউজের ডেও ডেও সেফটিপিন। তার ওপর নাকে একটি তিনকোনা পাথরের নাকছাবি। তার ওপর কানে মধ্যযুগের গ্ল্যাডিয়েটারদের ঢালের মত কানের পাতা চাপা কানপাশা।

এত মশাই রণচণ্ডী, খড়গখেটকধারিণী।

আজ্ঞে পরকুপাইন, শজারু গোছের জিনিস। শরীরে লেবেল মেরে দিলেই হয়—হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার।

এখন এমত একটি বস্তুর আচার আচরণের কয়েকটি নিদর্শন ঃ আমি খেটে খাওয়া মানুষ।

তিনি ত খেটে খাওয়া নারী আপনার সংসারের যন্ত্রী।

দ্যাটস ট্রু। তবে আমি বেশী খাটি। খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি। স্বাস্থ্যের নিয়মে বলে সলিড এইট আওয়ারস ঘুম। ভোর পাঁচটায় আমাদের কাজের লোক আসে। খটাখট কড়ার শব্দ।

দরজা খুলে দিতে হবে। দুজনেরই কানে শব্দ আসছে। দুজনেই শুনছি। কে ওঠে, কে খুলে দেয়। মশাই, মটকা মেরে পড়ে থাকে। প্রতিদিন তিনশো প’য়ষট্টি দিন এই শর্মাকেই ঘুমচোখে উঠে টলতে টলতে গিয়ে দরজা খুলতে হয়। আর এমন শয়তান যেই এসে বিছানায় শুই অমনি মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করে, কি গো খুলে দিয়ে এলে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। এটা ইউনাই-টেড নেশানকে তুলে ধরার মত একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। একেই আমার একটু কুসংস্কার আছে। সকালে আমি কারুর মুখ দেখতে চাই না, দিন ভাল যায় না। সেই আমাকে জোর করে দেখতে বাধ্য করাবে। ওই পাঁচটার সময় সাহস করে আর ঘুমোতে পারি না। ঘুমের সেকেণ্ড এডিশান সহজে কাটতে চায় না। ভাল ঘুম হয় না বলে সারাদিনই শরীর খ্যাঁত খ্যাঁত করে, হাই ওঠে। এফিসিয়েন্সি কমে আসছে বলে জুনিয়াররা টপাটপ প্রোমোশান নিয়ে মাথায় চেপে বসেছে।

এরপর ঝড়বৃষ্টির কাল আসছে বর্ষা আসছে। সে আর এক খেলা। সব জানালা খুলে শোয়া হল মাঝরাতে তেড়ে ঝড়বৃষ্টি এল। আমার এই দীর্ঘ বিবাহিতা জীবনে এমন একটা দিন দেখলাম না যে দিন আমার বউ উঠে জানালা বন্ধ করেছে। মশারি তিমির পেটের মত ফুলে উঠেছে। হু হু করে ধুলো ঢুকছে। তিনি শুয়ে আছেন কাঠের পুতুলের মত। এই শর্মাকেই তেড়েফুঁড়ে বেরোতে হবে, সাড়া বাড়ীর যেখানে যত জানালা দুমদাম করে পড়ছে। সব একে একে জলঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বন্ধ করতে হবে যেই ফিরে এসে শোব অমনি সেই মোলায়েম গলা—সব বন্ধ করেছ ত ?

হ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ।

রান্না ঘরেরটা ?

হ্যাঁ সেটাও।

রান্নাঘরের জানলা দেখেছেন ? যমেও ছোবে না। হাতময় কালি। একদিন রেগে গিয়ে, হ্যাঁ সেটাও বলি সেই কালি রাত দুটোর সময় সারামুখে মাখিয়ে দিয়েছিলুম। ভোর পাঁচটায় ট্যাকসি ডেকে বাপের বাড়ী। হাতে হ্যারিকেন। পোনের দিন পরে পায়ে ধরে নিয়ে এলুম। শ্বশ্রুমাতা উপদেশ দিলেন—পরের

বাড়ির মেয়ে নিয়ে গেছ বাবা অত্যাচার করলে তোমারই নিন্দে হবে। কি বংশের ছেলে তুমি। এ তো বউয়ের মুখে কালি নয় তোমার মুখে কালি। তুমি দোলের দিনে মাখাও কেউ কিছু বলবে না। অ্যালুমিনিয়াম মাখাও, আলকাতরা মাখাও, গরুরগাড়ির চাকার কালি মাখাও, বচ্ছরকার দিনে কেউ কিচ্ছু বলবে না। মজা দেখুন, শ্বশুরবাড়ির কাউনসিলে আমাদের কেস আনরিপ্রেজেণ্টেড। আমাদের পক্ষে কেউ বলার নেই, কেউ শোনার নেই। সেণ্টার টেবিলে স্টেনলেস স্টিলের থালা। চারটে ফুলো ফুলো বাদামী লুচি। কড়কড়ে আলু ভাজা। দুটো রসগোল্লা। ঢাউস এক কাপ চা। সামনে চশমা চোখে সিগারেট মুখে গম্ভীর শ্বশুরমশাই। আর এক চেয়ারে ষণ্ডামার্কা আধুনিক চেহারার শ্যালক। ঘরের মাঝখানে কাঁচাপাকা চুল ক্ষয়াক্ষয়া শাশুড়ী দরজার বাইরে পর্দা ধরে ম্যাক্সিপরা মহা আদুরী শ্যালিকা। লুচিসহযোগে উপদেশ শুনে বউ বগলে বাড়ি। বউয়ে অরুচী

নাও কাম টু দি পাখা প্রবলেম। খাটের ধারে শোবেন বউ। দেওয়ালের দিকে শোবেন স্বামী। যুক্তি, আমাকে তো ভোরে উঠতে হবে, টুক করে পাশ থেকে খসে পড়ব, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না অফিসের ভাত ধরায়। সাত খুন মাপ। কিন্তু আমাকে যে বাথরুমে যেতে হয়। বাথরুমে যাবে কেন ? শোবার আগে বেশ করে জল খেয়ে ঘণ্টাখানেক বসে বসে মশার কামড় খাও তারপর বাথরুম করে একেবারে ড্রাই হয়ে শুয়ে পড়। রাতে বারে বারে উঠতে নেই খোকাবাবু। টানা ঘুমোতে হয়। এক ঘুমে রাত কাবার। বেশ বাবা তাই হোক। শ্বশ্রূমাতা বলেছেন স্বামী মানেই স্যাক্রিফাইস। সন্ন্যাসীও স্বামী, বউয়ের বরও স্বামী।

কিন্তু ম্যাডাম তোমার আসল খেলা ত শুরু হবে শোবার পর।

মশারির ভেতর তিনি, বাইরে তাঁর ঝুলন্ত পা জোড়া। পাতায় পাতায় ঘষে ধুলো ঝরাতে ঝরাতেই গোটাকতক মশা ঢুকবে। এরপর তিনি ভেতরে পা টেনে নিতে নিতেই আরও গোটাকতক। এরপর চুড়িবাদ্য করতে করতে লটর পটর হাতে মশারি গুঁজতে গুঁজতে আরও খানকতক। এইবার খোঁপা আলগা করে শয়ন ও হাই উত্তলন—আলো নেবাও।

হয়ে গেল আমার পড়া। চোখে আলো পড়লে ঘুম হবে না। ঘুম না হলে ভোরে ওঠা যাবে না। দায় আমার। আলো নিবল। একটু উসখুস। দুচারবার পায়ের পাতায় ঘষাঘষি।

—উঃ মশা ঢুকছে। আলো জ্বাল।

আলো জ্বলল।

—নাও মশা মার।

হাঁটু গেড়ে মশারির আয়তক্ষেত্রের ভেতরে এক বাহু থেকে আর এক বাহুতে আমার ছুটোছুটি আর দুহাতে তালি। মশা কি অত সহজে মরে। তিনি শুয়ে শুয়ে নির্দেশ দিতে থাকবেন।

—ওই যে ওই যে, ওই তো ওই কোণে, ওই কোণে। হ্যাঁ হ্যাঁ উড়ে এদিকে চলে এল। ধ্যাস ল্যাদাড়ুস। মশা মারতেও শেখোনি, চাকরি কর কি করে!

মশার সঙ্গে গাদি খেলা। শেষে তাঁর দয়া হবে।

—নাও নিবিয়ে দাও যা হয়েছে হয়েছে।

আবার আলো নিবল। ঘুম আসছে আসছে। গলা শোনা গেল।

—শালা খুব জ্বালাচ্ছে।

—কে?

—মনে হয় একটা পুরুষ মশা।

—কি করে বুঝলে পুরুষ মশা?

—তা না হলে কানের কাছে এত গুন গুন করে গান গাইবে কেন? কামড়াবি কামড়া। তোমার মত স্বভাব আর কি একবার শুরু করলে চাপড় না খাওয়া পর্যন্ত থামতে চাওয়া।

—বেশ তা না হয় হল? স্বামী আর মসকুইটো এক শ্রেণীর মাল, তা আমাকে এখন কি করতে হবে।

—মারতে হবে। আলো জ্বাল।

আলো জেলে আবার মশার সঙ্গে এক চক্কর চোর পুলিশ খেলা। আবার শুতে শুতেই বায়নাক্কা। হে প্রাণনাথ গলা শুকিয়ে গেছে, এক গেলাস জল। মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নিয়ে আধশোয়া হয়ে আলগোছে ঢক ঢক করে জল খেয়ে একটি প্রাণঘাতী শব্দ ছাড়া হল আঃ। বিছানার বাইরে আমি দাঁড়িয়ে আছি মহারানীর খাস ভৃত্য। গেলাসটা নিয়ে রেখে দিতে হবে।

গেলাস রাখতে না রাখতেই হুকুম—মনে হয় অম্বল হয়ে গেল, দুটি জোয়ান দাওত গো।

জোয়ান খেয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়া হল। খাট কেঁপে উঠল। ভাবলুম শেষ হল। অতই সহজ।—পাখাটা পুরো করে দাও। বেশ তাই করে দি। বিছানায় এসে শুয়েছি। বেশ ঘুম আসছে দু চোখ জুড়ে। —শুনছ? হ্যাঁ গো শুনছি।

—বল।

—পাখাটা তিন করে দাও শীত শীত করছে।

—তুমি করে দাওনা।

—আমি শুয়ে পড়েছি। নামতে গেলেই মশা ঢুকে যাবে, পায়ে ধুলো লেগে যাবে।

—আমারও ত তাই হবে।

—তুমি নামার কায়দা জান, তোমার চটি আছে। বউকে টপকে খাট থেকে নেমে রেগুলেটার ঘুরিয়ে তিনে করে দিলুম। তারপর আবার বউ লঙ্ঘন করে নিজের জায়গায় শুলুম। আবার ঘুম আসছে।

—শুনছ?

—কি হল প্রাণেশ্বরী।

—সুবিধে হল না। ভোলটেজ ড্রপ করেছে। তুমি আর একবার কষ্ট করে ফুল পয়েণ্টে করে দিয়ে এস, লক্ষ্মীটি। আবার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে মেজেতে এসে পড়লুম। এবার খুব রেগে গেছি। আর শোওয়া নয়। টুলে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিই জরুকা গোলাম।

—কি হল, শোবে না।

- শুয়ে ত লাভ নেই। আবার ওঠাবে ভোলটেজ বাড়বে কমবে, ভোলটেজ স্টেবিলাইজার হয়ে বাইরেই বসে থাকি।

—রেগে যাচ্ছ কেন? কত সহজেই তোমরা রেগে যাও। একটুও সহ্য শক্তি নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন তিনটে স— শ ষ স সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর তিনবার। নাও চলে এস। এবার শীত করলে তোমাকে জড়িয়ে ধরে শোব।

মশাই এই হল আমার রাত। দিনের কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন।

মনুষ্যক্লেশ নিবারণের নাম করে মেয়েদের খুব কেচ্ছা করা হচ্ছে, লজ্জা করে না আপনাদের, নারী হল শক্তির অংশ, নারী হল জগদ্ধাত্রী। আমরা আছি বলেই ত আপনারা আছেন। কোথায় সেই পামর যে ভোলটেজ স্টেবিলাইজার হয়ে সারা রাত পাখার সুইচ-এর তলায় বসে থাকে বলে খুব নাকে কেঁদেছে। কোথায় সেই ভদ্রলোক ?

আজ্ঞে আপনাকে দেখে চেয়ারের তলায় লুকিয়েছে।

তাই নাকি! এই যে বেরিয়ে এস। উঠে এস। তোমার ছেলেকে যা শোভা পায়, তোমায় তা শোভা পায় না। লড়তে হয় সামনা-সামনি লড়ে যাও। আমি কি করি আর তুমি কি কর, এঁদের সামনেই তার বিচার হয়ে যাক। উঠে এস।

তুঁমি আঁবার তেড়েমেঁড়ে এঁই জঁনসঁমক্ষে এঁলে কেঁন ?

ইয়ে হ্যায় ইজ্জত কি সওয়াল। নাকে কেঁদে পার পাবে না। চেপে ধরলেই চিঁচিঁ ছেড়ে দিলেই লম্ফঝম্প, তোমাকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি।

আমি না হয় আমার দুঃখের কথা একটু সাতকান করেই ফেলেছি তা বলে এই কি একটা ঝগড়া করার জায়গা। নারী হবে নম্র, নতমুখী, সহিষ্ণু, মৃদুভাষী। নরম-নরম-গরম-গরম। রোদে দেওয়া শীতের বিছানার মত।

ন্যাকামি রেখে এদিকে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াও।

উঃ তোমার ওই ল্যাঙ্গোয়েজ, সো ভালগার। ভাবতে পার, মা দুর্গা কি মা জগদ্ধাত্রী আরতির সময়, চারদিকে ধূপধুনোর ধোঁয়া, কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ, ভক্ত নরনারী, গদগদে, হঠাৎ বলে উঠলেন, ন্যাকামি রাখ।

তা কেন ?

বাঃ এই বললে তুমি হলে জগদ্ধাত্রী, সিংহবাহিনী, তা ভাষা, চালচলনটাও ত সেই রকম হওয়া উচিত।

বাজে না বকে পাশে এসে দাঁড়াও।

আহা যান না মশাই, মিসেস যা বলছেন শুনুন না। তখন ত' খুব গিন্নির নামে বলছিলেন, এবার ম্যাও সামলান। আমরা বাবা বলিও না, ঝামেলাতেও পড়ি না। আমি জানি সরকারের বিরুদ্ধে আর স্ত্রীদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানেই সিডিসান। প্যাঁচে পড়ে যাব। পুলিসের গায়ে কিল। না মেরেই মরতে হয়, মারলে ত' কথাই নেই। আচ্ছা, আপনারা এইবার দেখুন, দুজনের হাইটটা দেখুন। আমার স্বামী আমার চেয়ে প্রায় একহাত লম্বা।

পশ্চিম বাংলায় সাধারণত তাই হয়। বউ মোটা হোক ক্ষতি নেই তবে, মাথায়-মাথায় না হলেই ভাল। মাথা ছাড়িয়ে গেলে নাকচ। বউ লম্বা হলে কত্তার অকল্যাণ হয়। লোকে বলে হিড়িম্বা। বউ নয় ত' যেন গিলে খেতে আসছে। এই ত বেশ মানিয়েছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন মনে হচ্ছে যেন—মেড ফর ইচ আদার। দেখুন কি সুন্দর মানিয়েছে, যেন হর-গৌরী, যেন দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, যেন রাম অউর রমা। আমার ঠাম্মা দেখলে নমস্কার করে বলতেন, আহা নয়ন সার্থক হেন লক্ষ্মী-জনার্দন।

স্টপ।

বউ বেঁটে, স্বামী লম্বা। যে বাড়িতে বসবাস সেই বাড়িতে সমস্ত দরজা-জানালা সাত থেকে দশ ফুট উঁচুতে। ডিঙ্গি মেরে, ডিঙ্গি মেরে, নাগাল পাওয়া যায় না। জানালার গবরেটে উঠে উল্লুকের মত ঝুলতে-ঝুলতে প্রথম-প্রথম ছিটকিনি লাগাতুম। তখন সবে বিয়ে হয়েছে, এমন ঢিপসি হয়ে যাইনি। উনি বললেন, তুমি যখন জানালায় উঠে ওভাবে লচকি-লচকি ছিটকিনি লাগাও তখন আমার ভেতর থেকে বোম্বে ছবির একটা হিরো বেরিয়ে আসে। একদিন হঠাৎ, না আমি বলতে পারব না, লজ্জা করছে।

আপনি হেলপ করুন। উনি মুখ ঘুরিয়ে থাকুন। আপনি বলে ফেলুন। মনে করুন এটা আদালত কিম্বা চার্চের কনফেসান বকস। ক্রাইম কবুল করুন।

ক্রাইম আবার কি ?

স্ত্রীকে ধরে পেটালেও ক্রাইম হয় না, আদর করলেও রেপ হয় না। মনুসংহিতা বলছে ঃ

> দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
> অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ।।

সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ, অপরাংশে নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন ও সঙ্গত হইলেন। তার মানেটা কি। আমার আদ্ধেকটা আমি আর আদ্ধেকটা উনি। হাফ প্লাস হাফ ইজ ইকুয়ালটু সেই।

সেইটা কি ?

আমি। সেই মহা আমি, যার এত হাঁকডাক-হম্বিতম্বি, রাজা-প্রজা, বড়বাবু-ছোটবাবু,সধবা-বিধবা, হিরো-ভিলেন, সাধু-শয়তান, প্রজা ক্যাপিটিট্যাল আমি। বউকে পেটান মানে নিজেকে পেটান, খামচান মানে নিজেকে খামচান, আদর করা মানে নিজেকে আদর করা। ওর ভেতর কে বসে আছে ঘাপটি মেরে। আমি। হাম হায়। বৃহদারণ্যক পড়ুনঃ 'ন বা অরে জায়ায়ৈ জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি'। জায়ার ভেতর আত্ম-স্বরূপিণী দেব বর্তমান। তাই ত জায়া এত প্রিয়। তার মানে কি ? কে একটা আমার ভেতরেও রয়েছে, ওর ভেতরেও রয়েছে। যেই বলব, কে গা, সে বলবে আমি গো, আবার যেই ও বলবে, কে গা, আমি বলব, আমি গো।

অ্যায়, আমি বলছেন কেন ? বলুন সে বলবে আমি গো।

ওই হল। সেই ত আমি, আমিইত সে।

বাঃ তুমিটা তা হলে উবে গেল ?

না উবে যাবে কেন ? কত রকমের 'বাদ' আছে জানেন, দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। কখনও আমিই সব। আমার জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি, নাম-ধাম-কাম। সব আমার। লীলার সময় আমি-তুমি। মিলনে আমহি তুমহি হি-হি। হি মানে সে বা তিনি। তখন তন্ত্র।

তোমার ওসব মামদোবাজি রাখ। রেখে কবুল কর তুমি কি ধরনের মাল। নিজে কর ত ভাল, যদি না কর সমগ্র নারীজাতির স্বার্থে আমাকেই করতে হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ চাপে পড়েই বলতে হচ্ছে—স্ত্রীরা জন্মায় না তৈরী য়ে। এক-এক স্ত্রীর এক এক স্বভাব। সেই স্বভাবের জন্যে দায়ী াদের স্বামীরা।

এই ত পথে এস। মনে পড়ে বৎস, বিয়ের আগে পাঁচটি বছর তেলান তেলিয়েছিলে আমাকে! পাঁচটায় এসো। মেট্রোর

সামনে দাঁড়িয়ে আছ বাঁকা শ্যাম হয়ে। তিনটের সময় দাঁড়িয়ে থেক বকুলতলায়। দুপুর রোদে কাগজ মাথায় দিয়ে মরা বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছেন আমার প্রেমিক চিদু। পার্কে বসে চানাচুর খাও, ঝালমুড়ি খাও, চকোলেট খাও, ফুচকা খাও, ভেলপুরি খাও। চলো যাই সিনেমায়, থিয়েটারে, জলসায়। কত মিঠিমিঠি হাসি, মিঠিমিঠি বাতেঁ। ভ্যাজোর-ভ্যাজোর এক কথা, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার সিন্ধু জাহ্নবী, যমুনা, তুমি আমার লাইট-হাউস, তুমি আমার টর্চের ব্যাটারী, হৃদযের ধুকপুকি। তুমি আমার গোলা-পখাস, গোলাপী রেউড়ি। দুব্বো ঘাস দিয়ে গায়ে সুড়সুড়ি। মাথায় শাড়ির আঁচল টেনে দিয়ে, বাঃ বেশ বউটি। চলো তোমাকে বাড়ী পেঁছে দিয়ে আসি। তোমার শেষ ট্রাম চলে যাবে। যাকগে, তবু তোমাকে ছেড়ে আসি। প্রয়োজন হয় পয়দালে ফিরব। তোমার জন্যে আমি লাইফ স্যাক্রিফাইস করতে পারি। সেই তুমি আর এই তুমি!

আহা প্রেমে আর রণে একটু ছলাকলা শাস্ত্রসম্মত ব্যাপার। মনে নেই ইংরেজরা মীরজাফরকে মসনদে বসাবার লোভ দেখিয়ে সিরাজের পেছনে বাঁশ দিয়ে কেমন পানাপুকুরে ফেলে দিয়েছিল। সেম কেস। প্রথমে চার করে টোপ ফেল, মাছ ঘাই মেরে যেই টোপটি গিলল মারো টান।

ও এই তোমার মনের ভাব। ভালবেসে ল্যাঙ মারা। তা হলে জেনে রাখো তুমি যদি ঘোড়া হও আমি সেই খোঁড়া।

শুনলেন-শুনলেন, আমি নাকি ঘোড়া।

মনে নেই বিয়ের পর বছরখানেক কি করেছিলে? ঘুরতে-ফিরতে, শুতে-বসতে মাধু মাধু। একবার চিদু বলে ডাক ভাই।

আহা সেইটাই ত আমার প্রেমের প্রথম উল্লাস। প্রথম উল্লাসেই আমার কোমর ভেঙে গেল। বাপস তোমার কি ওজন। উইনডো সিলে উঠে, ছাপা শাড়ি পরে সার্কাস-মোহিনীদের মত ছিটকিনি লাগাচ্ছিলে। হঠাৎ বেরিয়ে এল সে। সেই বোম্বাই হিরো। তোমাকে মনে হল হেলেন। কোমরটা ধরে শুন্যে তুলে বার্ট ল্যাংকাস্টারের মত যেই না একপাক ঘুরেছি, মট্ করে একটা শব্দ হল, কোমরটা খুলে গেল। তিনমাস বিছানায়। তখনই বুঝলুম স্ত্রী অতিশয় গুরুভার পদার্থ। তারপর আমি আর অমন

প্রেমাস্ফলন দেখিয়েছি। দেখাইনি। তা হলে তুমি কেন খোঁড়া হয়ে গেলে ডালিং!

কেন হলুম। বলব সেকথা। তোমার প্রথম উল্লাসের দিনে তোমার স্ত্রীর কি মাথার ওপর হাত তোলার উপায় ছিল ? আমার হাত তোলা মানেই তোমার চিত্ত বিক্ষেপ এবং স্থান-কালপাত্র ভুলে লণ্ডভণ্ড-বকাণ্ড। ছিটকিনি হাত না তুলে লাগান যায় ?

সে একটু হতেই পারে। তুমি নারী আমি নর। আমি নারী তুমি নর হলে তুমিও অমন হেদিয়ে পড়তে। তা বলে তুমি আমার সাড়ে তিন শ টাকা দামের ব্রিফকেসের ওপর মড়মড়িয়ে উঠে জানালার ছিটকিনি বন্ধ করবে ?

মনে পড়ে, একদিন ইডেনে ঘাস ভিজে ছিল। আমার শাড়িতে দাগ লেগে যাবে বলায় তুমি ব্রিফকেস পেতে দিয়ে মহাদরে বসিয়েছিলে। তখন ত তোমার বুক মোচড় দিয়ে ওঠেনি। বলেছিলে, আমার ব্রিফকেস ধন্য হল। সেই ঈশ্বর পাটনীর নৌকা। মা অন্নপূর্ণার পায়ের স্পর্শে সেঁউতি সোনার হয়ে গেল।

তখন ত তুমি প্রেমিকা ছিলে। প্রেমিকা একটা অন্য রকম ব্যাপার। কল্পনা-ফল্পনা রোমানস-টোমানস মিলিয়ে ভূতের মত। আকৃতি আছে, শরীর নেই। প্রেমিকা হল পালকের মত, তুলোর মত হালকা। স্ত্রী হল পাথর লোড। প্রেমিকার প্রেম ছাড়া কোনও কর্তব্য নেই। স্ত্রীর কত কর্তব্য! স্ত্রী হওয়া মানেই বশ্যতা স্বীকার করা, সাবমিশান। বরফ দেখেছ ? বরফ তুষার। চারদিকে পড়ে আছে পেঁজা তুলোর মত। আবার কুলফি মালাইও দেখেছ। প্রাক-বিবাহিত জীবন সেই তুষারের মত। কিন্তু যেই তুমি বিয়ে করলে অমনি হয়ে গেলে খাপে ভরা কুলফি মালাই। এক সংসার থেকে এসে আর এক সংসারের খোলে ঢালাই হওয়া। একটা জিনিস বোঝনা কেন মেয়েরাই বিয়ের পর সব ছেড়েছুড়ে শ্বশুর-বাড়ি যায়, ছেলেরা যায় না। নিয়মটা আগে ওলটাও তারপর গালগলা ফুলিয়ে চিৎকার করবে। তুমি হলে লেপ, আমার ইচ্ছে হলে শাটিনের ওয়াড় পরাব, ইচ্ছে হলে মার্কিনের। লেপের কিছু স্বাধীনতা আছে কি ?

তার মানে পুরুষ-জাতি স্বার্থপর। সুবিধেবাদি। প্রবঞ্চক। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি।

তা বলতে পার।

সময় ত অনেক এগোল, চারদিকে শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান মানুষকে চাঁদে পাঠাচ্ছে, তোমাদের স্বভাব একটু সংশোধন করে দেখ না। সেই ঘিনঘিনে স্বামী, বউকাটকি শাশুড়ী! আর কতকাল চলবে এইভাবে!

তোমাকে সকালে আমি চা তৈরি করে খাওয়াই। একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়া আর কোন স্বামী বউকে বেড-টি সাপ্লাই করে এসেছেন শুনি?

কোন্ বউ তোমার মত অকর্মণ্যের ফেলে যাওয়া চশমা অফিসে পেঁছে দিয়ে আসে শুনি?

কোন্ স্বামী তোমার মত আয়েসী বেড়ালকে বিছানায় শুইয়ে মাঝরাতে জল সাপ্লাই করে শুনি?

কোন্ বউ অন্য মেয়ের সঙ্গে রূপটারপটি করার জন্যে স্বামীর চুলে কলপ লাগিয়ে কলেজি কার্তিক বানিয়ে দেয় শুনি?

কোন স্বামী বউয়ের পাকা চুল তুলে দেয় শুনি?

কোন বউ বকের ভূমিকায় স্বামী-বাঘের গলা থেকে হাঁ করিয়ে মাছের কাঁটা বের করে দেয় শুনি?

শান্ত হন, শান্ত হন। আপনারা সত্যিই মেড ফর ইচ আদার। আপনার লিকার, স্ত্রীর ফ্লেভার যেন আসাম-দার্জিলিং ব্লেন্ড।

স্তোত্রপাঠে তরজার সমাপ্তি ঃ

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া॥

যে গৃহে নারীর পূজা সেই গৃহে দেবতার আগমন, যে গৃহে নারীর অসম্মান, সেই গৃহের সমস্ত কর্মফল কুফল।

তুমি তা হলে ডাব বল।

ডাব।

আমি বলি ভাব। ডাব ভাব। চলো হাত ধরাধরি করে বাড়ি যাই।

'ক্লেশ পাবার জন্যেই মানুষের জন্ম। জগৎ এক কারাগার।'

'কে আপনি? হে দার্শনিক।'

'আপনাকে ত' এর আগের কোনও অধিবেশনে দেখিনি। হঠাৎ কোথা থেকে এলেন?'

'আমি সেই কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিল। যে কৃষ্ণ গীতা আওড়ে ছিল। যে বই পৃথিবীর মাস্টার পিস। সর্বকালের বেস্ট সেলার। আজ পর্যন্ত কারুর বাপের ক্ষমতা হল না ওই রকম দ্বিতীয় আর একটি রচনা করার। গীতা বিক্রি করে যে রয়ালটি বিভিন্নকালের মুদ্রায় পাওয়া গেছে সেই টাকায় আমেরিকার আধখানা কিনে ফেলা যায়।'

'আপনি কবে ছাড়া পেলেন প্রভু?'

'কোথা থেকে মাই ডিয়ার স্যার?'

'উন্মাদ আশ্রম থেকে?

'ছাড়া ত পাইনি ভাই। উন্মাদ আশ্রমেই ত রয়েছি। এই সংসারই ত সেই বিশাল পাগলাগারদ। আমারই এক খেলার ঘুঁটি সেই কতকাল আগে লিখে গেছে—হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপীতে মিলে। এই সংগীত আগে কখনও-কখনও সকালে তোমাদের বেতার তরঙ্গে প্রচারিত হত। এখন আর হয় না। এখন তার বদলে এসেছে—হামতুম এক কামরেমে বন্ধ হ্যায়, অ্যার চাবি খো যায়। ওই একই ব্যাপার, একই মানে। বিশ্ব কারাগারে কোটি-কোটি পাগলা মত্ত মার্তণ্ডের মত হুটোপাটি করে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে আমি যখন দেখি, তখন দেখি—'

'কতদূর থেকে প্রভু!'

'পার্সপেকটিভে যখন পৃথিবীকে দেখি, তখন দেখি, মহাশূন্যে একটি গোলক ঘুরছে, তার আষ্ঠে পৃষ্ঠে পোকার মত কিলবিল করছে মানুষ। আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, খাবলাচ্ছে, খোবলাচ্ছে, উঠছে, পড়ছে, মরছে, জন্মাচ্ছে। আহা কি সুন্দর খেলা।'

'এ কি বলছেন প্রভু! আপনি ত বলেছিলেন, আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, শুরু নেই, শেষ নেই, আমি নেই, তুমি নেই, শুধু

তিনি আছেন, যাঁকে কাটা যায় না, পোড়ান যায় না, মারা যায় না, শেষ করা যায় না। এখন যে অন্য কথা বলছেন?

'ঠিকই বলেছি। তোমরা বুঝতে ভুল করেছ। সেটা হল ভৌতিক অবস্থা। মানুষ মরে ভূত হত। ভূত সর্বশক্তিমান। ভূতের বিনাশ নেই। কারণ ভূতের দেহ নেই। এই দেহ, এই দেহটাই শালা যত ক্লেশের কারণ।'

'শালা বলছেন স্যার?'

'কেন? শালা শব্দ শুনে আঁতকে উঠছ কেন। বহু ভাল জিনিসের সঙ্গে শালা যুক্ত আছে যেমন যজ্ঞশালা, কর্মশালা, ধর্ম-শালা, পাঠশালা, গোশালা, পাকশালা। শালা বললেই বউয়ের ভাই মানে করছ কেন? দেহ একটা শালা। এবং সেই ভগবান, সেই আল্লা, সেই গড, যিনি এই মনুষ্য দেহের ভাস্কর, তিনি একটা বোগাস, ওয়ার্থলেস থার্ডক্লাস কারিগর। যে লোকটা কাঁচ তৈরি করেছিল, তার চেয়েও অপদার্থ। মানুষের উচিত আর দেরি না করে ভগবানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। এই ডিফেকটিভ মেকানিজম চলবে না, চলবে না।'

সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। সভাপতি বললেন, 'আমরা যে কত বড় পাগল, তা প্রমাণ করার জন্যেই এই ছত্রধারীর আবির্ভাব। তবে যা বলছে শোনা যেতে পারে। সেই এক কথাই ত' বলবে—ইট ইজ এ টেল টোল্ড বাই এন ইডিয়ট সিগনিফাইং নাথিং। সেই ইডিয়েট হলেন ভগবান।'

সভাপতির কথা বক্তা বোধ হয় শুনে ফেলেছেন। মৃদু হেসে বললেন—'ভগবান নয় শয়তান। আমি তার রাইভ্যাল। গীতায় আমি অর্জুনকে সেই জন্যে ক্যাটিগোরিক্যালি বলেছিলুম—মামেকং শরণং ব্রজ। অ্যান্ড হি ডিড দ্যাট। সে তাই করেছিল এবং যুদ্ধ জিতেছিল। ইউ অল নো দ্যাট। এখন অবশ্য অ্যাটম বোমার যুগ। কুরুক্ষেত্র আর হবে না। একসপার্টরা বলছেন—হলে বড় জোর বর্ডার ওয়ার হবে। কোলড ওয়ার হবে। যাক ওটা আলাদা ব্যাপার। আসল ব্যাপার হল, এই সৃষ্টি রহস্য অনেকটা গোয়েন্দা কাহিনীর মত। সামওয়ান অফ ইউ বলেছিলেন শেষ নাহি যার, শেষ কথা কে বলবে! শেষটা অবশেষে জানা গেছে। রহস্য এখন পরিষ্কার। শয়তানকেই আমরা ভগবান ভেবে বসে আছি। শয়তান

তৈরি না করলে মানুষের মত একটা জীব তৈরি হত না। ভগবানকে সাজা দেবার জন্যেই ভগবান মেরে মানুষ তৈরি হয়েছে।'

'এ কথাটার মানে কি ?'

'মানে খুব সহজ। ভগবান টুকরো-টুকরো হয়ে গেছেই। রোজই হচ্ছেন। প্রতিদিন কোটি-কোটি টুকরো হয়ে যাচ্ছেন।'

'সে আবার কি ?'

'বিশ্বজুড়ে রোজই কয়েক কোটি মানুষ জন্মাচ্ছে। এত মানুষ আসছে কোথা থেকে। সবই ভগবানের টুকরো। ভগবান যত টুকরো হচ্ছেন, ততই তাঁর শক্তি কমে যাচ্ছে। এ্যাজ ফর একজাম্পল, গ্রহ ভেঙে উপগ্রহ হয়। উপগ্রহ ভেঙে উল্কা হয়। উল্কা পুড়ে ছাই হয়। মানুষও সেইরকম বিশালের কুঁচো. জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

'ভগবান এত টুকরো হচ্ছেন কেন ?'

'শয়তানের কারসাজি। সেই আদম আর ইভের গল্প। লোভের আপেল। আপেলের লোভ। জন্ম মানেই ক্ষয়। প্রজননের ইচ্ছেই হল পাপ। ভগবানের মনে পাপ ঢুকে নারী লোলুপ করে তুলেছে। সেই লালসা থেকেই প্রতি মুহূর্তে মানব শিশু ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠছে। লালচ বড় বালাই। এক শক্তিমান ভগবান এখন পিল-পিলে ভগবান, কীটাণু কীট। পতঙ্গের মত আসছেন আর ধুঁড়িয়ে মরছেন। ভগবান নিজেই চিৎকার করছেন—'নো মোর নো মোর।'

'ভগবান চিৎকার করছেন ?'

'অবশ্যই। বিবেকের কণ্ঠস্বর হল ভগবানের কণ্ঠস্বর। এখনই নয়, দুয়ের বেশী কখনই নয়। ডোণ্ট মালটিপাই। পোস্টার, হোর্ডিং, বিবিধভারতী। কে কার কথা শোনে। শয়তান সাহিত্যে শয়তান সিনেমায়, নাটকে। শয়তান ক্যাবারেতে, মদে, মাংসে, আহারে, বিহারে। ভগবান সংযম হারিয়ে শয়তানের ফাঁদে।'

'তা হ'লে, কি হবে স্যার ?'

'নিয়তি, বৎস নিয়তি। ভগবানের কোনও আকার-আকৃতি ছিল না। তিনি ছিলেন, শুদ্ধ, যুদ্ধ, যুক্ত। লালসায় তাঁর একটা মাথা গজাল গোল ফুটবলের মত। দুটো গোল-গোল চোখ। দুটো লগবগে হাত বেরোল। দুটো লিকপিকে ঠ্যাং। একটা বেয়াড়া আকৃতি। অকেজো শরীর। ভেতরে জটিল যন্ত্রপাতি। লিভার, পিলে,

ফুসফুস, হৃদয়, মাইলের পর মাইলে স্নায়ু, জড়ান পাকান, টুকরো-টুকরো হাড় জুড়ে একটা কাঠামো। একটু বেকায়দা হলেই খিল খুলে যায়, ভেঙে ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। মাথায় ঘিলু। একটু ধাক্কা লাগলেই ছলকে যায়। একটু চাপ পড়লেই বিগড়ে যায়। এক মাথায় মেকানিজমেই ভগবান কাত। খেপে গেলে কারুর কিছু করার নেই। উলঙ্গ হয়ে ঘোরে। টিউমার হলে ভেলোরে ছোটে। তোমরাই বল পৃথিবীতে আর কোন প্রাণীর এত দুর্বল, এত সূক্ষ্ম শরীর? খুব লম্পঝম্প। এ ওকে তড়পাচ্ছে, ও তাকে তড়পাচ্ছে, হঠাৎ ওগো আমার পেট ব্যথা করছে গো বলে দাঁত ছিরকুটে ফ্ল্যাট। নিজের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। বোলাও ডাক্তার। ডাক্তারের জ্ঞানও তেমনি। এখানে টেপে ওখানে টেপে। বুকে নল লাগায়। পেটে তবলা বাজায়। জিভ টেনে বের করে। চোখ উলটে দেখে। রায় দেয় পেটে বায়ু, বুকের দিকে ঠেলে উঠছে অম্বল। শেষে দেখা গেল ক্যানসার। ভগবান টেঁসে গেলেন। ডাক্তার ভগবান ফী পকেটে পুরে সিমলায় বেড়াতে চলে গেলেন।

'মানুষকে তা হলে ভগবান বলছেন?'

'অনু ভগবান। বহুর মধ্যে সেই এক দানা-দানা, কণা-কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন। অপলকা, অপটু একটা খোলে ঢুকে আমার নাম জপছে তারস্বরে—হে কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কি করবে? ওই খোলে ঢুকেছিস কেন শালা! যে খোল পচে যায়, ধসে যায়। যে খোলের আবরণের কোনও শক্তি নেই। হাড়। হাড়ের ওপর চর্বি. চর্বির ওপর মাংস, মাংসের ওপর নুনছাল, তার ওপর ছাল। ভেতরে ব্যাজ-ব্যাজ করছে রক্ত। শরীরের নিচের দিকে সেপটিক ট্যাঙ্ক। তার আবার ধারণ ক্ষমতা এতই কম, রোজ সকালে সবেগে দুর্গন্ধময় মাল বেরিয়ে আসে। কোনও ভগবানের একবার, কারুর বারবার। থেকে থেকে জল বিয়োগ। শরীর মানেই, মল-মূত্র, কফ-পিত্ত, স্বেদ, শোণিত। ঘর্মাক্ত ভগবানের দুর্গন্ধে অন্য ভগবান তিষ্ঠতে পারে না। গায় ফ্যাঁস-ফোঁস করে গন্ধ দ্রব্য স্প্রে করে সামাল দিতে হয়। এই যদি ভাগবতী তনু হয় তা হলে এই শরীরের সৃষ্টি কর্তাকে কি বলতে ইচ্ছে করে? তোমরাই বল। মানুষ ভগবানের সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি হল শয়তানের? একজন এই রহস্য এই সিক্রেট ডিজাইনটা ধরতে পেরেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোঁছিছে

পারেনি। সব গুলিয়ে ফেলে একটা পৌরাণিক গল্প ফেঁদে বসল।'

'সেটা কি?'

'সেই গল্প। আদম আর সাপ। শয়তানরূপী সাপ বলছে, তুমি বড় নিঃসঙ্গ। কতকাল এই রকম একা-একা থাকবে? তুমি তোমার একটি প্রতিমূর্তি তৈরী কর। তোমার একজন সঙ্গী চাই। ইভের আবির্ভাব। শয়তানের কারসাজি সফল হল। শক্তির বিভাজন। পরা প্রকৃতি, পরা শক্তি। শয়তান আরও একধাপ এগোল। রমণ কর। পরাশক্তির কাছে আত্ম সমর্পণ কর! কোন শক্তি? যে শক্তি শয়তানের আপেল খেয়ে চৈতন্যময়ী নয় লাজময়ী। বিশাল শক্তি, বিশাল জলধি আবদ্ধ হতে-হতে ছোট-ছোট ডোবায় পরিণত হল। শয়তান চারপাশে মায়া সৃষ্টি করে কাল ডেকে কালান্তরে জন্মের চাকায় ঘুরিয়ে মারছে। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে। শয়তান বলছে জন্মেই তুমি পরাভূত, মৃত্যুর দাস। তুমি আমার পরিকল্পনায় ক্রীতদাস। শয়তানের পেপার ওয়েটের তলায় ভগবানের পাতলা কাগজ বিবেকের হাওয়ায় প্রতিটি মনে ফড় ফড় করে উড়ছে। প্রতি মুহূর্তে অনুশোচনা. এ কি করছি, এ কি করে ফেলেছি। এ কি করে বসে আছি। একই দেহে ভগবান আর শয়তান। ত্যাগ ভোগ প্রেম, নিষ্ঠুরতা সত্য, মিথ্যা, রক্ষক, ভক্ষক, দাতা, প্রবঞ্চক। তোমাদের শহরের তলায় পয়ঃপ্রণালী। খাবার জল, নর্দমার নোঙরা জল পাশাপাশি বইছে। তোমরা জান, তাই বল ম্যান ইজ এ বাণ্ডল অফ কনট্রাডিকসানস? একই শরীরে হিরো আর ভিলেন। একই ইতিহাসে জয় আর পরাজয়। পালাবার পথ নেই, শান্তি নেই। শুধু ক্ষয়ে যাও, শুধু জ্বলে যাও। চিতা দহতি নির্জীব. চিন্তা দহতী সজীব। চিতা চৈতন্যময়ী।'

'তবে উপনিষদে যে বলা হয়েছে অমৃতস্য পুত্রা।'

'ওটা ধারণা মাত্র। সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উঠেছিল। শুনেছ তোমরা। দেবতারা যদি দেবতাই হবে, সর্বশক্তিমান হবে, তাহলে অমৃত খেয়ে অমর হতে চাইবে কেন? অমরেও আবার অমরত্বের বাসনা কিসের? আসলে দেবতা একটা ভাঁওতা, একটা ধাপ্পা। পুরাণজুড়ে দেবতাদের কেচ্ছা। দুর্বলতা, ভীরুতা, কামুকতা,

তঞ্চকতা। শয়তানের চরিত্র অনেক বলিষ্ঠ। তার লক্ষ্য অনেক স্পষ্ট। শয়তান হল শক্তি। সে প্রভুত্ব করতে চায়, অধিকার করতে চায়, খর্ব করতে চায়, খর্বিত হতে চায় না। অসীম তার শক্তি। সে যে কত শক্তিমান, পৃথিবীই তার প্রমাণ। পৃথিবীর তিনের চার ভাগ জল একের চার ভাগ স্হল। জল মানে অজ্ঞাত এলাকা, রহস্য-রহস্যময় অঞ্চল, অতল। অন্ধকারও তাই। অসীম বিশ্বে আলোকিত এলাকার চেয়ে অন্ধকার এলাকার পরিধি অনেক-অনেক বেশী। অন্ধকার আলোর চেয়ে শক্তিশালী। পৃথিবী যদি শয়তানের সৃষ্টি না হত, তাহলে দিন-রাত্রির এই ভাগাভাগি হত না। প্রকাশই করে প্রচ্ছন্ন করে দাও রাতের পাপ দিনের আলোতে স্পষ্ট। বিবেকের মোচড়। রাতে জীবন অসম্ভব দুর্বল। দিনের সঙ্কল্প রাতে ভেসে যায়। প্রাণীজগৎ ঘুমিয়ে পড়ে জেগে থাকে মানুষ, তার চিন্তা নিয়ে, দাহ নিয়ে পাপ নিয়ে। ভগবানের সৃষ্টি হলে পৃথিবীর চেহারা অন্য হত। স্হলভাগ হত তিনের চার, জলভাগ একের চার! অজানা বলে কিছু থাকত না। ম্যান গ্রোপিং ইন ডার্কনেস। সীমাহীন অন্ধকারে মানুষ নিজেকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। উঃ কি ফাঁদেই ফেলেছে ভগবানকে! পৃথিবী এক ভয়াবহ জায়গা। মহাশূন্যে ভাসমান এতটুকু একটা ফুটবল। এই তো শরীর! চতুর্দিকে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, প্যারাসাইটস। জঠর থেকে মুক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই আক্রান্ত। জন্মেই প্রথম সংগ্রাম অসুখের সঙ্গে তারপর শয়তানের প্লানে তৈরী মানুষের পরিবেশ। বিশাল-বিশাল যন্ত্র, ইঞ্জিন, মটর গাড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী। সৃষ্টিই স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে চাইছে। মানুষের অধিকাংশ সৃষ্টিই সংহারমূর্তি ধারণ করে মানুষের পেছনে তাড়া করেছে। এই প্রক্রিয়াকে আর থামান যাবে না, কারণ শয়তান তাই চায়। নিজেদের কবর নিজেরা খোঁড়। প্রতিপদে তোমরা পরাজিত। প্রতিটি জন্ম সেই পরাজয়ের এক-একটি মেডেল। শয়তান চেয়েছিল সেই নিরাকার নির্গুণ সত্তাকে একটা খোলে ভরতে। খোলাটা কেমন, যন্ত্রণাকাতর ক্ষয়িষ্ণু ষড় রিপুর বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের দাস। আমি যদি থেকেও থাকে, সে আমি হল দাস আমি—স্লেভ আই। জোনাকি গোবরে পড়েছে। আমি হল দেহের দাস, আমি তারপর জগতের দাস,

ডবল দাসত্ব। লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।

জন্মের ওপর দেবতার কোনও হাত নেই। তিনি সোনার পালঙ্কে আসতে পারেন, ছেঁড়া কাঁথায় এসে চিৎপাত হতে পারেন, ফুটপাতেও গড়াগড়ি দিতে পারেন। জন্মের ওপর কোনও কনট্রোল নেই। কামার্ত হয়ে যে যাকে জড়িয়ে ধরবে, সেইখানে ভগবান দেহ ধারণ করবেন। তারপর শুরু হবে তার দাসত্ব। সবরকমের নিপীড়ন, উৎপীড়ন। অন্য প্রাণী কত মানুষের মত এমন জন্মেই দাসত্ব করে না। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার। পরাভূত হয়, দাস হয় না। এই হল শয়তানের প্লান। দেহভূত ভগবান রোগ শোক, জরা, ব্যাধি, নিয়ে চলেছে ত চলেছেই। মরণের তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। শয়তানের তৈরি আখ মাড়াই কলে দেহী ভগবান ছিবড়ে হচ্ছে। সেই কল চলছে শয়তানের অর্ডারে, মানুষ বা ভগবানের তত্ত্বাবধানে।

স্টেট চায় বশ্যতা। ও সব ডেমোক্রেসী ফেমোক্রেসী চোখে ধুলো দেবার ব্যাপার। সংঙ্ঘ, সংগঠন হল কিছুর ওপর কিছুর লাঠি ঘোরান। এ ওকে চেপে রাখছে, ও তাকে চেপে রাখছে। সংসারে সমাজে, সেরেস্তায়, রাজদ্বারে সর্বত্রই সেই নিষ্পেষণ। টর্চারের কল চলেছে ? হাঁটু মোড়, হাত জোর করে বল, দাস আমি, প্রভু তুমি, হে মনুষ্যভূতু দেবতা তোমার সামনে আমি নতজানু। তুমি যা বলাবে তাই বলব। যেমন করে বলাবে তেমন করেই বলব, আমার কোনও স্বাধীনতা নেই। তুমি ভাতে মারতে পার, তুমি হাতে মারতে পার। আমি আমার দেহকে ভয় পাই, তোমার নিপীড়নকে ভয় পাই। তোমার প্রসাদে আমার এই অস্তিত্ব !”

বক্তা ছাতি বগলে নেমে পড়লেন।

‘আপনি কে ? পরিচয়, পরিচয় ?’

‘আমি এক বুদ্ধিজীবী মানুষ। কেরাণী। গুডবাই ফ্রেণ্ডস।’

আজকে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমাদের এই সভায় এনেছি। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি স্বামী মুগ্ধানন্দ। ন'মাস হিমালয়ে থাকেন। তিন মাস ভ্রমণ করেন।

নমস্কার মহারাজ!

জয়স্তু।

ইনি ডক্টর সিদ্ধান্ত। সাইকোলজিস্ট। সারা ভারতে এঁর নাম। বহু পাগলকে সুস্থ করেছেন। বহু দাম্পত্য সমস্যার সুখী সমাধান করেছেন। অসংখ্য বাঁদরকে মানুষ করেছেন। বহু খুনীকে সাধু করেছেন। বহু ডিকটেটারকে ডেমোক্র্যাট করে ছেড়েছেন।

নমস্কার।

নমস্কার।

এই ভদ্রলোকের নাম অমল বোস। ইনি ডগট্রেনার। ব্যারাকপুরে কুকুরের স্কুল খুলেছেন। কুকুরকে ইনি মানুষের বাবা বানাতে পারেন।

নমস্কার।

নমস্কার।

ইনি হলেন চৈতন্য মুখোপাধ্যায়। গণিতের শিক্ষক। অঙ্ক কেটে জোড়া লাগান। বহু গাধাকে পিটে-পিটে গরু করেছেন।

নমস্কার।

নমস্কার-নমস্কার।

ইনি হলেন নরেশ বেদান্ত। দার্শনিক। জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা জগৎ সত্য, এইসব মারাত্মক-মারাত্মক বিষয় নিয়ে ইনি গবেষণা করেন। পথ চলতে-চলতে গীতার শ্লোক আওড়ান। বেদ-বেদান্ত এঁর কণ্ঠস্থ।

নমস্কার।

শুভায় ভবতু।

এঁর নাম হরিসাধন ভট্টাচার্য। পুরোহিত। ভাটপাড়ায় টোল

ছিল। জুটমিলের শব্দে শ্যামনগরে চলে এসেছেন। টোল উঠে গেছে। জীবনে অসংখ্য শ্রাদ্ধ ও বিবাহকর্ম করিয়েছেন। সুপণ্ডিত মানুষ। একটি সংস্কৃত শব্দও ভুল উচ্চারণ করেন না। উপনয়ন ও বিবাহের সময় যজমানকে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ বলে দেন।

নমস্কার।

কল্যাণ হোক।

ইনি হলেন রামরাম বটপাড়িয়া। ব্যবসাদার মানুষ। স্বাধীনতার আগে কোটিপতি ছিলেন। বর্তমানে অর্বুদপতি।

নমস্কার।

নমস্তে জী।

ইনি হলেন পল্টু হালদার। ফেমাস মাস্তান। হ্যাঁ, মাস্তান বললে ইনি অসন্তুষ্ট হন না, বরং গর্ব বোধ করেন। কারণ মাস্তানী এখন জাতে উঠেছে। ভেরি ডিগনিফায়েড প্রফেসান।

নমস্কার।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ইনি হলেন বটু পাল। নেতা। ছ'ব্যর এম. এল. এ. হয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন করেন। এঁর কথায় দেশীয় শিল্পের চাকা চলে, চাকা বন্ধ হয়। ডজনখানেক বন্ধের সফল শিল্পী।

নমস্কার।

সেলাম। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। চলবে না, চলবে না। ও সরি।

ইনি হলেন অ্যাডভোকেট এ. এন. ঘোষ। ইনি দোষীকে নির্দোষী, নির্দোষীকে দোষী প্রমাণ করায় সিদ্ধ।

নমস্কার।

থাঙ্ক ইউ।

এইসব গুণী মানুষকে আজ আমরা এক ছাদের তলায় একসঙ্গে উপস্থিত করেছি একটি মাত্র উদ্দেশ্যে—পথের সন্ধান পাব বলে। মানুষ হয়ে জন্মেছি, যতদিন না মৃত্যু আসছে ততদিন এই জীবন টেনে-টেনে চলতে হবে। আমাদের মৃত্যুর পরেও মানুষ আসবে, মানুষ থাকবে। জীবন মানেই ক্লেশ। তবু চেষ্টা ক্লেশহীন জীবনের লক্ষ্যে পেঁছান যায় কিনা? শঙ্করাচার্য বলেছেন—যাবৎ জনমং তাবৎ মরণং যাবৎ জননী জঠের শয়নং ক্ষণমপি সজ্জন

সঙ্গীতরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা। এঁরা একে-একে আমাদের পথ বাতলান। গৃহিণীরা জানেন পেঁয়াজ ছাড়াতে গেলেই চোখে জল আসে। বাঁচার উপায়ও জানেন—বঁটির ডগায় একটি পেঁয়াজ গেঁথে রেখে পেঁয়াজ ছাড়ালে চোখে জল আসে না। সেইরকম ভাণমুক্ত, ক্লেশমুক্ত জীবন-যাপন পদ্ধতি হয়ত এঁদের জানা থাকতে পারে। স্বামী মুগ্ধানন্দ। আপনি আলোকপাত করুন প্রভু।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরত্তোমম।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

আপনারা মনুষ্যক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করেছেন। উত্তম কার্য্য। তবে গোড়াতেই আমার মনে একটি সংশয় জাগছে—কিসের ক্লেশ, কার ক্লেশ। জগৎ একটি মায়া। ব্রহ্মই সত্য। মায়ার পর্দার মধ্যে দিয়ে দেখেছি বলেই জগৎকে সত্য বলে মনে হচ্ছে। জগৎ বলে কিছু নেই। সবই একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্ন মাত্র। সত্য মনে করলেই সত্য, মিথ্যা মনে করলেই মিথ্যা। ক্লেশ মনে করলেই ক্লেশ, অক্লেশ মনে করলেই অক্লেশ। সবই এক বিরাট খেলা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন—পাঁকে থাকবি পাঁকাল মাছের মত। গায়ে পাঁক লাগবে না। এ দুনিয়া ধোঁকার টাটি খাই দাই আর মজা লুটি। তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মজ্ঞান ত' আর সকলের হয় না, হতে পারে না। আমাদের সব মতুয়ার বুদ্ধি? গরু যতক্ষণ হাম্বা-হাম্বা করে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। যেই মরল অমনি তার নাড়ি শুকিয়ে এক তারার তাঁত হল, অমনি সেই তুঁহু তুঁহু করে বেজে উঠল। চিরমুক্তি। আমি, আমি, হাম্বা-আম্বা তখনই দাসত্ব। আমি যেই শেষ হল গরুর তখন তুঁহুঁ অবস্থা। তুঁহুঁতেই মুক্তি। সব ছাড়া যায়, আমি ছাড়া যায় না। জগৎকে সত্য ভেবে যারা রোগ শোক জরার দাসত্ব করছেন, প্রতিদিন সংসারে মার খাচ্ছেন, তাঁরা এই গানটি শুনুন—

ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান
পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান
পাপী পুণ্যবান মুর্খ কি বিদ্বান
সমান ভাবে হেথায় সকলি শয়ান।
অন্ধ খঞ্জ বধির গলিত কুষ্ঠধারী

কন্দর্প সমান রূপের দর্পহারী
সজ্জন তস্কর গৃহী বনচারী
রাজা আর ভিখারী সকলে সমান।
হেথা এলে পরে যায় মায়া সব
রয়না ভবজরার কোন উপদ্রব
শ্মশান মাত্র নাম কিন্তু শান্তিধাম
সুখ দুখ শান্তির চির অবস্থান।
ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান!

এসেছি, চলে যাব। কিংবা আসিনি যাবও না, ভ্রম মাত্র। তবু ভাবতে দোষ কি, আমি অমৃতের সন্তান, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বন্ধন নেই, জরা নেই, যৌবন নেই। সাত্ত্বিক জীবন যাপনেই শান্তি। জপ ধ্যান, নিরামিষ আহার, সপ্তাহে একদিন উপবাস, সৎসঙ্গ, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, এই হল ক্লেশমুক্তির উপায়। দিনরাত শুধু সৎচিন্তা প্রেম।

সভায় ঘন ঘন হাততালি।

পেয়ে গেছি। পথ পেয়ে গেছি। নিরামিষ মানে কতটাকা বাঁচল, একবার ভাবুন। ডেলি অ্যাট লিস্ট চারটাকা, মাসে একশো কুড়ি। একদিন উপবাস। আরও গোটা দশেক টাকা। একশো তিরিশ। কামিনী ত্যাগ মানে বউকে বাপের বাড়ি পাঠান, চ্যাঁ ভ্যাঁ সমেত।

সাইলেন্স! সাইলেন্স! ডক্টর সিদ্ধান্ত এবার বলছেন।

লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। না, শুধু জেন্টলমেন, লেডিজ নেই। আমি বেদ-বেদান্ত, ভ্রম-মায়া, এসব বুঝিনা, বুঝতেও চাই না। আই নো ম্যান, হিজ ওয়ার্লড অ্যানড এনভায়রনমেন্ট। মানুষের বাইরেটা কিছুই নয়, ভেতরটাই সব। কনসাস নয় সাব কনসাসেই যত গেঁড়াকল। মানুষ হল আইসবার্জ। মনের তিনের চার অংশ ভাসমান বরফের মত সাবকনসাসে তলিয়ে, একের চার ভেসে আছে বাইরে।

এই যে মগ্নচৈতন্য, এটা মানুষের নিজের তৈরী নয়, অন্যের সৃষ্টি। সেই অন্যের মধ্যে আছে পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজ, ঘটনা। আজকে আমরা জানতে পেরেছি, ম্যানস হিস্ট্রী ইজ রিটন বাই দি জিনস। রিসার্চ চলছে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর

সাহায্যে আগামীকালে আমরা পছন্দমত মানুষ তৈরী করতে পারব। তখন পৃথিবী হবে প্যারাডাইস। হাকস্‌লির ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড সফল হবে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন অপ্রেসান থাকবে, ডিপ্রেসান থাকবে, মেলাঙ্কলি থাকবে, ফ্রাসট্রেসান থাকবে। নিউরোসিস, ইনিউরসিস থাকবে। হোমিসাইড, জেনোসাইড, রেপ থাকবে। ম্যানিয়াক থাকবে। কমপ্লেকস থাকবে।

মানুষে-মানুষে খ্যাচাখাই লেগেই থাকবে, হত্যা থাকবে, আত্ম-হত্যা থাকবে। নিপীড়ন থাকবে, নিষ্ঠুরতা থাকবে! ঘর ভাঙবে, ঘর গড়বে। কেউ রুখতে পারবে না। বদহজম, অম্বল, টাক, মাথা ধরা সবই থাকবে। আমরাও থাকব। ম্যানহোল খুলে পাঁক পরিস্কারের মত আমরা সাব-কনসাস থেকে গার্দা বের করার চেষ্টা করব। স্বামীকে স্ত্রী ফিরিয়ে দোব, স্ত্রীকে স্বামী, পিতাকে পুত্র, পুত্রকে পিতা। সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত এই ভাবেই চলতে থাকবে। অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট। রোগ চাপা থাকবে, সারবে না। এক ক্লেশ যাবে আর এক ক্লেশ আসবে। ক্লেশ আর ক্লেশ নিয়েই জীবন। লিবিডো। লিবিডো মানে জীবনীশক্তি, লাইফ ফোর্স। এই বাক্যটি ফ্রয়েড সাহেবের উদ্ভাবন। মানুষ পেতে চায়, ভোগ করতে চায়, উত্তেজনা চায়, উত্তেজনার প্রশমন চায়। দেহে চায়, মনে চায়। চাহিদার পরিতৃপ্তিতে শান্তি, সন্তুষ্টি। অপরিতৃপ্তিতে বিষাদ, ক্রোধ, বিভ্রান্তি। ক্রোধী মানুষ, অসন্তুষ্ট মানুষ, অতৃপ্ত মানুষ সংসারে শান্তি দিতে পারে না, শান্তি পেতে পারে না। ক্লেশমুক্ত হতে হলে নেতি চিন্তা, নেগেটিভ ফিলিংস ছাড়তে হবে। খণ্ডিত বিভক্ত মানুষ না হয়ে অখণ্ড মানুষ হতে হবে। উৎকণ্ঠা ভুলে যেতে হবে। হাত-পা ছড়িয়ে শ্লথ হয়ে বিশ্রাম নিতে শিখতে হবে। ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ুন। চোখ বোজান। মনে-মনে বলুন, বিশ্রাম, বিশ্রাম চাই। আমার দিন আর রাত উৎকণ্ঠায় ভরা। নেভার মাইন্ড। পনের কি তিরিশ মিনিট সময় আমি সব কিছুর বাইরে। তালে-তালে, লয়ে-লয়ে নিশ্বাস নিতে থাকুন। এরই নাম শবাসনে প্রাণায়াম।

আধুনিক সভ্যতার দান উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। দুর্ভাবনার চেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি আর কিছু নেই। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, চিতা দহতি নির্জীব, চিন্তা দহতি সজীব। মুক্তির উপায়, ভয় দেখে

পেছিয়ে যেওনা, ভয়ের মুখোমুখি হয়ে লড়ে যাও। অ্যাক্ট, অ্যাকসান ইজ দি রেমিডি। ওয়ার্ক অ্যান্ড নো ওরি ইজ দি রেসিপি।

আত্ম সমীক্ষা। নিজেকেই নিজে বিচার করুন। প্রত্যেকের মধ্যেই মাইনাস পয়েন্ট, প্লাস পয়েন্ট আছে। মাঝে-মাঝে নিজের বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়ান। নিজের অক্ষমতা, সক্ষমতা নিজের ভাল দিক, মন্দ দিক সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখুন। নিজেকে জানা মানেই নিজেকে সংযত করা, শুদ্ধ করা, সুন্দর করা। প্রতিদিন নিজেকে আবিস্কার করুন, ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়ুন। গ্যেটে বড় সুন্দর কথা বলেছিলেন, আমরা যখন বলি দুনিয়াটা পালটে গেছে, আগের মত আর নেই, তখন ভুলে যাই নিজেও কত পালটে বসে আছি।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে সুইট লেমন মেন্টালিটি। পাতিলেবু কখনও মিষ্টি হতে পারে না। জীবন একটা টক-মিষ্টি অনুভূতি। কখনও শূন্য, কখনও পূর্ণ। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারে না। শুধু গোলাপ নয়, গোলাপ আর কাঁটা। সুমিষ্ট পাতিলেবুর আশায় যাঁরা ঘুরছেন তাঁদের ক্লেশ কে নিবারণ করবে। সুইট লেমন মেন্টালিটি ছেড়ে পৃথিবীর সব কিছু মেনে নিতে হবে—হোল লিভিং উইথ অল ইটস গিফটস, সুইট অ্যান্ড সাওয়ার। পৃথিবীতে আমাদের চাওয়ার শেষ নেই। পাওয়াতে আমাদের চাওয়ার নিবৃত্তি নেই। আমি কিছুই চাই না এই হল ক্লেশ নিবারণের শেষকথা।

বক্তা বসলেন। চটাপ্যাট হাততালি।

এইবার বলবেন শ্রীঅমল বোস, ডগট্রেনার।

আমি কুকুর চরাই অবশ্য বিলিতী কুকুর। কুকুর মানুষে বিশেষ তফাৎ নেই। মানুষের মত কুকুরের সব আছে কেবল মানুষের ভাষাটাই নেই। ট্রেনিং মেকস এ ম্যান, ট্রেনিং মেকস এ ডগ। শৈশব থেকেই মানুষকে যদি উপযুক্ত কায়দায় শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে মানুষও কুকুরের মতই বুদ্ধিমান, কর্তব্য পরায়ণ, বিশ্বাসী বিচক্ষণ ও প্রভুভক্ত হতে পারে। আমরা কুকুরকে বলি ফেথফুল ফ্রেন্ড। ক'জন মানুষকে বলতে পারি আমরা বিশ্বাসী, কর্তব্য পরায়ণ কর্মী। পারিনা। তার কারণ মানুষ এখনও পুরোপুরি শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারিনি। মানুষের সংখ্যা অনেক সেই

তুলনায় বিলিতী কুকুরের সংখ্যা অনেক কম। তা ছাড়া কুকুরের শিক্ষিত হবার প্রবণতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। কুকুর রেগে যেতে পারে, খেপে যেতে পারে কিন্তু মানুষের মত দেখতে না দেখ বখে যেতে পারে না। কুকুরের কামড়ের ইঞ্জেকসান আছে, অহরহ মানুষের কামড়ের কোনও প্রতিকার নেই।

মানুষ ভাবে বই পড়ে বি এ, এম এ পাস করলেই মানুষ হওয়া যায়। অত সহজ! একেই ত মানুষের মধ্যে সদগুণের বড়ই অভাব। আলস্য, প্রতিহিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানি, পরশ্রীকাতরতা পরস্ত্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ, চুরির প্রবণতা, মুনাফার লোভ, ক্ষমতালিপ্সা, যশলিপ্সা, সব মিলিয়ে মানুষ একটা ক্যাডাভেরাস জীব। কুকুর সেই তুলনায় অনেক পারফেকট প্রাণী। আমি দেখেছি এক-একটা কুকুর সারা জীবন ব্রহ্মচারী থেকে গেছে। সুপ্তস্খলন নেই, স্বমেহন নেই। বিপরীত লিঙ্গের কুকুর দেখে সামান্য ছটফট করেছে, কুঁই কুঁই করেছে, কিন্তু প্লেবয় ম্যাগাজিন খুলে মদের গেলাস নিয়ে বসে নি। বেশ্যালয়ে গমন করেনি।

মানুষের মত ইমপারফেকট প্রাণীকে কুকুরের মত মানুষ করতে হলে কি করতে হবে বুঝতে পারছেন। প্রাণীর পরিতৃপ্তির প্রথম শর্তই হল পেটপুরে খাওয়া, পরিশ্রম আর বিশ্রাম! দুর্ভাগ্যের কথা অধিকাংশ মানুষই অভুক্ত। যাঁরা প্রচুর খান তাঁরা ধনী, শ্রম বিমুখ এবং অসুস্থ। ভারতবর্ষে ভোগের অনেক খরচ। খরচ মানেই উপার্জন। সোজাপথে প্রচুর উপার্জন অসম্ভব। আর সেইখানেই মরালিটির বিসর্জন। মানুষের তিনটি শ্রেণী—ইমমরাল রিচ, ডিসকনটেনটেড হ্যাগার্ডস, অ্যাণ্ড মিডলক্লাস মাউস। উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, মোসায়েবি করে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা। গুড়ের নাগরি উলটে যাচ্ছে, ভ্যান-ভ্যান করে মাছি বসছে। কুকুর অনেক বলিষ্ঠ প্রাণী। কুকুরকে ট্রেন আপ করা যায়, মাছিকে করা যায় না।

তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। শৈশব থেকেই মানুষ ধরতে হবে। মেরে-ধরে নয়, কুকুরের কায়দায় ট্রেনিং দিতে হবে। সে কায়দাটা হল, পুরস্কার-তিরস্কার। ভাল কাজে পুরস্কার, খারাপ কাজে তিরস্কার। একটা অবজেক্ট অফ ফিয়ার তৈরি করে রাখতে হবে। কুকুরের বেলায় আমরা হাতের কাছে রাখি পাকান খবরের

কাগজ, ফোলডেড নিউজ পেপার। আর্মিতে ব্যাটন, মিডল ইস্টে চাবুক, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে খেঁটে লাঠি আর একজন ফাদার ফিগার। প্রহার নয়, প্রহারের ভয়, মাঝে-মাঝে হুঙ্কার। দাঁড়াও তোমার বাবা আসুক। দেখতে-দেখতে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হবে—এইরে বাবা আসছে মনে করেই সব ঠাণ্ডা। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমেই বাবা তৈরি করতে হবে, বাবার মত বাবা। শুধু বাড়িতে নয় সর্বত্রই একটা করে বাবা চাই। রাস্তায়, ঘাটে, স্কুলে কলেজে, অফিস-কাছারিতে। বাবার অভাবে দেশ উচ্ছন্নে গেল।

অবজেক্ট অফ ফিয়ার তৈরি হলেই শুরু হবে আসল ট্রেনিং। ট্রেনিং এর মূল কথাই হল বশ মানান। জৈন্যদের সাধনায় অনেক যোগ আছে। তার মধ্যে একটি হল স্হান যোগ। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নট নড়ন চড়ন। নড়লেই যোগ নষ্ট। তারপর অভ্যাস কর একপায়ে দাঁড়ান। এর নাম ধৈর্য।

কুকুরকে আমরা প্রথমে এক জায়গায় স্হির হয়ে বসে থাকার ট্রেনিং দি। সিট ডাউন। নড়লে বা ওঠার চেষ্টা করলেই সেই অবজেক্ট অফ ফিয়ার পাকান খবরের কাগজ চোখের সামনে আস্ফালন করে ভয় দেখাই। তারপর আদেশ তামিল করার ট্রেনিং। দূরে একটা বল রেখে বলি নিয়ে আয়। আনলেই উৎসাহ দেবার জন্যে পুরস্কার, এক টুকরো বিস্কুট। বলটা সামনে রেখে বলি, পাহারা দে, কাউকে ছুঁতে দিবি না। সামনে খাবার রেখে বলি, খাবি না।

ওই একই কায়দায় ছেলে মানুষ করতে হবে। নরম-গরম ট্রিটমেণ্ট চরিত্রে টেম্পার লাগাতে হবে। ইস্পাত আর চরিত্র একই জিনিস। বেশি আদর না, বেশি শাসন না। বশ্যতা স্বীকার কর। আমরা চাই দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহাই খায়, কদাচ অবাধ্যতা করে না। সংসারের নিয়ম হল প্রথমে দাসত্ব, তারপর নেতৃত্ব। দাস থেকেই নেতা। আমাদের সকলের মধ্যেই হিরো ওয়ারশিপের মনোভাব লুকিয়ে আছে। অস্বীকার করে লাভ নেই। পলিটিক্যাল হিরো, ফিল্ম হিরো, স্পোর্টস হিরো, হিরো হলেই হল, শত-শত ফ্যান কাতারে-কাতারে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল—যুগ যুগ জিও। অফিসে সেরেস্তায় বড় কর্তাদের কি সাংঘাতিক দাপট! কে কার ঘাড়ে বাঁশ কাটে। কার ধনে কে

পোদ্দারি করে! কে কাকে ক্ষমতায় বসায়! তবু যে বসে গেল তাকে সবাই মানতে বাধ্য। তিনি তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভাগ্যবিধাতা গড। সরকারী অফিস হলে তিনি তখন সাহেব স্যার। হায়ারারকি তখন এইরকম দাসের দাস, দাসের দাসের দাস, তস্য দাস। সেই গডকে তখন নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা, তেল দিয়ে ব্যক্তিগত খিদমত খেটে। উঠতে স্যার বসতে স্যার। কলা নিন মুলো নিন। দিন স্যার ইলেক-ট্রিক বিলটা আপনার তিন মাইল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে জমা দিয়ে আসি। দিস ইজ মাই সেক্রেড টাস্ক। টেলিফোন বিল? ও দ্যাটস এ প্লেজার। বাড়িতে কাজ আছে - সো হোয়াট। আমি ত আছি! ভোর রাতে উঠে শেয়ালদা থেকে আমি মাছ কিনে এনে দেব। একদম ভাববেন না স্যার, নতুনবাজার থেকে ঘাড়ে করে ছানা কিনে এনে দেব। পরিবেশন? নো প্রবলেম। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে লেগে যাব। যে নিজের বাড়িতে কুটোটি নেড়ে উপকার করে না সে বসের বাড়িতে হাসি-হাসি মুখে গাধার চেয়ে বেশি খাটে। বাড়ির কাজে মুখ ভার করে বলে—আমি একটা ডিগনিফায়েড সার্ভেণ্ট ভাই। বড় কত্তার বাড়িতে গ্লোরিফায়েড দাস। এর দুটো কারণ. গড সন্তুষ্ট হলে প্রসাদ মিলতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, দাসত্বে নিজের ব্যক্তিত্বকে খোঁটা বেঁধে ঠেলে-ঠুলে দাঁড় করাতে হয় না। সোজা হয়ে বসার সাধনা করতে হয়, কষ্ট আছে। কুঁজো হয়ে বসা বড় আরামপদ। আত্মবিসর্জনে ঝামেলা কম। প্রসাদ জুটে গেল ত ভালই, না জুটলেও কোনও ক্ষতি নেই। বঞ্চনা সহজে হজম করা যায়। যুগ-যুগ ধরে মানুষ তাইতেই অভ্যস্ত। ব্যক্তিত্ব ফলাতে গিয়ে যে সঙ্ঘর্ষ তা সহ্য করা শক্ত। টেনসনে—ইরিটেসান, অ্যাং-সাইটি. নার্ভাস ব্রেকডাউন! উঁচুতে উঠতে চিৎপাত হবার ভয়। জমিতে ফ্ল্যাট হয়ে থাকলে সরীসৃপের আনন্দ। সেই জন্যেই আমাদের প্রবাদ, অতি বড় হয়ও না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি নিচু হয়ও না ছাগলে মুড়োবে। ব্যক্তিত্বকে কুঁচো করে, মোসায়েব হয়ে তালে তাল মিলিয়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যাও। রামপ্রসাদ গান বেঁধেছিলেন—আমি চাই না মা গো রাজা হতে, রাজা হবার সাধ নাই মা চিতে, দু বেলা যেন মা পাই গো খেতে। আমাদের ধর্মও বলছে, তুমিই সব, আমি তোমার দাস। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, যেমন করি, যেমন করাও, যেমনি চালাও তেমনি চলি।

বীরভাবের বীরাচারীরা শেষে স্ত্রী আচারী হয়ে গাঁজা ভাঙ খেয়ে শ্মশানে লুটোপুটি। বীরের পতন অনিবার্য। দাসের পতন নেই। মানুষ নিপীড়িত, অত্যাচারিত হতে ভালবাসে। সুখের চেয়ে যন্ত্রণার আনন্দ অনেক বেশি। ডিকটেটাররা তাই এত ভাল শাসক। গণতন্ত্র সর্বত্রই ফেলিয়র। হার্ডি বোধহয় সেইকারণেই বলেছিলেন, ডেমোক্র্যাসি হ্যাজ অল দি ভারচুস সেভ ওয়ান ইট ইজ নট অ্যাট অল ডেমক্রেটিক। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে এক ডিকটেটার যায় ত আর এক ডিকটেটার আসে। অসংখ্য মানুষ অম্লান বদনে তার প্রভুত্ব মেনে নিয়ে বসে থাকে। ডিকটেটারে-ডিকটেটারে লড়াই হয়, সাধারণ মানুষ প্রাণ দিতে বাধ্য হয়। নেতারা বসে থাকেন ঠাণ্ডা ঘরে, জলচৌকিতে সাধারণ মানুষ বোমা, পটকা ছোড়াছুরি নিয়ে অলিতে-গলিতে মারামারি করে মরে। একদল বলে, অমুক যুগ যুগ জিও, আর একদল বলে তমুক যুগ যুগ জিও। অমুকে-তমুকে বিশেষ ফারাক নেই। একই মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ। দুজনেই এক গেলাসের ইয়ার। একই হোটেলে একই টেবিলে মুখোমুখি বসে রাইট আর লেফট। সুগ্যারকোটেড বুলি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, স্বপ্নের জাল বুনে-বুনে জনতাকে হাতে রাখো। বল রয়েছে মাঠে খেলোয়ারদের পায়ে। গ্যালারিতে ফ্যানেরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। খেলার প্রতিযোগিতা মাঠ ছেড়ে গ্যালারিতে, গ্যালারি থেকে রাস্তায়, রাস্তা থেকে স্টেশানে, সেখান থেকে পাড়ায়, ভাঙচুর, গুলি, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, মৃত্যু। যা নিয়ে কাণ্ড, যাদের নিয়ে কাণ্ড তারা প্রোফে-সানাল। তাদের কাছে খেলা উপলক্ষই, টাকাটাই সব। তারা যখন নরম বিছানার গরম ঘুমে, ভরা পেটের স্বপ্নে তখন অসহায় মানুষ স্টেশান প্ল্যাটফর্মে পিঠে লাঠি, চোখে কাঁদানে গ্যাসের জল। রাত তিনটের সময় ছেঁড়াখোঁড়া বিরিঞ্চিবাবু শহর থেকে ফিরছেন সেরেস্তার খাতা ঠেলে।

এই জীবনেরও কত মোহ। মৃত্যু তাড়া করলে ন্যাজ তুলে ছুটে পালায়। এই হল ফাউণ্ডেশান অফ স্টেট। নেতারা জানেন এই প্রতিযোগিতার এই উত্তেজনার জনমানসিকতাকে ম্যানিপুলেট করেই বারে-বারে ক্ষমতায় ফিরে আসতে হবে, উত্তেজনার আগুনে শুকনো কাঠ গুঁজে-গুঁজে আখের গুছতে হবে। অসুস্থ উত্তে-

জনায় মানুষকে মাতিয়ে রেখে, মানুষকে শিবিরে-শিবিরে বিভক্ত রেখে যুদ্ধমান করে রাখতে হবে। দেয়ার ইজ নাথিং লাইক ওয়ার। ওরা লড়ে মরুক আমরা ইতিমধ্যে কোমরের কাপড়টা খুলে নি। অত্যাচারী রোমান সম্রাট কালিগুলা থেকে শুরু করে এই আশির ডেমোক্র্যাট সকলেরই এক স্ট্রাটেজি। আমি হিরো, তোমরা আমাকে ওয়ারশিপ কর। আমি আসনে বসি। তারপর এই নাও তোমাদের ব্রেড, ওয়াইন, ওয়াইফ, মেয়েছেলে থিয়েটার সিনেমা সেকস, এরিনায় রক্তাক্ত গ্ল্যাডিয়েটার, রথের দৌড়, ঘোড়-দৌড়, মাঠে ফুটবল, রাস্তায় মিছিল শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন, কে জি বি, সি আই এ পুলিশ, সিক্রেট পুলিশ, লকআপ, থার্ড ডিগ্রি, রেপ, মার্ডার, ছিনতাই, ক্যাবারে। পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে ফুটে থাকি পদ্মফুলের মত।

এই যখন অবস্থা। অবস্থা যখন কিছুতেই পালটাবে না, ক্ষমতায় যখন ভ্যাকুয়াম থাকবে না। তখন শৈশব থেকেই সকলকে কুকুরের মত ট্রেনিং দিয়ে ওবিডিয়েণ্ট কর, ওয়াচফুল কর, অ্যালার্ট কর। ভাল প্রভু হয় না, ভাল দাস হয়। ইতিহাস বলছে। নেচারের বিরুদ্ধে না যাওয়াই ভাল। ভাল কুকুর প্রভুর বড় পেয়ারের, বড় আদরের।

এবার আপনাদের সামনে আসছেন গণিতের শিক্ষক।

হ্যাঁ, আমি একজন শিক্ষক। ম্যাথেমেটিকস আমার বিষয়, আমার ভালবাসা। জীবনে আর গণিতে বিশেষ তফাৎ নেই। হিসেব করে খরচ, হিসেব করে প্রয়োগ, হিসেব করে পা ফেলা, হিসেব করে কথা বলা, হিসেবেই সুখ, বেহিসেবেই দুঃখ। গাণিতিক বুদ্ধির অভাবেই মানুষের যত ক্লেশ। শুধু কাব্য, শুধু সাহিত্যে, শুধু ভাবালুতায় মানুষের যত দুর্ভোগ। ইমোশান, সেণ্টিমেণ্ট হল গর্দভের লক্ষণ। মানুষকে হতে হবে কুল, ক্যাল-কুলেটিং। পৃথিবীটা কি? গিভ অ্যাণ্ড টেক। এক হাতে নেবে, এক হাতে দেবে। ডেবিট আর ক্রেডিট বুক কিপিং। অঙ্কে মোটা মাথা হলেই ঠকে মরতে হবে। পৃথিবীর মানুষকে দু ভাগে ভাগ করতে হবে, একদল ঠকায় আর একদল ঠকে। একদল মারে আর একদল মরে।

অঙ্কে কাঁচা হলে মানুষ প্রেমে পড়ে। প্রেম হল ন্যাবার মত।

দৃষ্টি হলুদ, জগৎ হলুদ, নিজে হলুদ, যা দেখছি সব হলুদ,। দুই আর দুয়ে যেমন পাঁচ হয় না, মানুষে-মানুষে, মানুষে মানষীতে তেমনি প্রেম হয় না। প্রেম একটা ফ্যালাসি, একটা কল্পনা, এ ফিউমিং ইম্যাজিনেসান হ্যালুসিনেসান। যা নেই তাকে সত্য বলে মেনে নেবার নির্বুদ্ধিতা। গণিতে এ সবের স্থান নেই। ইট ইজ সো প্র্যাকটিক্যাল। প্রেমে কানা ছেলে পদ্মলোচন হয়, পেঁচী হয়ে ওঠে ক্লিওপেট্রা। ফাটা কাঁসবের মত গলাকে মনে হয়ে হয় বীণানিন্দিত কন্ঠ। সেই ঘোরে মানুষ বেমক্কা ফাঁদে পড়ে ফেঁসে যায়। প্রেম-প্রেম ভাব হলেই অঙ্ক কর।

রাসেল বলেছিলেন, ছেলেবেলায় তাঁর প্রচন্ডই দুঃখকষ্ট ছিল। মাঝে-মাঝে মনে হত আত্মহত্যা করি। সেই আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে বাঁচার জন্যে তিনি গণিতের আশ্রয় নিয়েছিলেন! গণিত তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু দিস গবেট ইউনিভার্স সে কথায় সহজে কান দিতে চায় না। ইউনিভার্সিটিতে-ইউনিভার্সিটিতে বছরের পর বছর ধরে কপচে চলেছে, শেলীর রোমান্টিসিজম, কীটসের আর্টস ফর আর্টস শেক, সুইনবার্ণের লাভ, বায়রনের ডিবচারি। গুপো-গুপো ছেলে, ধুমসো-ধুমসো মেয়েরা বাপের অন্ন ধ্বংস করে সেই নেশার জগতে বছরের পর বছর জীবন নষ্ট করছে। ও মাই লাভ ও ওমাই রোমান্স বলে একজনের হাত ধরে ছ'জনে টানাটানি। গলায় দড়ি, বিষ, ঘুমের ওষুধ। তারপর বাবু-বিবিরা কলেজের বাইরে এসে শেলীকে সের দরে বেচে দিয়ে মার্চেন্ট অফিসে ঢুকে দুই আর দুয়ে চার করছেন। কলেজে অধ্যাপক হয়ে ঢুকে বছরের পর বছর সেই একই বুলি কপচে চলেছেন। সেই এক হ্যামলেট, সেই এক ওথেলো। টু মরো অ্যান্ড টু মরো, ব্রিফ ক্যান্ডল, টু বি নট টু বি। প্রেমপত্র আর লিখতে হল না। নোট লিখে-লিখে আঙুল ক্র্যাম্প। লেকচার কপচে-কপচে গলা ভাঙা, মাথায় টাক, চোখে চশমা, রক্তে সুগার।

এদিকে প্রেমিকা প্রেমপর্বের কোটেশান লাঞ্ছিত প্রেমপত্র পুড়িয়ে শাঁসাল মক্কেলের গলায় ঝুলে পড়ে ইয়া বিশাল এক গিন্নি। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অঙ্কে অনেক পাকা। ডেবিট-ক্রেডিট ভাল বোঝে। গিভ অ্যান্ড টেকে ওস্তাদ। তারা বলে, ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর।

অঙ্কে সেণ্টিমেণ্টাল প্র্যাকটিকাল হয়। এই বেনিয়ার জগৎকে ভাল করে বুঝতে শেখে। অ্যাভারেজ. রুল অফ থ্রি ইণ্টারেস্ট, টাইম অ্যাণ্ড মোশান, রিলেটিভ স্পিড, মিকশ্চার, কমপাউণ্ড ইণ্টারেস্ট, না বুঝলে ঝানু হওয়া যায় না। পারমুটেশান কম্বিনেশান জীবনের সর্বক্ষেত্রের এক চরম সত্য। অঙ্কে মাথা ভাল হলে মানুষ বুঝতে শেখে, অলওয়েজ ওয়ারশিপ দি রাইজিং সান। অঙ্কের ভাল ছাত্র কখনও চুলে কলপ লাগিয়ে বার্ধক্যে যুবক সেজে লম্পঝম্প করতে গিয়ে কোমর ভাঙ্গে না। অঙ্ক হি কেবলম। নমস্কার।

এইবার মস্তান শ্রীযুক্ত···

ঠিক আছে ঠিক আছে। আমার বেশি কিছু বলার নেই। আমার হল এক বাত, হাত থাকতে মুখে কেন! ঝামেলা দেখলেই লাশ ফেলে দাও। ও সব সাহিত্য, দর্শন, ধম্ম ফম্ম বুঝি না শালা, পকেট গরম থাকলে শরীর গরম, মেজাজ শরিফ! কেউ কাউকে অ্যায়সা কিছু দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। আদায়ের অস্ত্র ইস্পাত। পেটের কাছে ফলাটা ধর, মাল শালা আপসে বেরিয়ে আসবে। কায়দা জানলে কৃপণও দাতা হয়ে যাবে। শাস্ত্র ফাস্ত্র অনেক শুনেছি মশাই, ক্যাপিট্যালিজম মার্কসিজম, সোস্যালিজম মাছের ডিমপাড়ার মত লাইব্রেরী ফাইব্রেরী সব ছোট বড় বইয়ে ভরে গেল, পড়ে পড়ে পণ্ডিতদের ডিসপেপসিয়া হয়ে গেল, পৃথিবীর চেহারা, মানুষের চেহারা কিছুই বদলাল না। গরিব সেই গরিব, বড়লোক সেই বড়লোক। রঘু ডাকাতই সেভিয়ার। রবিন হুডই আদর্শ। বেচাল দেখলেই শালা প্যাঁদাও। দুটো লাশ ফেলে দাও সব ঠাণ্ডা। ছুরিটা দাঁতে চেপে লুঙ্গির কষি বাঁধতে বাঁধতে দাঁত চাপা মুখেই বল, কোন্ শুয়োরের বাচ্চা, বাস্ সব ঠাণ্ডা। কার ঘাড়ে কটা মাথা! একবার এগিয়ে আসুক ত দেখি। ভয় হল মূলধন, ছুরি হল ম্যাজিক। রাজনীতি, আইন, ভোট, ধর্ম, আদর্শ, নীতি, সব ছুরির কণ্ট্রোলে। ক্ষমতাই হল ক্লেশ নিবারণের একমাত্র উপায়। সকলের সব সিক্রেট আমার জানা। বেশি ঘাটালেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।

এবার শ্রীবাটপাড়িয়া।

জয় শ্রীরামচন্দ্র, পবনসুত হনুমানচন্দ্রজী কি জয়। রামরাজত্ব

এসে গেছে বাবুজী। হামার কোন ক্লেশ নেই। সিরিফ বাত ওর থোড়িসি অ্যাসিড, সামটাইমস প্রেসার, বিলকুল সব ঠিক। আউর কুছ নোহি। দুনিয়া চল রহে, হামভি চলরহে মজেসে। হামি কুছু সমঝে না। আংরেজি না, বাঙলা, না, চুনাও না। হামি সমঝে ভাও। সিরিফ এক প্রশ্ন—কেতনা ভাও। এম. এল. এ-কা কেতনা ভাও, এম. পি. কা কেতনা। জুটকা কেতনা ভাও, স্টিলকা কেতনা, ঘিউকা কেতনা। দুনিয়ানে একই চিজ হ্যায় ভাও। পিতাজিকা কেতনা, মাতাজিকা কিতনা, জরুকা কিতনা, গয়ুকা কিতনা। লেলিন কেয়া ভাও, কার্টারিকা কেয়া ভাও, খোমোয়িনিকা কেয়া ভাও। একই চিজ হাম পুছতা, কেতনা ভাও পহেলে বাতাও। দোনো চিজ এক সাথ মিলা কর, কস্টিং করকে বাজারমে ছোড়দে। হোর্ডিং, পাইলিং, লেবেলিং, সেলিং বাস। ইসসে জিয়াদা কুছ নেহি হায়। গঙ্গামে পানি বইবে, শীত আসবে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, যানে দো আনে দো। হামারা কেয়া। জনতা যায়েগা ত কংগ্রেস আই আয়েগা, ও জায়েগা ত দোসরা কোই আয়েগা, হামারা কেয়া। হামি জানে, ভাও কেতনা। রুপিয়া চেয়ে বড়িয়া কুছু নেই। হামি আইন কিনতে পারে, এম. এল. এ-এম. পি মোলতে পারে, পুলিস হামার, নেতা হামার, সরকার হামার, জগৎ হামার, হামি জগৎ শেঠ। লেকিন কেমন কোরে হামি এমন হোয়েচি? ও তো ট্রেড সিক্রেড ভাই সাব। দুনিয়ামে দোনো চিজ হ্যায়, এক খরিদ নে কা, এক বিকনেকা। বাই অ্যাণ্ড সেল অ্যাণ্ড গো অন মেরিলি। সেল দেম অল। ওয়ার্লড ইজ ফর সেল।

এইবার আমাদের কিছু বলবেন অ্যাডভোকেট।

ইয়েস থ্যাঙ্ক ইউ। একটা কথা আছে চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। বড় খাঁটি কথা। যদি কেউ ধরা পড়ে তখন আছি আমরা। এখন কথা হল আইনের সাহায্যে আমাদের ক্লেশ নিবারণ কতটা সম্ভব। আমরা মানে কারা। যে আমির টাকার জোর নেই সে আমির জন্যে আইনও নেই আদালতও নেই। সে আমি হল বুড়বাক আমি। আইন হয় ত পারচেজ করা যায় না কিন্তু আইনজীবীকে পারচেজ করা যায়। আইন ভীষণ ফ্লেক্সিবল, ব্রহ্মের মত তার শত ব্যাখ্যা। আইনবিদ সহায় হলে অপরাধ বলে

কিছু থাকে না। তবে বেআইনী ঘটনা এতই বেড়ে চলেছে যে আইন দিয়ে আর সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে ক্রিমিন্যাল সাইডে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে। ল লেস অবস্থাটাই হয়ত ল হয়ে যাবে। হত্যা আর ক্রাইম বলে স্বীকার নাও করা যেতে পারে। হত্যা এ ফর্ম অফ ভায়োলেণ্ট ডেথ নট পানিশেবল। অ্যানিহিলেসান। আমেরিকান ভাষায়, চাক হিম আউট। ইরেজ হিম। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জাস্ট মিউচুয়াল ট্রানসফার অফ প্রপার্টিস। যার আছে ভূরি ভূরি তার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেওয়া। জমিজমা সংক্রান্ত মামলা, সিভিলসাইডে থাকতেও পারে না, থাকলেও ক্ষতি নেই। দখল আর জবর দখল পাশাপাশি চলছে। আমাদের পারিবারিক অশান্তি ক্রমশই বাড়ছে।

বিগ্যামি অ্যাডালটারি শব্দ দুটো এখনও জ্বালাচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়ত আর জ্বালাবে না। ডিভোর্সের মামলাও খুব আসছে। কালে ওটাকেও আমারা তিনবার তালাক, তালাক, তালাক বলে চটপট স্বামী স্ত্রীকে আলাদা করে দিতে পারব। পারমিসিভ সোসাইটিতে সামান্য তম বাধাও যাতে না থাকে সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিত। শেষ কথা বলং, বল বাহু বলং। আইন দিয়ে অ্যামপুট করা যায়, ট্র্যানসপ্ল্যান্ট করা যায়, উকিলের চিঠি দিয়ে ভয় দেখান যায়, লাভ কি হয় বলা শক্ত। মামলা করে ডিক্রি পাওয়া যায়, ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে হলে সেই দিশী দাওয়াই দিতে হয়। ডিগ্রি থাকলে আজকাল চাকরি হয় না, মুরুব্বি ধরতে হয়। লিটিগেশান ইজ এ লেংদি প্রসেস। মামলা যখন ফয়সালা হয় উভয় পক্ষই কাত। বাঘের লড়াইয়ে শৃগাল লাভবান। আসেন।

আমি দার্শনিক। আমার কথা হল পড়ে নয়, দেখে শিখুন। যত দেখবেন তত শিখবেন। কি শিখবেন? এখানে ধনী দরিদ্র হয়, দরিদ্র ধনী হয়, সৎ অসৎ হয়, অসৎ সম্মান পায়। এক আসে, আর এক যায়। যৌবন বার্ধক্যে ঢলে পড়ে! সুখে থাকলেও মৃত্যু, দুঃখে থাকলেও মৃত্যু। সাকার বিশ্বাসী হবেন কি, নিরাকারে বিশ্বাসী হবেন যার যার নিজের অভিরুচি তবে একটা কিছু ধরা চাই। গুরু ধরুন, চেলা ধরুন, মতবাদ ধরুন, ফুটবল ধরুন, ক্রিকেট ধরুন, রেস ধরুন, ফাটকা ধরুন, যা হয় কিছু একটা

ধরার চেষ্টায়, ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি, জীবন শেষ। খেল খতম, পয়সা হজম।

রাজনীতিবিদ আপনি কিছু বলুন।

আমার একটাই কথা, আমাকে ভোট দিন। আপনারা স্বাধীন দেশের, স্বাধীন নাগরিক। ভোটের অধিকার পেয়েছেন, সে অধিকার হারাবেন না। আমি যখন যে দলেই থাকিনা কেন আমাকে ভোট দিন। টাকাকড়ি, ধনদৌলত চাইছি না, চাইছি একটা ভোট। আপনারা আমাকে ভোট দিলে আমি সুখী হব। বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। আমি একটা জীব, পলিটিক্যাল জীব, সেই জীবে দয়া মানে ঈশ্বরের সেবা, পরকালের কাজ। রাজনীতিতে বিশ্বাস হারালেও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবেন না। ঈশ্বর কখনও কারুর কিছু করছেন কি। আমরা মনে করি তিনিই সব করছেন, তিনি সব করতে পারেন, তিনি নির্ধনকে ধনী করতে পারেন, অপুত্রককে পুত্রক, অসফল কে সফল। একজন রাজনীতিকও তাই। ইলেকসানের পর তাঁকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। তিনি কি করেন, তিনি কি করবেন, তিনি কি করতে পারেন কেউ জানে না। অতএব ভোট দিয়ে সেই ঈশ্বরতুল্য রাজনীতিবিদের সেবা করুন। সেবা পরমধর্ম। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হেলেন কেলার, মাদার টেরেসা সেবা ধর্মের জন্যে জগতে বিখ্যাত! আপনারাও সেবা করুন। পরশ্রীকাতর বলে বাঙালীর বড় দুনাম। সেই দুর্নাম কাটাতে হবে। আমি যদি মন্ত্রী হই, বাড়িকরি, গাড়ি করি, টাকা করি, আমার আত্মীয় স্বজন চামচাদের অবস্থার উন্নতি করি তাতে আপনারা দুঃখ করবেন কেন, ঈর্ষা করবেন কেন, খুশি হবেন, সুখী হবেন, আমাদের গর্ব বলে লাফাতে থাকবেন, বলবেন, আহা আরও বড় হোক, আরও বোলবোলো হোক। বাঙালীর উন্নতি হোক। আগেকার দিনের জমিদারদের কথা ভাবুন। নিরন্ন প্রজারা পড়ি কি মরি করে নজর না দিয়ে যেত? জমিদারের বাড়ির ঝাড়লন্ঠন দেখে, বিশাল বাড়ি দেখে, চেহারা দেখে, বোলবোলো দেখে, ব্যাভিচার দেখে, অত্যাচার দেখে কি খুশিই না হত। সেই খুশির ভাবটা আবার ফিরিয়ে আনুন।

ত্যাগই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তুলসীদাস বলেছেন সব

ছাড়োত্র সব পাওত্র। সব ছাড়লেই সব পাওয়া যায়। রাজনীতি অতি নোঙরা জিনিস। সেই নরকে আপনাদের ভোট নিক্ষেপ করে আমাদের নরক বাসকে দীর্ঘ করুন। আপনাদের স্বার্থে আমরা নরকে যেতে প্রস্তুত আছি। নরক ভর্তি থাকলে আপনাদের আর সেখানে স্থান দেবার জায়গা থাকবে না তখন স্বর্গের পথ অটোমেটিক্যালি খোলা থাকবে। আমরা মস্তান নিয়ে, রক্তাক্ত রাজনীতি নিয়ে, দলাদলি, দল ভাঙা ভাঙি নিয়ে, কালোয়ার, কালোবাজারী, ব্যবসাদার মুনাফাখোর নিয়ে নরক গুলজার করে বসে থাকি। সমাজে বেশ্যালয় রাখা হয় যাতে লম্পটরা যার তার হাত ধরে টানাটানি না করতে পারে। বারনারী সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলেছে। রাজনীতিও তাই। রাজনীতির ম্যানহোলে আমরা পাঁক জমা করে আপনাদের পবিত্র রেখেছি। আপনারা ত্যাগে, তিতীক্ষায়, ধৈর্য, উদারতায়, দরিদ্রে, সততায় উদাসীনতায় সংসার ধর্ম পালন করে মহাপ্রস্থানের পথে চলে যান। বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। শুধু ভোটের সময় ভোট দিয়ে পবিত্র নাগরিক দায়িত্ব পালন করুন। আপনারা সকলেই দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠুন। একটা কথা জেনে রাখুন আমরা যত অসৎ হব আপনারা রিলেটিভলি ততই সৎ হয়ে উঠবেন। আর একটা কথা, আপনারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন। খুবই স্বাভাবিক, ফ্রিডাম অফ স্পিচ, ওপিনিয়ন আইডিয়া, সংবিধানের মূল কথা। সেই কারণে আমি আপনাদের সুবিধের জন্যে অনবরতই দল পালটে পালটে সর্বদলীয় চেহারা পেয়েছি। আমাকে ভোট দেওয়া মানেই সব দলকেই ভোট দেওয়া। আচ্ছা আপনারা সুখে থাকুন। আমরা, দুঃখেই থাকি। গলায় বিষ ধারণ করে নীলকন্ঠ। আন ঈজি লাইজ দি হেড দ্যাট ওয়্যারস দি ক্রাউন।

সভা শেষ। সভাপতি উঠলেন। চা এসেছে। সমিতির পয়সা কম সঙ্গে ডগ বিস্কুট। সভাপতি বললেন, মনুষ্য ক্লেশ নিবারণী সমিতির আপাতত আর কোন অধিবেশন হবে না। আমার ধারণা ক্লেশ নিবারণ করা সম্ভব নয়। ক্লেশ না থাকলে অক্লেশ মধুর হয় না অন্ধকার আছে বলেই আলো, অসৎ আছে বলেই সৎ-এর কদর, রোগ আছে বলেই আরোগ্য সুখের। ক্লেশ

আছে বলেই ধর্ম আছে, বিশ্বাস আছে, বন্ধুত্ব আছে, আদর্শ আছে, সাধনা আছে, সমাজ আছে, সংসার আছে। ক্লেশ মোচনের চেষ্টাটাই ক্লেশদায়ক। অস্কার ওয়াইলড বলেছিলেন:

philanhropy seems to have become simply
the refuge of people who wish to annoy their
fellow creatures.

হর পার্বতী সংবাদ

॥ এক ॥

বুঝলে পার্বতী।

আবার, আবার তুমি ওই রেফযুক্ত নামে আমাকে সম্বোধন করছ। বলেছি না পারু বলে ডাকবে। তোমার মুখে বড় মিষ্টি শোনায় গো। তাছাড়া এই সেদিন তোমার দাঁত বাঁধানো হয়েছে। মুখে ধরে রাখার কায়দাটা এখনও রপ্ত করতে পারনি। রেফ, র'ফলা, যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে গেলেই খুলে-খুলে যাচ্ছে। পেনসানের টাকায় একবারই দাঁত বাঁধানো যায়। বারে বারে কে তোমার দাঁত বাঁধিয়ে দেবে। বয়েস হচ্ছে, বুদ্ধি কিন্তু তেমন খোলতাই হচ্ছে না। এবার থেকে পারু বলবে। দাঁত বের করে অমন চ্যাংড়া ছোঁড়াদের মত হাসছ কেন? নতুন দাঁত দুপাটির আনন্দে!

না পারু। দাঁতের আনন্দে সেই একবারই হেসেছিলুম। মায়ের কোলে বসে। ছ বছর বয়সে। তারপর শুধু কেঁদেছি। মিষ্টি আমার দাঁত খেয়েছে। ওই তোমাদের র‍্যাশনের চালের কাঁকরে চাকলা উঠে বেরিয়ে গেছে। শেষ দাঁত আমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আমি হাসছি অন্য কারণে। ভাগ্যিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-কমিটি তোমার নাম থেকে একটা ব খুলে নিয়েছিল, তা না হলে বএ বএ রেফের ঠেলায় আমার দন্তপঙক্তির কী হত!

এক ধামা কাগজ নিয়ে সাত সকালেই পেছন উল্টে বসে আছ কেন? অন্য কাজ নেই?

গিন্নি, ভুলে গেলে? গবাক্ষপথে একবার অবলোকন কর, ওই দেখ, এসেছে শরৎ হিমের পরশ। ধামা ধামা ডাক আসছে ভক্তদের। অবশ্য হিন্দিতেই ডাকছে, আ যা, আ যা, মেরা জান, দিল পহছান। তৈরী হও। বোধন এসে গেল। এবার ল্যান্ড করতে হবে।

পুজো এবার হবে ?

কেন পারু ? পুজো কেন হবে না ?

গদিতে যাঁরা গদানসীন, আমার সেই সব সোনার চাঁদেরা ধম্ম-কম্ম মানে না রে বাপু। তারা বলে, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। বুড়ো এবার মনে হয় পুজো হবে না, বন্যা।

তোমার মাথা। প্রতি বছরই বন্যা হয়। বন্যা না হলে কী হয়, চার ছেলেমেয়ের মাকে আমি কী করে বোঝাব ? রাজনীতির হালচাল উনি আজও শিখলেন না। কচি খুকি ! বন্যা চাই, খরা চাই, খরা চাই, বন্যা চাই।

রেগে যাও কেন ? রেগে যাও কেন ? কথায়-কথায় অত রাগ ভাল নয়। একে তোমার হাই প্রেসার, তার ওপর সুগার, তার ওপর এসকেমিক হার্ট।

পারু যেখানে যাচ্ছ সেখানে ইংলিশ মিডিয়ামের জন্যে সব ক্ষেপে আছে। ট্যাকে ছেলে নিয়ে বড়-বড় স্কুলের গেটে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। তোমার মত দিদিমণিরা সব চুল বব্ করে, ঠোঁটে লিপস্টিক চড়িয়ে, লম্বা সিগারেট গুঁজে পিড়িং-পিড়িং ইংরিজী ছাড়ছে। ওই যে ইংরিজীটা বললে ওটা এসকিমোদের দেশে চলতে পারে। বলো, ইসকিমিক হার্ট।

কত্তা আমাদের ভাষা তো দেবভাষা। কোনও ভয় নেই। ওই পুজারী ব্রাহ্মণ, অনুস্বার, বিসর্গ লাগিয়ে যা বলবে তাই মন্ত্র চণ্ডীপাঠ। আমারই বন্দনা। তোমাকে আর কে চায় বলো ?

তাই তো। তাই তো। সারা শ্রাবণমাস বাঁক কাঁধে কাতারে কাতারে আমার ভক্তরা যায় কোথায় ? আজকাল আবার দু'হাত অন্তর চটি হয়। হিন্দিগানে দিনরাত বাতাস কাঁপতে থাকে। এই ভোলেবাবা পার না করলে গুরুদের কী দশা হত ! ভেবে দেখেছ একবার। আমার পয়লা ভক্ত অমিতাভ বচ্চন কী ফ্যানটাস্টিক গেয়েছে, জয় জয় শিবশঙ্কর / কাঁটা লাগে না টঙ্কর/।

ফিল্মের কিছু বোঝো না যখন বলতে যাও কেন ? অমিতাভ বাবা গায়নি। সে শুধু নেচেছে আর লিপ দিয়েছে। গান গেয়েছে গানের আর্টিস্ট। যাক ক জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ এল ? বেড়েছে না কমেছে ?

কমবে ? কমবে কেন ? বেড়েছে। শোনো সার্বজনীন

অনেকটা টিউমারের মত, আবের মত। বেড়েই চলে। বেড়েই চলে। বাঙালির জীবনে আর কী আছে বল? চাকরি নেই, বাকরি নেই, জল নেই, আলো নেই, খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, সুখ নেই, নিরাপত্তা নেই, শিল্প নেই, সংস্কৃতি নেই। থাকার মধ্যে এই পুজোটুকু আছে।

আমার ভক্তদের এ হাল কেন?

ওই যে কেন্দ্র। মহিষাসুর। এবারে আসার সময় একটু দাবড়ে দিয়ে এস তো?

কেন্দ্রটা কোথায়?

ওই যে গো, আগে যে জায়গাটাকে আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ বলতুম।

সিংহাসনে কে?

গিন্নি, তোমার জ্ঞান কমছে। ওখানে আর সিংহাসন নেই। রিপাবলিক বুঝলে, গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পাঠশালা। জনগণমন অধিনায়কেরা সুজলাং সুফলাং নৃত্য করছে। বেগোড়বাই কিছু দেখলেই মিছিল নিয়ে পথে নেমে পড়ছে, চলবে না চলবে না। কী চলবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি বলে মোটামুটি সবই অচল হয়ে আছে।

সে কী গো, তা হলে বারোয়ারি হবে তো?

বারোয়ারি ঠিকই হবে। পাবলিকের টাকায় বারো ইয়ারে ঠিক জমিয়ে দেবে। তোমার আর আমার তেমন শত্রু নেই। রাইটার্সে ভেরি পপুলার। মন্ত্রীরাও বলে ফেলেন, ভোলে বাবা পার করেগা। সিনেমার নায়িকা কেঁদে-কেঁদে বলে, ত্রিশূলধারী শক্তি যোগাও। আর তুমি তো ক্যাপিটাল গো, মূলধন। তোমাকে পেছনে রেখে, পুজো, পুজোকমিটি। বাইশের পল্লী, তেইশের পল্লী। বিল বই, চাঁদা। প্রিপুজো সেল, পুজো সেল, এক্‌জিবিসান, ফাংসান। পটুয়াপাড়ায় তুমি হাফ-ফিনিশ হয়ে এসেছ। দোমেটের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। তোমার ছাঁচে ঢালা মুণ্ডু সার-সার তাকে তোলা আছে। ঠ্যাঙে বায়নার টিকিট ঝুলছে। গেরস্থরা মার্কেটিং-এ নেমে পড়েছে। শ্যামবাজার থেকে গড়িয়া গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেছে।

বুঝলে, গতবার ভীষণ মশা কামড়েছে। এক-একটার সাইজ কী, যেন টুনটুনি বাচ্ছা! কামড়ে-কামড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে

দিয়েছে।

কার নাম? শ্বশুরমশাইয়ের? বেশ করেছে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চির অবনিবনা। হিংসে বুঝলে হিংসে। আমার পপুলারিটি ভদ্রলোক সহ্য করতে পারেন না। এবারে প্যান্ডেলে সিংহের পিঠে উঠে পোজ দেবার আগে বড়বাজার থেকে বেশ বড় সাইজের একটা নাইলনের মশারী কিনে নিও। ম্যালেরিয়া ফ্লু আর ডেঙ্গু একসঙ্গে ধরলে ধন্বন্তরির বাবার ক্ষমতা নেই সারায়।

কী হবে, গো?

আবার কী হল?

গতবারে পুলিশ না কী খুব বেঁকে বসেছিল। যেখানে সেখানে প্যান্ডেল বাঁধতে দেবে না। চাঁদা নিয়ে জুলুম করলে চ্যাংদোলা করে তুলে আনবে।

তাতে তোমার পুজোর কোনও অসুবিধে হয়েছিল। প্যান্ডেলের চেকনাই কী কিছু কম ছিল?

তা ছিল না অবশ্য।

তবে? এবারেও ঠিক তাই হবে। পুলিশ যেমন শাসায় তেমনি শাসাবে। চাঁদা যা ওঠে, তার চেয়ে বেশিই উঠবে। ভুলে যেও না গিন্নি দেশের নাম পশ্চিমবাংলা। তাই তো কবি গাহিয়েছেন; এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ/তবু রঙ্গে ভরা।

সব হবে। সব এক মঞ্চে পাশাপাশি হবে। পাতাল রেল, চক্ররেল, বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ, দাবি-মিছিল, ধর্ম মিছিল, বিয়ের মিছিল, ফুটবল, বাস্কেটবল, হকি, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যাত্রা-উৎসব, বাওলাবন্ধ, বোম, ছোরাছুরি, ভোট, ব্যালে নাচ, ম্যাজিক, সার্কাস, বন্যা, খরা, বনমহোৎসব, বননিধন, সব পাশাপাশি চলবে। বাপের শ্রাদ্ধ। ছেলের বিয়ে। তুমি কিস্যু ভেব না।

সরস্বতীটা একটু বেঁকে বসেছে। বলে রাজ্যপাল রাজভবন থেকে না নড়লে ও যাবে না।

সেরেছে। ও আবার রাজনীতিতে নাক গলিয়েছে! মাথায় ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেবে। ওকে বল এ পুজোয় ওর তো বীণা হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোনও ভূমিকা নেই। এ তো তোমার পুজো। সেই মাঘে ওকে যখন একা যেতে হবে, তখন যেন নিজের মত খাটায়। বিশ্বকর্মাকে দেখে শিখতে বল। কল নেই,

কারখানা নেই। শিল্পের সমাধিতে কেমন হাতি চেপে ঘুরে এল চলছে-চলবে-র দেশ। ওখানে সবই তো খেলা গো!

পুজোও খেলা?

আলবাৎ। পুতুল খেলা। মা-মা করে চেল্লায়, তুমি ভাব খুব ভক্তি! গিন্নি, তুমি হলে বেওসা। মা আসছেন, মা আসছেন, ঘোড়ার ডিম, আসলে পুজোর বাজার আসছে। বাবুদের বোনাস আসছে। যাদের 'ভাঁড়ে মা ভবানী' তাদের আতঙ্ক আসছে। দোকানে ঝুলছে শাড়ি। সিল্ক, জর্জেট, পলিয়েস্টয়ার, পিওর সিল্ক, অরগ্যাঞ্জা। ঝুলছে পোশাক। টপলেস, বটমলেস।

সে আবার কী?

দেবী হয়ে বসে আছ। চিরকাল চেয়ে রইলে পায়ের তলায় হামাগুড়ি অসুরটির দিকে। ক্যাপটেন কার্তিককে শুধিও, সে ছোঁড়া সব জানে। পোশাকের চেয়ে স্টাইল বড়। সিথ্রু কী বস্তু জানো গিন্নি? বলতে শরম লাগে। তোমার বয়েস না হলে পরাতুম। শাড়ি পরেছ কী পরনি। তোমার কাঠামোটি পুরো দেখা যাবে। যেন একসরের চোখ দিয়ে তোমাকে জগদ্বাসী জুলজুল করে দেখছে। তোমার ডায়াগ্রাম নয় স্কায়াগ্রাম।

মরণ আর কী! ফ্যাশানের মুখে ঝাড়ু মার।

আর বটমলেস, টপলেস কী জানো? বাক্স আছে,মাল নেই। খুলে পরো। কী পরো? মায়া কাঁচুলি। সব খোলা! উদোম। সিক সিক সিটি। সাধে আমি একটি পাথরের লিঙ্গ হয়ে মন্দিরে-মন্দিরে বসে আছি। চোখ, নাক, কান, মুখ, হাত, পা, দেহ কিছুই নেই।

হ্যাঁ গো, এবার কী রঙের শাড়ী পরে যাব? টকটকে লাল? না ফিকে লাল? নির্বাচনের ফলাফল তো ফিকের দিকে!

গিন্নি, তোমার মাথাটিও গেছে! শাড়ির সঙ্গে রাজনীতি জুড়ছ। চিরকাল তুমি তো খড়ের পোশাক পরেই যাও, তারপর যে বারোয়ারি তোমাকে যেমন সাজায়।

দেব, রাজনীতি ছাড়া ওদেশে আর কী আছে! আর পুজোর প্রাক্কালে ঘরেঘরে গৃহিণীদের শাড়ি পলিটিক্স। মনের মত দিতে পারলে ভোলে বাবা জিন্দাবাদ। নইলে মুর্দাবাদ, কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

॥ দুই ॥

এই যে ঠাকুর সাতশোবার ডায়াল করলুম কানেকশন পেলুম না। কেন চিন্তা করছেন? মা ঠাকরুণ ভালই আছেন। ভালই থাকবেন। বারোয়ারীবাবুরা আর যাই করুন, যত্নের ত্রুটি করেন না। প্যাণ্ডেলটি ভালই বাঁধেন। আজকাল আবার ফ্যান ফিট করেন। খুব বাহারও দেন। কোনওটা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মত। কোনওটা লাট ভবনের মত। কোনওটা যাদুঘরের মত। কেন আপনি দুশ্চিন্তা করে মৌতাত নষ্ট করছেন? মা আমাদের ভালই আছেন।

কেন ফ্যাচোর-ফ্যাচোর করছ। বাঙালিবাবুদের হাওয়া গায়ে লেগেছে। তেনাদের স্লোগান হয়েছে, 'আসি যাই মাইনে পাই, কাজের জন্যে ওভারটাইম।' সাতশোবার করেছ, আরও সাতশো-বার কর। মায়ের কী আর যৌবন আছে? বেচারার বয়সও হয়েছে, তার ওপর ভক্তদের টানা হ্যাঁচড়া। যে দেশে গেছে সে দেশের খবর কিছু রাখো? রাস্তায় বড়-বড় গর্ত। ম্যানহোলের মুখ খোলা। রাস্তার দুপাশে ড্রেনের পাঁক তোলা। তার ওপর পৌর ধর্মঘটে টনটন আবর্জনা জমে আছে। তার ওপর শহর পাতালে যাবার চেষ্টা করছে। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তোমার কোনও ধারণা নেই। ওখানে আমার চ্যালারা লড়ে যেতে পারে। ছিলিমের জোরে আমি পার লাগাতে পারি। আমার বউ কী তা পারবে। বছরের পর বছর এক ঠ্যাঙে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে পায়ে 'ভেরিকোস ভেন' হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীকে কী তুমি ট্র্যাফিক পুলিশ ভেবেছ? যাও আবার ডায়াল কর।

সাতশো কেন, সাত হাজার বার আমি ডায়াল করব। ঠাকুর ওদেশে শুধু গণতন্ত্র নয়, সবই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ফোন আছে কিন্তু ঘড়ঘড় নেই।

ডায়াল ওয়ান নাইন নাইন।

প্রভু সে রাস্তাও আমি ধরেছিলুম। কো-কো করছে।

এনগেজড। ওটা এনগেজডই থাকে প্রভু।

তাহলে আমাকেই নামতে হচ্ছে। আমার বাহনটাকে ধরে আনো। ওই যে ছাইগাদায় শিং ঘষছে।

ঠাকুর এই টাইমে ষাঁড় তো শহরে ঢুকতে দেবে না।

কে বলেছে ঢুকতে দেবে না। খোদ অফিস টাইমে, সকাল নটার সময় পাল-পাল মোষ পাশ করছে টালার ব্রিজের ওপর দিয়ে! এই সেদিন আমি দেখে এলুম। আমি ভি আই পি রোড দিয়ে ঢুকব।

ঠাকুর ওটা মন্ত্রীদের রাস্তা। ভি আই. পি-দের রাস্তা। ভোলেবাবাকে যেতে দেবে না। ধরে মেরে দেবে। তখন বুঝবেন মজা। এই বুড়ো বয়েসে কচুরি ধোলাই খেলে প্রাণবায়ু খাঁচা ছেড়ে পালাবে। পানা-পুকুর থেকে লাশ উদ্ধার হবে। বলবে ছত্রিশটা অপরাধের দাগী আসামী। খাতায় নাম ছিল। দলেরই কেউ-কুপিয়ে দিয়েছে।

কী বলছিস রে হারামজাদা! আমি ভি, আই, পি, নই?

না প্রভু। আপনার এয়ার কণ্ডিশানড গাড়ি নেই। সাইরেন নেই। দল নেই। দলে এম, এল, এ, নেই। আপনি প্রভু মেয়েলি দেবতা। সেকালের মেয়েরা শিব গড়ে জল ঢালত আর মনের মত বর পেত। একালের মেয়েরা থোড়াই আপনাকে কেয়ার করতে চায়। ফ্রি-মিকসিং-এর যুগ। মোড়ে-মোড়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস। হাত ধরে ঢুকছে। মিস্টার-মিসেস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। না পোষালে দু'জনে দু রাস্তায় আদালতে গিয়ে ঢুকছে। মিসেস মিস হয়ে মিস্টারের খোঁজে বেরুচ্ছে। জীবন খুব সহজ করে নিয়েছে ঠাকুর। আপনার শোভা এখন ক্যালেণ্ডারে। আর পঞ্জিকার আখড়ায়।

বলিস কী?

ঠিকই বলছি প্রভু!

দ্যাখো-দ্যাখো। ঘণ্টা বেজেছে। আপনিই বেজে উঠেছে। এ মনে হয় সেই ফোনটা, যেটার সেদিন শ্রাদ্ধ হল চেম্বার অক কমার্সের বাইরে।

হ্যালো! কে, মা বলছেন? আচ্ছা-আচ্ছা। ধরুন বাবা কথা বলবেন। হ্যাঁ বড় উতলা হয়েছেন।

কে পারু ? ভালভাবে পেঁচেছ ?

ভালভাবে মানে ? জানো আমার কী হয়েছে ? একটা হাত খুলে পড়ে গেছে।

তা যাকগে। তোমার তো দশটা হাত গো। একটা গেলে কী হয়েছে। তুমি তো আর রেজেস্ট্রি অফিসের কেরানী নও যে দশ হাতে ঘুষ নেবে ?

তা-তো বলবেই।

কী করে ভাঙলে ? টেম্পো গর্তে পড়ে গেল। বুঝলে কর্তা নাকটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

সে কী ! আহা অমন নাক। ওই জন্যেই বলেছিলুম ওদেশের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না। বুড়োর কথা শুনলে না ! এখন কী হবে ?

একটা পাহাড়ের খাঁজে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কে একজন বিলিতি আঠার খোঁজে বেরিয়েছে বলছে, সে আঠায় কাটা মুণ্ডু জুড়ে যায়। হাত তো সামান্য জিনিস !

আর নাক ?

বলছে, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। হাতটা গুণতিতে আসে। দশভুজের এক ভুজ গেলে পাবলিক ধরে ফেলবে। নাকটা মেকআপেই ম্যানেজ হয়ে যাবে। আজকাল নাকি মেকআপের যুগ।

ভুরু আছে না কামিয়ে দিয়েছে ?

নেই। প্লাক করে তুলি দিয়ে টেনেছে। ভুরুর বাহার দেখলে এই বয়েসেও তুমি ভড়কে যাবে।

তাই নাকি ? সুইট ডারলিং। কী পরিয়েছে ?

জিনস আর কুর্তা পরাতে চেয়েছিল। পারেনি। আমার পোজ আর দশটা হাতের জন্যে। শেষে স্যাররা-রারা-রারা-রারা পরিয়েছে।

সে আবার কী ?

বোম্বেতে খুব চলছে গো।

সে যাই পরাক, তাতে তোমার লজ্জা নিবারণ হয়েছে তো ?

মোটামুটি।

উঠেছ কোথায় ?

আমাদের পেছনেই মনে হয় ধাপা। খোঁটায় বেঁধে রেখেছে

তাই, নইলে সপরিবারে কৈলাসের দিকে দৌড় লাগাতুম। সরস্বতীটা বেঁচেছে। ডাস্ট অ্যালার্জিতে সর্দি হয়েছে। লক্ষ্মী কাল থেকে ফোঁস-ফোঁস করছে আর বলছে বোম্বে পালাব।

আরে বাঙলার লক্ষ্মী তো বোম্বেতেই পালিয়েছে, আর নতুন করে কী পালাবে? কী রকম জমেছে?

মোটামুটি। সব কিরকম ভ্যাবলা মেরে গেছে।

চাঁদা নিয়ে লাশটাশ পড়েছে?

এখনও রিপোর্ট পাইনি।

গান চলছে, গান?

মিউ মিউ করে। লোডশেডিং হচ্ছে খুব।

শোনো গিন্নি একটা কথা বলি, কোনও ব্যাপারে নাক গলিও না। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কারুর কোনও প্রার্থনা থাকলে, তুমি শুনো না। স্রেফ বলে দিও ওটা অসুরের ব্যাপার। আমি ওর মধ্যে নেই বাবা। যাক তুমি তাহলে ভালই আছ। হ্যাঁ শোনো, বারোয়ারির হিসেবে লেখা থাকে পাঁচ পয়সার সিদ্ধি। আসার সময় পুরিয়াটা নিয়ে এসো। গণশা কী করছে।

আহা, বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে গো। নাক ডাকছে।

শোনো দুম করে না জেনে অসুর-টসুর মেরে বোসো না। কে কোন্ দলের জানা না থাকলে ক্ষুর চালিয়ে দেবে।

পাগল হয়েচো কর্তা! আমি কী সেই মেয়ে? এত কাল অসুর মারবো মারবো করেছি। সত্যিই কী মেরেছি। অসুর না থাকলে আমার পুজোই তো বন্ধ হয়ে যাবে!

গিন্নি তুমি থানার বড় দারোগা কেন হলে না গো?

॥ তিন ॥

আচ্ছা মহেশ্বর, তুমি বলতে পার গণতন্ত্র জিনিসটা কী বস্তু! আমি জগৎ সৃষ্টি করলুম, প্রজা সৃষ্টি করলুম। পৃথিবীকে ঘুরিয়ে দিলুম লাট্টুর মত। বলে দিলুম, রাজার কর্তব্য কী, প্রজাপালন কীভাবে করতে হয়! সমাজ কীভাবে গড়ে উঠবে। সামাজিক রীতিনীতি কী হবে। মোটামুটি সবই তো বলে দিয়েছিলুম। তারপর কী হল বলতো মহেশ্বর?

সব তালগোল পাকিয়ে গেল প্রভু। খোদার ওপর খোদকারি। আপনার মানুষের মত বেয়াড়া জীব আর দুটি নেই। আপনার সৃষ্টির কলঙ্ক। আপনার মুখে চুন-কালি লেপে দিয়েছে। টাকা আর ক্ষমতা। ক্ষমতা আর টাকা, এই হয়েছে ধ্যান-জ্ঞান। কামিনী আর কাঞ্চন, অমৃতের পুত্ররা এই নিয়েই মেতে আছে প্রভু। এ ওকে গুঁতোচ্ছে, ও একে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের বাঁদরামি এত বেড়েছে, আপনার আসল বাঁদরেরা হাঁ হয়ে গেছে।

বাঁদর থেকে ধাপে-ধাপে আমি মানুষ সৃষ্টি করেছিলুম, ধাপে ধাপে আবার বাঁদর হয়ে যাচ্ছে না, তো মহেশ্বর?

কী জানি প্রভু। আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।

চল না একবার দেখে আসি। আহা ওরা তো আমারই সন্তান।

প্রথমে কোন দেশে নামবেন?

কেন, ভারতে? ভারত হল পুণ্যভূমি। গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা যে দেশে প্রবাহিত। যার উত্তরে দেবতাদের আবাসস্থল, হিমালয়। যুগ-যুগ ধরে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা সেই গিরিকন্দরে বসে দিবা-নিশি আমার নাম করে চলেছে। যে দেশের দক্ষিণ-তটভাগে সমুদ্রের অবিরত চুম্বন। সেই তীর্থভূমি ভারতেই চল আমরা অবতরণ করি। স্বাধীনতা সেখানে প্রবীণ হতে চলেছে। বয়েস হল একচল্লিশ। চল চল মহেশ্বর, গণতন্ত্রের সেই পীঠস্থানে চল।

মহেশ্বর এই সেই হিমালয়?

হ্যাঁ প্রভু, এই সেই গিরিরাজ।

কিন্তু এ কী ! সেই পুণ্যভূমির এ অবস্থা কেন ? এখানে, ওখানে, সেখানে ডান্ডা পোঁতা ঝান্ডা, হু-হু বাতাসে উড়ছে। কারণটা কী মহেশ্বর ?

প্রভু এক্সপিডিসান। এদেশ, ওদেশ, সে দেশ সারা বছরই, কোন না কোনও সময়ে পর্বত অভিযানে আসছে। এ দল এপাশ দিয়ে ওঠে তো ওদল ওপাশ দিয়ে। দেশে-দেশে প্রতিযোগিতা। মাউন্টেনিয়ারিং এখন একটা ফ্যাশান। মনে নেই প্রভু, এভারেস্টের মাথায় হিলারি আগে উঠেছিল, না তেনজিং আগে, এই নিয়ে কী ঝামেলা।

বেশ সে না হয় হল। ছেলেমানুষরা অমন করেই থাকে। আমরাও যখন ছোট ছিলুম, তখন ঢিবি দেখলেই চড়ে বসতুম। কিন্তু এত আবর্জনা কেন চারপাশে ! এ তোমার কলকাতা না করাচী !

ওই যে প্রভু, দলে-দলে যারা এক্সপিডিসানে আসে তারা ফিরে যাবার সময় টন-টন মাল, কাগজ, কৌটো হ্যানা-ত্যানা ফেলে রেখে যায়। কে আর পরিষ্কার করে প্রভু ! ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে।

মহেশ্বর, ভারতীয়রা দেবতাত্মা হিমালয়কে এইভাবে, এঁটো-কাঁটা ফেলে মাহাত্ম্য নষ্ট করছে ? বেদ-বেদান্তের দেশের মানুষ কী শেষে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে গেল !

ঈশ্বর ! কিছু মনে করবেন না প্রভু ! আপনাকে, আপনার সন্তানরা কবর দিয়ে দিয়েছে। বেদ আছে বেদান্ত আছে। গীতা আছে। কয়েকশো ব্যাখ্যা আছে। মন্দির আছে, মসজিদ আছে, গীর্জা আছে, গুরু আছে, চ্যালা আছে, মেলা আছে, প্রণামী আছে, সব আছে, কেবল আপনিই অনুপস্থিত।

মহেশ্বর আমার এ দশা হল কেন ?

মানুষকে অত পাওয়ার দিলে এই রকমই হবে প্রভু। পিতা হয়ে পিতার কর্তব্য করেননি। শাসনের অভাব। আদরে সব বাঁদর হয়ে গেছে। পায়ের জিনিস এখন মাথায় উঠে নাচছে। ধর্ম-কর্ম সব গেছে। থাকার মধ্যে আছে রাজনীতি। আপনাকে ভজে-ভজে মানুষের খুব আক্কেল হয়ে গেছে। পায় তো ঘোড়ার ডিম। কেউ তারকেশ্বর, কেউ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের আয় না

জুটলেও আপনার সেবা ঠিকই চড়ায়। পাণ্ডা আর সেবাইতদের পেট মোটা হয়। ঐশ্চর্য বাড়ে। নিজেরা পায় কাঁচকলা। ছেলের চাকরি জোটে না। স্বামীর ক্যান্সার ভাল হয় না। কেউ দুর্ঘটনায় মরছে। কেউ ছুরি খাচ্ছে। সোনার সংসার এক কথায় ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আপনার ওপর মানুষের আর আগের মত বিশ্বাস নেই।

কেন মহেশ্বর, আমি তো বলেই দিয়েছি কর্মফলেই এইসব হয়।

ওই পুরনো যুক্তি মানুষ আর মানতে চাইছে না। সায়েবদের হাওয়া গায়ে লেগেছে। নিৎসে কী বলেছে জানেন, দি গড ইজ ডেড। আপনি মারা গেলেন।

সে আবার কে ?

সে এক পাগল দার্শনিক। হিটলারের গুরু।

হিটলার ? ও সেই পাগলাটা, যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়েছিল। ওর দোষ নেই মহেশ্বর। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব আমারই খেলা। মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যে এসব আমারই ব্যবস্থা। নাও চল, এই বরফের টঙে চড়ে আমার আর ভাল লাগছে না। শীত-শীত করছে। আমার স্বর্গে তো চির বসন্ত।

প্রভু এই হল আমাদের সেই কাশ্মীর। যাকে ভূস্বর্গ বলে মানুষ নাচানাচি করে। সারা বছর ক্যামেরা কাঁধে ট্যুরিস্টরা এসে গুলমার্গ, সোনমার্গে বরফের ওপর কাঠের জুতো পায়ে হড়কে হড়কে বেড়ায়।

তাই না কী, এই তোমার সেই কাশ্মীর। এইখানেই তোমার সেই জাফরানের ক্ষেত। আহা কী শোভা !

আর এগোবেন না প্রভু। গুলি করে দেবে। শ্রীনগরে কারফ্যু।

কারফ্যু ? সে আবার কী ?

ও হল মানুষের জগতের নিয়ম। রাস্তায় বেরিয়েছ কী মরেছ।

তার মানে ? ভূস্বর্গে লোকে বেড়াতে আসবে না ?

এর নাম রাজনীতি মালেক। এটা তো বর্ডার স্টেট। সেই স্বাধীনতার পর থেকেই একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। ওপাশে পাকিস্তান, এপাশে হিন্দুস্তান। হাত ধরে টানাটানি।

মা আমার ধর্ষিতা। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

আমার কৃষ্ণ কোথায়। সুদর্শন চক্র কী আর ঘোরে না।

প্রভু এক কুরুক্ষেত্রেই কৃষ্ণ কাত। গীতায় কিছু বাণী রেখে তিনি সরে পড়েছেন। চক্র এখন ছবি হয়ে আটকে আছে ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকায়।

তাহলে আমি আর একজন কৃষ্ণ তৈরি করি।

সে কৃষ্ণ শুধু বাঁশীই বাজাবে প্রভু। আর রাধার সঙ্গে প্রেম করবে। গণতন্ত্রে ভোট যুদ্ধই একমাত্র যুদ্ধ।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল মহেশ্বর। পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমার কোনও ডিগ্রি নেই।

ডিগ্রি ডিপ্লোমার ব্যাপার এদেশ থেকেও ঘুচে গেছে প্রভু। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গাতেই এখন পেটো-পটকার খেলা। দু'দলে কাজিয়া। ভিসিরা ঘেরাও হয়ে বসে থাকে মল-মূত্র চেপে।

ভিসি মানে ?

ভাইস চ্যান্সেলার মালিক। কে ভাইস চ্যান্সেলার হবে, সেই ফাঁপরে পড়ে পশ্চিমবাংলার রাজ্যপালকে রাজভবন ছেড়ে পালাতে হয়েছে। ওরা এখন বলছে, রাজ্যপালের পদটাই তুলে দাও।

ওরা মানে ?

ওই যারা বাম আর কী ?

মানুষের আবার বাম ডান আছে না কী ! আমি তো ওদের দুটো হাত দিয়েছিলুম। একটা ডান আর একটা বাঁ। তা শুনেছি সরকারী অফিসে বাঁ হাতের কারবার হয়।

ঠিকই শুনেছেন। তবে রাজনীতিরও বাম ডান হয়েছে। আমেরিকা যাদের টিকি ধরে আছে, তারা হল ডান। আর রাশিয়া যাদের কান ধরে আছে তারা বাঁ। তারা কেবল বলছে বিপ্লব, বিপ্লব। আগে বিপ্লব, তারপর জীবন ! বলছে লড়ে যাও।

কার সঙ্গে লড়বে ?

নিজেদের সঙ্গেই। রামের সঙ্গে শ্যাম, শ্যামের সঙ্গে যদু। এইতো সেদিন পশ্চিমবঙ্গে এক রাউন্ড হয়ে গেল। পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর।

মন্ত্রীতে-মন্ত্রীতে লড়াই ! কী নিয়ে হল ?

প্রভু, পৃথিবীর সব লড়াইয়ের মূলে তিনটি জিনিস, জমি, মেয়েমানুষ আর টাকা নিয়েই হল। এ বলে, রুপেয়া লে আও, ও বলে কাঁহা রুপেয়া। শ্রেণী সংগ্রাম প্রভু। যার আছে সে দেবে না। যার নেই, সে ছাড়বে না।

এই বললে বামে ডানে লড়াই। এখন বলছ বামে-বামে লড়াই।

প্রভু কত রকমের বাম আছে জানেন? মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ও আপনার না জানাই ভাল। ভোট যুদ্ধের কথা শুনুন।

কিছু বুঝব না তো?

খুব সহজ। লোহার ফুটো বাক্সে লোকে ছাপমারা কাগজ ফেলবে। কিছু লোক নিজে-নিজে ফেলবে। কিছু লোকের হয়ে অন্যে ফেলবে। তাকে ইংরিজিতে আগে বলত প্রক্সি এখন বলে রিগিং। সেই ভোটে একগাদা এম. এল. এ. হয়। এম. এল, এ. থেকে মন্ত্রী। মন্ত্রী থেকে একজন মুখ্যমন্ত্রী। ওদিকে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী। তারপর দাবার খেল। দান ফেল আর দান তোল। মন্ত্রীসভা ফেল। এম. এল. এ. কেনো। আর এক মুখ্যমন্ত্রী বসাও। গোলাগুলি, কারফ্যু। আবার তাকে ফেল, ফেলে আর একজনকে বসাও। ফেলা-তোলা এই হল দাদা তোমার খেলা।

সারা দেশ জুড়ে এই ইয়ারকিই চলছে বুঝি! তা প্রজা-পালনের কী হচ্ছে?

কাঁচকলা হচ্ছে মালিক। রাজা-মহারাজাদের আমলে প্রজা-পালন হত। এক রাজা আর তার চেলারা কত খাবে প্রভু। দেশের মানুষ তখন খেতে পেত। রাস্তাঘাট হত। পুকুর কাটানো হত। জলের ব্যবস্থা হত। মন্দির প্রতিষ্ঠা হত। উৎসব হত। গণতন্ত্রে প্রজা নেই, আছে ভোট। আর আছে শয়ে-শয়ে এম. পি. এম. এল. এ, মন্ত্রী। প্রভু তারা ভাল থাকলেই হল। খাচ্ছে-দাচ্ছে, ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। আর একবার এ দল, একবার ও দল করছে। প্রজাপালন সেকেলে ব্যাপার মহারাজ। তাদের জন্যে একটা সংবিধান আছে। তাও সাতশোবার জোড়াতালি মারা হয়েছে।

এ তুমি আমাকে কোথায় আনলে মহেশ্বর।

আপাততঃ আপনার পায়ের তলায় ভূস্বর্গ কাশ্মীর। শেখ আবদুল্লার জমিদারী ছিল। ফারুক আবদুল্লা দখলদারী নিয়ে-

ছিল। কেন্দ্র ল্যাং মেরে দিয়েছে।

তখন থেকে কেন্দ্র-কেন্দ্র করছ। কেন্দ্রটা কী।

আজ্ঞে দিল্লি। ইন্দিরার রাজধানী।

অ সেই জওহরলালের মেয়ে!

আজ্ঞে মায়েপোয়ে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এক ছেলে বিমান ভেঙে খসে গেছে তার বউ আবার একটা দল করে শাশুড়ীকে ল্যাং মারার তাল খুঁজছে। বড় পোলা সিংহাসনে বসার জন্যে মায়ের পেছন-পেছন বিলিতি বউ নিয়ে ঘুরছে। আবার মটোরগাড়ির কারখানা খুলেছে। আর ওই দেখুন প্রভু ডাললেকে সারি-সারি হাউসবোট। জনপ্রাণী নেই। কেউ আর বেড়াতে আসে না। গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ট্যুরিস্ট এলে তবেই না তাদের গলা কেটে সারা বছর চলবে। পানি আছে, দানা নেই। দানার মধ্যে আছে বুলেট। একটা খেলেই এ রাজত্ব থেকে আপনার রাজত্বে।

মহেশ্বর গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছ?

পাচ্ছি প্রভু। একটু দূরে। অমৃতসরে লড়াই হচ্ছে।

কে আক্রমণ করলে?

কেউ না। নিজেদের মধ্যেই হচ্ছে। দেশটাকে শতটুকরোর চেষ্টা চলেছে। পাঞ্জাব দু'টুকরো হয়েছে। আরও একটুকরো করার তালে কিছু লড়াকু লোক বিদেশী মদত নিয়ে স্বর্ণমন্দিরে ঢুকে বসে আছে। কেন্দ্রের সেনাবাহিনী কামান দাগছে।

হায় ঈশ্বর!

আপনি নিজেই তো ঈশ্বর প্রভু। আপনার সন্তানদের খেল দেখুন।

শুনেছিলুম স্রষ্টা সৃষ্টি থেকে মহান। মহেশ্বর এ যে দেখি সৃষ্টিই মহান! আমার আর বেঁচে থেকে কী হবে? কোথায় আমার গুরু নানক। গুরু গোবিন্দ। তাদের একবার ডাক।

কোনও লাভ নেই প্রভু। হয় আমেরিকা না হয় রাশিয়াকে ডাকুন।

চল তাহলে ইন্দিরার কাছে যাই।

প্রভু দেখা হবে না। তিনি এখন অন্ধ্র নিয়ে ন্যাজেগোবরে।

অন্ধ্রে আবার কী বাঁধালে?

আমি বাঁধাব কেন? নিজেরাই লাগিয়ে বসে আছে। ফিল্মের

এক কৃষ্ণ, নাম তার রাম রাও চৈতন্য রঙ্গমে চেপে একেবারে রমরম করে রাজ্য-সিংহাসনে বসেছিল। বেশ চলছিল! প্রায় একবারে সাধু হয়ে গিয়েছিল। শেষে বিকল হৃদয় সারাতে গিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে এসে দেখে শ্যালক সিংহাসনে চেপে বসে আছে। কেন্দ্র খুব তো দড়ি টানাটানি করছিল। রামবাবু আবার অ্যায়সা চাল দিলেন শ্যালক চিৎপাত। মাঝখান থেকে হায়দারাবাদে কম্যুনাল রায়টে সব চৌপাট হয়ে গেল।

এসবের কী মানে মহেশ্বর?

প্রভু এর নাম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যশাসন। যেখানে দেশের চেয়ে গদী বড়। প্রজার চেয়ে চামচা বড়। আইনের চেয়ে ক্রাইম বড়।

ধরো।

কাকে ধরব পরমেশ্বর?

ইন্দুকে ফোনে ধর।

হ্যালো। হ্যালো।

হ্যালো, প্রাইমমিনিস্টারস সেক্রেটারিয়েট।

ইন্দু আছে।

কে ইন্দু?

তোমাদের প্রধানমন্ত্রী গো! বল পরমেশ্বর কথা বলবেন।

পরমেশ্বর। সে আবার কে? কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী?

বল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি প্রধান তিনি কথা বলবেন।

পি. এম. পাগলদের সঙ্গে কথা বলেন না।

অ তাই নাকি? আচ্ছা সে কথা আমি খোদ মালিককে জানাচ্ছি। প্রভু, পি. এম. আপনাকে পাগল ভেবেছেন। তার পি-এ বলছে, প্রধানমন্ত্রী পাগলদের সঙ্গে কথা বলে না।

আচ্ছা তাই নাকি! তাহলে বাতাস-তরঙ্গে সরাসরি তার সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়!

কোনও প্রয়োজন নেই। প্রভু, আমি বরং একটু মজা করি। আবার একবার ফোন করি।

হ্যালো।

প্রাইম মিনিস্টারস··

মহেশ্বর বলছি।

কে মহেশ্বর প্রসাদ সিং ?

না শুধু মহেশ্বর। ভক্তরা বলে ভোলামহেশ্বর। তোমার মালিকানকে বল ক্ষোদ পরমেশ্বর কথা বলতে চেয়েছিলেন, তুমি যাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিলে। মা-মণিকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিও. নির্বাচন তো এসে গেল।

মহেশ্বর ফোন ছেড়ে দিলেন।

কী মনে হল পি, এম, কে তার পি এ একবার জানালেন, কে এক মহেশ্বর ফোন করেছিল, বলেছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। পাগল ভেবে লাইন দিইনি। আবার ফোন করে বললে, বলে দিও নির্বাচন আসছে। তারপর লাইন ছেড়ে দিলে।

পি, এম, লাফিয়ে উঠলেন, মূর্খ ? আমার সব সাধনা ব্যর্থ করে দিলে। আমি কখনও বেলুড়, কখনও তিরুচেরুপল্লী, কখনও আকালতখ্তে গিয়ে রাতের পর রাত সাধনা করে যাঁকে নামিয়ে আনলুম, তাকে পাগল বলে ভাগিয়ে দিলি গাধা! সামনের নির্বাচনে আমার ফিউচার তোরা ভাবলি না। এখুনি যোগাযোগ কর ফোনে।

মাতাজী ভগবানের ফোন নম্বর যে পৃথিবীর ডাইরেক্টারিতে নেই।

তুমি মরে ভূত হয়ে জেনে এস।

দেশের প্রায় সবাই তো মরে এসেছে দিদি। আর তাড়াহুড়োর কী দরকার। আপনি আর পরমেশ্বর ছাড়া এরপর আর তো কেউ থাকবে না।

সব কটা স্যাটেলাইট একসঙ্গে চেষ্টা করতে লাগল—হ্যালো পরমেশ্বর. হ্যালো। কলকাতার সব ফোন বিকল ? কারণ, সব ফোনই পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। হ্যালো পরমেশ্বর।

। চার ।।

মহেশ্বর ?

প্রভু !

এই হিমালয়েই তো তোমার সামার হাউস তাই না।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশির ভাগ সময়েই তো আমাকে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে হয়। তারকেশ্বর, দারকেশ্বর, কল্যাণেশ্বর। পারুকে একা থাকতে হয়তো প্রভু। মানব, দানব, দেবতা কারুর চরিত্রই তেমন সুবিধের নয় মহারাজ! কী স্বর্গে, কী মর্তে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির তো শেষ নাই। তাই পাহাড় দিয়ে, হিমাবহ দিয়ে, গুহা দিয়ে, গহ্বর দিয়ে পারুকে নিরাপদে রাখা !

তখন থেকে পারু-পারু করছ কাকে !

প্রভু, পার্বতীকে আমি আদর করে পারু বলে ডাকি। শরৎ-বাবু বলে এক লেখক ছিলেন। তাঁর দেবদাস এক সাংঘাতিক প্রেমের বই। সেই বইয়ের প্রেমিক দেবদাস তার নায়িকাকে পারু পারু বলে ডাকত। কি সুন্দর ?

সিনেমাটা আমি দেখেছি।

সে তো মর্তের ব্যাপার প্রভু।

.গবেট। স্বর্গ যার মর্তও তার। আর তুমি, তুমি জানোই তো, যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই আমি। যেখানে মৃত্যু সেইখানেই যম। শরৎ অমন একটা যুবক-যুবতী-চিত্ত কাঁপান সাহিত্য সৃষ্টি করলে কী করে !

কলমের জোর ছিল প্রভু। দেখবার চোখ ছিল। লিখে ফেললে গড় গড় করে।

তোমার মাথা। শরৎ কেন লিখবে ! সে তো উপলক্ষ মাত্র। লিখেছি তো আমি। শরৎকে মিডিয়াম করে। আমার অনুপ্রেরণা ছাড়া তার সাধ্য ছিল লেখার ?

শুনে খুব খারাপ লাগছে প্রভু। যিনি লেখেন তিনি নিজের আদলে নায়ক চরিত্র সৃষ্টি করেন। প্রভু, দেবদাস তাহলে আপনি ? ছি, ছি। কি কেচ্ছাই না করলেন। মদ খেয়ে মেয়েছেলের বাড়ি

গিয়ে। টাব ধরিয়ে। কাশতে-কাশতে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে টেঁসে গেলেন। এটা কেমন ধারা সৎ দৃষ্টান্ত হল পরমপ্রভু! বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, ঠিক আছে। কিছু-কিছু এদিকসেদিক থাকলেও দেবভাবে ভরপুর। কিন্তু দেবদাস! ওই কি দেবতার দাস হল প্রভু। রমণী আসক্ত, মদাসক্ত। পারুটাকে ছিপ দিয়ে কি পেটান না পেটালেন একদিন! লোক তাহলে খুব সুবিধের নন আপনি?

মহেশ্বর, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! আমাকে লোক বলছ? আমি যে ত্রিলোকেশ্বর, পরমেশ্বর। আমার পাপ নেই, পুণ্য নেই।

আপনি তাহলে পলিটিসিয়ান।

কথায়-কথায় তুমি এত ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করছ কেন মহেশ্বর? শিখলে কোথা থেকে।

প্রভু পৃথিবীতে যে আমার আনাগোনা আছে। ভক্তরা যখন দলে-দলে আমার পীঠস্থান তারকেশ্বরে ছোটে, তখন পথের দু'পাশে শুধু হিন্দি-ফিল্ম গান। বেদ-মন্ত্র ভুলে গেছি প্রভু। দেবভাষা আমার মুখে আটকে যায়। চালচলনও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে আজকাল। মাথায় চুলের বাহার দেখছেন! নেচে-নেচে হাঁটি।

পলিটিসিয়ান মানেটা কি? রাজনীতিক?

ধরেছেন ঠিক। তাদের পাপও নেই, পুণ্যও নেই। কথার কোনও দাম নেই। প্রভু আপনারও সেই এক হাল। সারা জীবন শুধু ডেকেই গেল, পেল না কিছুই!

আবার তুমি গবেটের মত কথা বলছ। পেয়ে কি হবে। মানুষের পেয়ে কি হবে! কোটিপতিও চিতায় চড়বে, কানাকানি-পতিও চিতায় চড়বে। মানুষকে দিয়ে কি লাভ হবে ঘোড়ার-ডিমের! রাখতে পারবে! থাকতে-থাকতেই ফুঁকে দেবে। রেস খেলবে, বোতল ধরবে, মেয়েছেলেদের পেছনে ছুটবে। ডাকাতে মেরে দেবে। ট্যাকসে দেউলে করবে।

প্রভু, এ সবই তো আপনার ইচ্ছায় হয়েছে! মানুষকে একটু সুখ দিলে কি এমন ক্ষতি হত আপনার!

খুব ক্ষতি হত। মানুষ আমাকে ভুলে মেরে দিত।

এখনই বা এমন কি মনে রেখেছে! খাচ্ছে দাচ্ছে আরব ৎশবুদ্ধি

করে পৃথিবীর অ্যায়সা হাল করেছে, একপাশে কাত হয়ে ঘুরছে। টলটলায়মান।

এত মন্দির, মসজিদ, চার্চ, কাবা, সকাল-বিকেল আরতি, ঘণ্টাধ্বনি, আজান, আহ্বান, কেন মহেশ্বর! আমাকে মনে না রাখলে এসব হত কি?

আমার কিছু বলার নেই প্রভু। কে যে কিসের ধান্দায় ঘুরছে, আমার চেয়ে আপনি ভালই জানেন।

তা অবশ্য জানি। কেবল দেহি, দেহি করছে। গাড়ি দাও, বাড়ি দাও, চাকরি দাও, বেহিসেবী টাকা দাও, যশ দাও, খ্যাতি দাও, মৃত্যুর পরে স্ট্যাচু দাও। এত দাও-দাও বলে বিরক্ত হয়ে আমি আর কিছু দিই না। সৃষ্টি সেই একবারই করেছিলুম। যা বাবা, এবার তোরা লুটেপুটে খা।

প্রভু পাঁচজন খাচ্ছে পঁচানব্বইজন টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখছে।

মরুক গে। যা পারে করুক। তোমার আমার কাঁচকলা। তা যাই বল বাপু, এবার একটু শীত-শীত করছে।

শীত করছে প্রভু! চলুন তাহলে। পারুর হাতে এক কাপ করে গরমাগরম চা খাওয়া যাক।

আবার ওই মর্তের নেশাটা ধরাবে!

আপনাকে আর কে ধরাবে মালিক! আপনিই তো নেশা, কারুর-কারুর আপনিই তো পেশা! নিন উঠুন। চলুন। খুব ঝাল চানাচুর দিয়ে চা খাওয়া যাক। হিমালয়ের শীত। হাড় কাঁপিয়ে দিলে।

মহেশ্বরেব ডেরায় এসে পরমেশ্বরের চোখ কপালে উঠে গেল। প্রশ্ন করলেন, ভোলা মহেশ্বর, এ কি করে ফেলেছ! তোমার ভক্তরা শ্মশানে থাকে, গায় ছাই-ভস্ম মাখে, তোমার এই ঐশ্বর্য দেখলে তারা কি বলবে? ভাগ্যিস এখানে ইনকামট্যাক্স নেই! থাকলে তোমার এই দু' নম্বরী কারবার ধরে ফেলত। কোথা থেকে আমদানী করলে!

মহেশ্বর লাজুক-লাজুক মুখে হাসলেন। ত্রিশূল দিয়ে জটা চুলকোতে-চুলকোত বললেন, প্রভু ঐশ্বর্য আর আব একই জিনিস। একবার বাড়তে শুরু করলে আর থামানো যায় না। ওই ফিল্ম-স্টার হয়ে যাবার পর থেকে মর্তে আমার পপুলারিটি

এত বেড়ে গেছে ! কি করব প্রভু ! এসব পাপের পাষাণ। ওদিকে হেরে রেরে করে পাপ বাড়ছে। বিশ্বনাথে রোজ মনে-মনে দুধ ঢালছে আমার মাথার, চতুর্দিকে পুজো চড়াচ্ছে। মিষ্টির দোকানে আজকাল খুব লাভ। রমরমা কারবার। দুধ ধরে ক্ষীর, ক্ষীর চটকে প্যাঁড়া। পারুরও সময়টা খুব ভাল যাচ্ছে। এক কলকাতা-তেই ছ হাজার বারোয়ারী। বরাত খুলে গেছে প্রভু। শ্মশানে আমার আসন কেড়ে নিয়েছে কলকেবিহারী দেশী-বিদেশী হিপির দল। মারছে টান আর ব্যোম বলে চিৎপাত। কারবার ভালই চলেছে।

মহেশ্বর তোমার অবস্থা দেখে আমার কি যে হচ্ছে !

আমি জানি, হিংসে হচ্ছে প্রভু। হিংস, এই-ই হয়। জমিদার ফুটে যায়, নায়েব নবাবি করে। এই স্বর্গে উর্বশী একটু নাচ দেখাবে। দু-চার পাত্র সোমরস চলবে। দেবাসুরে মাঝে-মাঝে লড়াই হবে। সবই একঘেঁয়ে প্রভু। আপনার জীবনও জীবন। মানুষের জীবনও জীবন। মানুষের জীবনে যে কি মজা ! এই দেখুন প্রভু, একে বলে টিভি। এর নাম ভিডিও। একে বলে স্টিরিও।

রাখো-রাখো, ওসব তোমার ছেলেমানুষী খেলনা। ও দিয়ে তুমি তোমার পারুর মন ভোলাও। আমি পরমেশ্বর। ইংরেজরা আমাকে লর্ড বলে। জানো কি তা ! আমি অলমাইটি।

প্রভু জীবন যদি খেলা হয়, তাহলে মানুষ কিন্তু জীবন নিয়ে আজকাল খুব ভালই খেলতে শিখেছে। আকাশে উড়ছে। মাটিতে ছুটছে। চাঁদে এসে মাটি কোপাচ্ছে। আপনার বড়-বড় গ্রহের পাশ দিয়ে রকেট ছোটাচ্ছে। কেলোর কীর্তি করে ফেলছে। দিনকতক পরে আপনাকেই গদি থেকে ফেলে দেবে !

মামার বাঁড় আর কি ! আমার রাজত্ব আমারই সৃষ্টি আমাকে ফেলে দেবে ! ক' ছিলিম চড়িয়েছ আজ মহেশ্বর। তোমার পারু কি তোমাকে একেবারেই ছাড়া গরু করে দিয়েছে। কলকাতার বড়বাজারের বেওয়ারিশ ষাঁড়ের মতো।

আজ বিনা ছিলিমেই চলছে প্রভু। যা বলছি তা আমার জগৎখোরা অভিজ্ঞতার কথা। পৃথিবীতে গিয়ে বেশি না দিনকতক থাকলেই আপনার জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে।

আমার আবার জ্ঞানচক্ষু কি হে। আমি নিজেই তো জ্ঞান।

সে হল পরমজ্ঞান। ও আপনার কেতাবে থাকে। সেই জ্ঞানে জগৎ-সংসার চলে না। পৃথিবীতে গেলে দেখবেন, পিতাদের কি অবস্থা? ভারত-পিতা গান্ধীমহারাজ যিনি আপনার নীতি অনুসরণ করেছিলেন, ন্যায়, সত্য, অহিংসা, সদাচার, জাতি-বর্ণের বিভেদ দূরে। কি হল তাঁর? আপনি কিছু করতে পারলেন? একটা বুলেট? হায় রাম! সব শেষ।

আমি ওর শেষটা ওই ভাবেই করতে চেয়েছিলাম।

কি কারণে প্রভু?

চিরকাল মানুষ মনে রাখবে বলে। সত্য আর অহিংসার বাণী রক্তের অক্ষরে জাতির জীবনে দগ দগ করবে।

হায় মূর্খ!

কাকে মূর্খ বলছ হে। আমাকে, না আমার আশীর্বাদ ধন্য গান্ধী মহারাজকে।

আপনাকে প্রভু। সারাজীবন যিনি শুধুই জ্ঞানের ভাণ্ডার দিয়ে গেলেন।

তোমার সাহস দিন দিন বাড়ছে। বেড়েই চলেছে অ্যাঁ।

বাড়বেই যে প্রভু। দেবতারা প্রথমতঃ অমর। তাছাড়া স্বর্গে পুলিশ নেই যে ধরে রুলের গুতো মারবে। আদালত নেই যে মানহানির মামলা ঠুকে দেবে!

তা বলে তুমি আমাকে জগৎ-পিতা, পরম পিতাকে মূর্খ বলবে?

কেন বলব না প্রভু! সত্য আর অহিংসার বাণী রক্ত দিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন! বাণী মুছে গেছে, রক্তটাই দগদগ করছে। জাতির সর্বাঙ্গ দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ছে। পিতার গোটাকতক কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি এখানে-ওখানে খাড়া করা আছে। বছরে একদিন জাতীয় ছুটি। মূর্তির গলায় গোটাকতক মালা। সারা বছর কাক-পক্ষীর পেছনের ব্যবস্থাপনায় চূর্ণকাম। তাঁর বাণী ভেসে চলে গেছে। তাঁর জীবন লোকে ভুলে মেরে দিয়েছে। ছোরাছুরি ছাড়া আদান-প্রদান নেই। বোমা ছাড়া শব্দ নেই। সব সময় মার-মার, কাট-কাট চলেছে। গদী ছাড়া লক্ষ্য নেই। ভোট দাও ছাড়া বাণী নেই।

পৃথিবীটাকে এবার আমি একদিন ধরে উল্টে দেব।

পারবেন না। এমন প্রাকৃতিক, গাণিতিক নিয়মে ফেলে দিয়ে ছেন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, পরস্পরের টানে কক্ষপথে ঘুরতেই থাকবে, ঘুরতেই থাকবে।

সব মানুষ আমি মেরে ফেলব।

ইমপসিবল প্রভু, ইমপসিবল। পিল-পিল করে মানু জন্মাচ্ছে ছারপোকার মত। ওষুধ বের করে ফেলেছে নানারকম যত না মরছে, জন্মাচ্ছে তার বেশি। সব রক্ত-বীজের ঝাড়।

তাহলে কি হবে মহেশ্বর?

এক কাজ করুন। শয়তানের সঙ্গে আপনি একবার আলো চনায় বসুন। পৃথিবীটা উইল করে তাকেই দান করে দিন শয়তান ছাড়া মানুষকে কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না। অমৃতস পুত্রা বলে সেই দ্বাপর, ত্রেতা থেকেই যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে এ যেন দয়ালু জমিদারের অত্যাচারী মোসায়েবের দল। প্রথ থেকে শাসন করেননি পিতা, পুত্রেরা সব বিগড়ে বসে আছে।

কই হে তোমার চা কি হল?

মহেশ্বর ,পারু-পারু বলে ডাকতে লাগলেন, কোথায় গেলে বুড়ি?

পরমেশ্বর বললেন, পার্বতী কি বুড়ি হয়ে গেছে?

না প্রভু, এ হল আদরের বুড়ি? এই কসমেটিকস আ হরমোনের যুগে কেউ কি আর বুড়ো, বুড়ি হবে। মনের বয়ে বেড়ে যাবে। দেহের বয়েস বাড়বে না।

সে আবার কি? জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, কিছুই থাকবে না

হ্যাঁ জন্ম অবশ্যই থাকবে তবে প্ল্যাণ্ড। এক ইয়া দো, তি কভি নেহি।

পরমেশ্বর মাথা চুলকোলেন। চোখ বড়-বড় হয়ে গেল।

মহেশ্বর মুচকি হেসে বললেন দেবতারাই শুধু চির-যৌবন আর অমৃতের কলসী কাঁকে নিয়ে বসে থাকবে, তা-তো হতে পারে না প্রভু। হিরোসিমায় সেই অ্যাটম-বোমা ফেলেছিল মনে আছে?

খুব আছে। বোমার ধোঁয়া ছাতার মত পেখম মেলেছিল।

তুমি আমাকে দেখিয়ে বললে, শরতের তুলো মেঘ। দেখতে গিয়ে ধোঁয়া লেগে আমার মাথার চুল ভুস-ভুস করে উঠে গেল সরোবরের জলে কুলকুচো করতে গিয়ে মুখের সব দাঁত খসে পড়ে

গেল। নাগার্জুন আর চরক এসে পরীক্ষা করে বললে, আণবিক প্রতিক্রিয়া। মনে নেই আবার! সেই দাঁত তো এখন গজমতির মালা হয়ে নারায়ণীর গলায় ঝুলছে। গায়ে ফোস্কা বেরিয়ে গেল। সাতদিন কামধেনুর দুধে গা চুবিয়ে বসে রইলুম, মাথায় চাপিয়ে রাখলুম কামধেনুর গোবর। মনে নেই আবার!

আপনার তো তবু সব বেরলো। আর আমার? আমার গোঁফ-জোড়া সেই যে খুলে পড়ে গেল, শত চেষ্টাতেও আর বেরোল না।

ভাল হয়েছে মহেশ, শাপে-বর হয়েছে। মুখটা ছিল তোমার, গোঁফটা ছিল মহিষাসুরের। যা তোমাকে মানায় না, তা যাওয়াই মঙ্গল। বাঘের মুখে বেড়ালের, বেড়ালের মুখে বাঘের গোঁফ মানায় না। দ্যাখো তো, এখন মুখটায় কেমন সুন্দর একটা দেব-ভাব এসেছে।

যাক ও গোঁফ-দাড়ি-চুল নিয়ে আর মাথা-ব্যাথা নেই। অমর হলেও বয়েস হয়েছে অনেক। যে কথা বলছিলাম প্রভু, ওই বোমার বাতাস ঠেলে আর একটু ওপরে উঠলেই, আমাদের হাড় পর্যন্ত খুলে পড়ে যাবে। তখন এই স্বর্গ-রাজ্যে এসে আপনার ওই মানবকুল পরম-পিতার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজবে। তখন কি হবে? ভেবে দেখেছেন একবার পরমপিতা!

কি হবে মহেশ্বর! একটা রাস্তা বের করো। এ সংগ্রাম তো দেখছি, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার।

তাই তো হয় প্রভু। ওরা সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি করেছিল। তারপর! জানেন তো! সবই তো আপনি জানেন! কেবল মাঝে-মাঝে আপনি ভুলে যান।

চা বোলাও।

হিন্দি বলছেন যে প্রভু!

উত্তেজনার মুহূর্তে কি মানুষ, কি দেবতা, সকলেরই ভাষা পাল্টে যায়। এরই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

মহেশ্বর হাসলেন। তারপর কি একটা টিপতেই দূরে ঘণ্টা বেজে উঠলো।

এ আবার তোমার কি কেরামতি মহেশ্বর!

প্রভু ইসকো বোলতা হায়, কলিং বেল। পারুকে আর কত ডাকব গলা ছেড়ে!

এবার কলকাতার বারোয়ারী সেরে ফেরার সময় চীনে বাজার থেকে তুলে এনেছে। বড় মজার জিনিস প্রভু।

কোঁক, কোঁক করে অদ্ভুত একটা শব্দ হতে লাগল। পরমেশ্বর প্রশ্ন করলেন, কী হে, শয়তান এল না কী! অমন সাপের ব্যাঙ ধরার মত শব্দ হচ্ছে!

না প্রভু। ও আর এক বাড়িয়া যন্তর। ওরে কয় ইণ্টারকম।

ঘন-ঘন তোমার ভাষা পাল্টাচ্ছে কেন মহেশ্বর! দেবতার গাম্ভীর্য তোমার গেছে। তুমি চ্যাঙড়া হয়ে গেছো।

মহেশ্বর হাসতে-হাসতে ইণ্টারকম তুললেন, হ্যালো! কে পারু! কি করছ তুমি সুইট! হানি। মানি গুনছ। এদিকে আউটার গুহায় আমি খোদ মালিককে নিয়ে বসে আছি। ওঃ সনি। খোদ মালিক কে? আমাদের গ্রেট পরমেশ্বর। চা-চা করে মাথা খারাপ করে দিলেন। আমরা যাব! আ মাই ডারলিং। কি করছ তুমি! ভিডিও দেখছ। হাও সুইট! আমরা আসছি দিলওয়ারা। মেরা জান।

পরমেশ্বর মহেশ্বরের কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন। গম্ভীর জগৎ-স্রষ্টা যেন আরও গম্ভীর। মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশের মত থমথমে মুখ। ইণ্টারকম ছেড়ে দিয়ে মহেশ্বর বললেন, কি হল প্রভু! ভড়কে গেছেন মনে হচ্ছে!

তুমি একেবারেই বকে গেছ মহেশ। তুমি বদসঙ্গে পড়েছ।

আজ বুঝলেন প্রভু! আমি তো কবেই বকে গেছি। আমি এক বখা ছেলে।

ছেলে নয় মহেশ্বর। তুমি দেবতা। বখাটে দেবতা।

তাই বলে সবাই। গাঁজা, ভাঙ খাই। ষাড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াই। সংসারে মন নেই।

পার্বতীর মত বউ পেয়ে ছিলে বলে তরে গেলে!

তা ঠিক। তবে মজাটা কোথায় জানেন প্রভু? সব আইবুড়ো মেয়েই আমাকে পুজো করে, নইলে মনের মত পতি পায়না। কি কেলো!

পরমেশ্বর ধমকে উঠলেন, তোমার ওই রকের ভাষা ছাড়বে না, আমি ফিরে যাব আমার ব্রহ্মলোকে?

মহেশ্বর হাসলেন. আর ফেরা! জীবনে আর ফিরতে পারেন

কিনা দেখুন। পারু ডাকছে। ভেতরের গুহায়। সেখানে ভিডিও চলছে। একবার নেশায় ধরে গেলে আর ফিরতে হচ্ছে না। হিন্দি ছবির নেশা সাংঘাতিক নেশা। আপনার সৃষ্টির মত। কিছুই নেই অথচ সবই আছে। মায়ার মায়া। কায়ার ছায়া। ভ্রান্তি অথচ ছেড়ে যেতে মহাঅশান্তি। চলুন প্রভু। গাত্রোৎপাটন করুন।

পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। আড়ামোড়া ভেঙে বললেন, তুমি দেখছি আমাকেও বখিয়ে ছাড়বে।

আপনাকে বখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আর প্রভু, আপনিই তো সব। চোর, জোচ্চর, ভাল,মন্দ, সৎ, অসৎ, সাধু, অসাধু, সবই তো আপনি। গীতায় আপনিই বলেছেন, আমা হইতে সব উত্থিত হইয়া, আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন, জলের বিম্ব, জলেতেই মিলায়।

খুব হয়েছে। চল। পথ দেখাও।

মহেশ্বর আগে-আগে চলেছেন। পেছনে আসছেন পরমেশ্বর। গুহাপথের দেওয়ালে নানা বর্ণের পোস্টার সাঁটা। পরমেশ্বর কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কৈলাসে কি ছাপাখানা হয়েছে?

কেন প্রভু?

এ সব সাঁটিয়েছে।

সিনেমার পোস্টার। বোম্বাই, বাংলা আর তামিলনাড়ু থেকে এসেছে। ফিল্মে আমি যে খুব পপুলার জগদীশ্বর। কত রকম আমার ভূমিকা একবার অবলোকন করুন।

খুবই নিম্ন রুচির পরিচয় মহেশ্বর! তুমি ক্রমশই একটি নিকৃষ্ট দেবতা হয়ে যাচ্ছ।

আমার ভক্তরাই এর জন্যে দায়ী প্রভু। আমার কিছু করার নেই! বিশ্বনাথে আমার টাকে কলসি-কলসি জল আর দুধ ঢালে ধনী ব্যবসায়ীরা। কি প্রার্থনায় শুনবেন? আরও টাকা আরও কালো টাকা চাই। ভোগ চাই। ব্যাভিচার চাই।

তুমি একটা বোকা হাঁদা। নিশ্চয় তথাস্ত বলো।

কি করব প্রভু! ভক্তের মনোবাঞ্ছা আমাকে পূর্ণ করতেই হয়। সেই রত্নাকরকে দিয়েই শুরু। আমি তো ভোগ করি না। ভোগ করে সেবায়েতরা।

চালিয়ে যাও। চালিয়ে যাও।

পার্বতী ডিভানে শুয়ে ভিডিওতে শোলে দেখছেন। মহেশ্বর আর পরমেশ্বর ঢুকতেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন। গব্বর সিং-এর ডায়লগ চলেছে। পরমেশ্বর আসন নিলেন। গম্ভীর মুখ। ম্লান জ্যোতি। মানুষের চেয়ে দেবতার অধঃপতন কি আরও বেশি হল! পার্বতীর বেশ-ভূষার একি ছিরি হয়েছে! এযে বাঈজী মার্কা পোশাক। হায় মহেশ্বর! শাসনের অভাবে সংসার যে ভেসে যায় রে বাপ। অবশ্য সংসার তোমার কোনও কালে ছিল না।

পার্বতী নতজানু হয়ে বললেন, প্রভু কেন হেরি বিরস বদন এমন? শরীর স্বাস্থ্য কুশল তো প্রভু! উদরে কোন গোলমাল উপস্থিত হয়নি তো? জিয়াডিয়াসিস, অ্যামিবায়োসিস ইত্যাদি কোনও পার্থিব ব্যামোর আক্রমণ হয়নি তো প্রভু!

পরমেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমার দিকে তাকাতে পারছি না। তোমার পোশাক বড় অশালীন। অশ্লীল তোমার অঙ্গভঙ্গি। উপরন্তু তুমি অতিশয় ফাজিল ও বাচাল হয়েছো। তিল-তিল করে তোমাকে আমরা সৃষ্টি করেছিলুম। শক্তির বলয়। শক্তি-পুঞ্জও বলা চলে।

জাতি-পুঞ্জ বা যুক্তফ্রন্ট সরকারের গণতন্ত্রের মত!

চুপ কর, দেবলোকের ব্যাপারে পৃথিবীর উপমা টেনে এনো না তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

প্রভু বারে-বারে আমাকে অসুর দমনে আপনার আজ্ঞাবাহী হয়ে আমাকে পৃথিবীতে যেতে হয়।

বেশ তো। দেব-কার্যে পৃথিবীতে যাওয়া মানে স্বৈরিণ হয়ে ফিরে আসা? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছো?

প্রভু, আমার আরাধনা যারা করে, সেই ভক্তকুল আমাকে যেভাবে সাজায়, যেভাবে যেরূপে ভজনা করে, আমি দিনে দিনে ঠিক সেই রকম হয়ে উঠেছি। আমার তো কোনও দোষ নেই। দোষ আপনার।

আমার দোষ? তুমি কি বলতে চাইছ রমণী?

প্রভু রমণী নয়। দেবী।

তোমাকে আর দেবী বলতে পারছি না। তুমি এখন লাস্যময়ী রমণী। বল কোথায় আমার দোষ! যত দোষ, নন্দ ঘোষের!

আপনি আজকাল বড় ভুলে যান। অবশ্য দোষ নেই আপনার। হাজার, হাজার সুদীর্ঘ জীবনের খুঁটিনাটি মনে রাখা সহজ নয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মত বুদ্ধিমান হলে একটা কম্পিউটার বসিয়ে নিতেন। নিজের স্মৃতি আর প্রয়োজন হত না। কম্পিউটারের স্মৃতিতে সব জমা থাকত। মনে আছে প্রভু সখা কৃষ্ণ হয়ে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পার্থকে বলেছিলেন! মানুষকে গীতা পড়তে বলতে। রোজ সকালে শুদ্ধ বস্ত্রে অন্তত একটি অধ্যায়। অথচ নিজের গীতা নিজে একবার উল্টে দেখেন না?

কি বলেছিলুম?

বলেছিলেন যে, যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ প্রভু, মনে পড়ে? বলেছিলেন, আমার স্মরণ যারা যে ভাবেতে লয়, সে ভাবেই পায় মোরে আমি সর্বাশ্রয়॥ প্রভু, আপনার বাক্য তো মিথ্যা হতে পারে না। আমি কখনও হেমা, কখনও জয়া, কখনও জীনাত, কখনও রেখা, কখনও লেখা। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।

যাদের নাম করলে তারা আবার কোথাকার দেবী?

ওই যে প্রভু! সেলুলয়েডের দেবী।

মহেশ্বর একমনে শোলে দেখছিলেন। দুজনের দিকে ফিরে বললেন, কি তখন থেকে শুরু করেছেন? আপনার জগৎ ভুলে যান। দেখুন সেলুলয়েড ওয়ার্লডের বড়িয়া খেল। সব ভুলিয়ে দেয়। জগৎ মায়া। এ আবার মায়ার মায়া। বড় মিষ্টি মোয়া। একেবারে জয়নগর।

পার্বতী উঠে দাঁড়ালেন। মহেশ্বর বললেন, প্রভু কি সেবনের ইচ্ছা? সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাত্রি আসন্ন। এক চুমুক অ্যাপেটাইজার হয়ে যাক।

সে আবার কি?

প্রভু, সভ্য মানুষেরা সোমরসকে অ্যাপেটাইজার বলে। আমি কলকাতায় গিয়ে এই শব্দটি শিখে এসেছি। সেবনে চনচনে ক্ষিদে হয়। মেজাজ শরিফ হয়। পার্বতীর ভাণ্ডারে কয়েক বোতল বিলাইতি আছে।

সে আবার কি? আমাদের আবার দিশি-বিলিতি কি?

আছে প্রভু আছে। বিলেতে আপনি গড। দেশে আপনি ঈশ্বর। তা সেই গডের দেশের চোলাইটি বড় মধুর। সেবনে মনে হবে, জিভ ফুঁড়ে একটি ধারাল তলোয়ার চলে গেল পেটে। হয়ে যাক প্রভু। তারপর একটু চিকেন চাওমিন। চিলিচিকেন। মাটন আফগানী।

এসব বিজাতীয় বস্তু, এসব বিদঘুটে, বিকট বস্তু তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?

সবই আমার সুগৃহিণীর কল্যাণে। বারোয়ারী সেরে আসার সময়, কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক বোতল স্মাগল করে এনেছে। আর এনেছে খানদুই রান্নার বই। ফাটাফাটি ব্যাপার। মানসসরোবরের হংস মেরে, সে যা বস্তু হচ্ছে। জিভে পড়া মাত্রই সমাধি।

পরমেশ্বর চমকে উঠলেন, সে কি হে! তোমার মানস-সরোবরের হংস মেরে হাওচাও করে পেটায় নমঃ করছ? ও যে পরমহংস।

প্রভু হাওচাও নয়, চাওমিন। আমরা যে এখন মহাচীনের এলাকায় চলে গেছি। তারা আবার কম্যুনিস্ট। ধর্ম-টর্ম মানে না প্রভু। ওদের কাছে আপনার অস্তিত্ব নেই।

তাতে কি হয়েছে। তার মানে ওরা বৈদান্তিক। আমার প্রিয় পুত্র শঙ্করের অনুগামী।

না প্রভু। সোহহংবাদী নয়। পুরোপুরি মানুষ। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মপুরুষের ধার ধারে না। তিনটি যন্ত্রের কারবারী। রাষ্ট্র যন্ত্র, উৎপাদন যন্ত্র এবং শ্রমিক। খাটো খাও বয়েস হলে ফুটে যাও।

অসহ্য তোমার ভাষা। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

প্রভু, মানুষের কবি লিখেছিলেন জিভ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তিনি মানে আপনি। আমি বলছি, বাড়ি দিলেন যিনি, রক বানালেন তিনি। প্রভু সেই রকের ভাষা আর রক কালচারের জয়-জয়কার সর্বত্র। রক থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতির রূপ-রেখা, শিক্ষা-দীক্ষা সবই উঠেছে। রক যেন বিষ্ণুর নাভীপদ্ম। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকায় চলেছে রক-এন-রোল। সে কী ভীষণ সোরগোল। পার্বতী, তোমার ভিডিওতে

সেইটা চাপাও না গো, রক, রক, রক, ।

পার্বতী রিমোট কণ্ট্রোল ব্যবহার করলেন। শোলের জায়গায় শুরু হল প্রথমে ওসিবিসা। পরমেশ্বরের পীলে চমকে গেল। কৈলাসের গা বেয়ে হিমাবহ নেমে গেল, গুড়ে গুড় করে। বিদ্যুৎ চমকে উঠল খিলি খিলি করে। পরমেশ্বর চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন বাঘছাল বিছানো শয্যার ওপর।

মহেশ্বর ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, দেখ দেখ। প্রভুর থ্রম্বোসিস হল না তো ?

পার্বতী বললেন, তোমার যে কবে বুদ্ধি পাকবে কত্তা ! কত বেল পেকে গেল ! সারা জীবন বেলতলায় বসে রইলে, তোমার বুদ্ধি কিন্তু পাকল না। মাথায় অত জটাজুট থাকলে বুদ্ধি কি আর পাকে ! টাক তো আর পড়বে না ? মাথাটা কামিয়ে ফেল। যদি কিছু হয় ?

আমি আবার কি করলুম ?

বৃদ্ধ দেবতাকে কি এসব শোনাতে আছে ! প্রভুর থ্রম্বোসিস হলে কি হবে ?

তোমার যেমন বুদ্ধি গিন্নি ! প্রভুর থ্রম্বোসিস হবে কি ? ও তো হয়েই আছে। আমি বাঙাল হলে বলতুম।

কি বলতে ?

থাক, সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। তুমি বরং মুখে একটু বিলিতি ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দাও।

পার্বতী পরমেশ্বরের মুখের ওপব ঝুঁকে পড়লেন। পরমেশ্বর মৃদু স্বরে বিড় বিড় করে বলছেন, জুজু, ওরে বাবা জুজু।

পার্বতী তাড়াতাড়ি ভিডিও বন্ধ করে দিলেন। কান ফাটানো শব্দ বন্ধ হয়ে সুন্দর এক নীরবতা নেমে এল। পরমেশ্বরের কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে পার্বতী বলতে লাগলেন, প্রভু, ও জুজু নয়, ওর নাম ডাকু পোট্যাটো। খুব ভাল ড্রাম বাজায়।

পরমেশ্বর চোখ খুললেন। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথায় ?

প্রভু আপনি কৈলাসে।

তুমি কে ? তোমার ঠোঁট অত লাল কেন ? তোমার চোখের পাতা অমন সোনালী কেন ?

প্রভু, আমি পার্বতী। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছি। চোখের পাতায় আইল্যাশ রং। পৃথিবীর সেরা সুন্দরীরা এর চেয়ে কত সাজে। তাও তো আমি ভুরু প্লাক করিনি। চুল বয়-কাট করিনি। জিন্স পরিনি, গেঞ্জি চাপাইনি। বিশ্ব-সুন্দরীর পোশাকে দেখলে আপনি কি করতেন প্রভু?

নির্ঘাত মরে যেতুম জননী।

আপনার যে মৃত্যু নেই প্রভু। অর্বুদ-অর্বুদ-অর্বুদ বছর আপনি শুধু জীবিত থাকবেন। আরশোলার মত অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি করে যাবেন আপন খেয়ালে। যে পিতার অসংখ্য সন্তান, সে পিতা কোনও সন্তানকেই মনে রাখে না। সন্তানও পিতাকে মনে রাখে না। নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি. খুনোখুনি হতে থাকে। বিষয় সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যায়। পাঁচিলের পর পাঁচিল ওঠে। বৃদ্ধ পিতা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান। আর ওরাই বলে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

ওরা কারা?

আপনার সন্তানেরা। সেই অমৃতের পুত্ররা।

পরমেশ্বর বড়-বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর চিৎকার করে বললেন, ওয়েটার হুইস্কি বোলাও।

মহেশ্বর বললেন, এ কি প্রভু! এ আপনি কি বলছেন? বাংলা ছবির নায়ক এই ডায়ালগ ছাড়ে।

মূর্খ মহেশ্বর, সে কে? সে তো আমিই।

এই তো। এই তো পথে আসুন প্রভু। এতক্ষণ তাহলে অভিনয় করছিলেন!

ধূর্ত মহেশ্বর, ধরেছ ঠিক। এই যে তুমি সংসারী হয়েও সংসার করো না, এও কি আধুনিক মানুষের লক্ষণ নয়!

হ্যাঁ প্রভু! আপনিও ঠিক ধরেছেন! একেই ওরা বলে, রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু।

সবই তো আমার। আমিই তো সব। আমি সাধু, আমি শয়তান। আমি রাজা, আমিই প্রজা। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, আমি মিত্র, আমি অরাতি, আমি সৎ, আমি অসৎ, আমি যুদ্ধ, আমিই শান্তি।

প্রভু, আপনি বাঁধাকপি, আপনিই ফুলকপি। আপনি আলু, আপনিই রাঙালু!

তুমি আবার কোথা থেকে, কোথায় চলে গেলে ?

প্রভু, আমি শূন্য জগতে ঢুকে গেলুম। মানে আপনাকে ঢুকিয়ে দিলুম।

তুমি আবার নতুন করে ঢোকাবে কি! আমি তো ঢুকেই আছি। আমি মহেশ্বর, আমিই পার্বতী।

অসম্ভব। অসম্ভব প্রভু। তা হতে পারে না। আমরা দুজন ছাড়া আপনি সব।

পাগলা, তা কি কখনও হয়! আমার প্রিয় পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছিল, মাতুয়ার বুদ্ধি। আমার ঋষিদের মুখ দিয়ে হাজার-হাজার বছর আগে যে বেদ-বেদান্ত রচনা করিয়ে গেছি, সময় করে সে সব একটু পড়ো না! সত্য জানতে পারবে।

পার্বতী বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সারাদিন ট্যাঙোস করে না ঘুরে. একটু লেখা-পড়া করো। আজকাল বি-এ, এম-এ পাশ কিছুই নয়। ঘরে-ঘরে। রিসার্চ করো, ডক্টরেট হও। রাজনীতিতে নেমো না বাপু। এই তো একটু আগে দুম করে ভারতের প্রধান-মন্ত্রীকে মেরে দিলে।

মহেশ্বর বললেন, অঁ্যা, সে কি গো, কে মারলে? তুমি কি ভাবে খবর পেলে ?

আমার যন্ত্রে। আমার টি-ভি যন্ত্রে।

পরমেশ্বর বললেন, তোমরা বেদজ্ঞ হলে এমন উতলা হতে না। আমি শ্রীকৃষ্ণ রূপে তোমাদের কি বলেছিলুম।

ন জায়তে বা ম্রিয়তে কদাচিদ্‌
ভূত্বা ন বায়ং ভবিতা ন ভূয়ঃ।
নিত্যঃ পুরাণোহয়মজোহব্যয়োহসৌ
ন হন্যমানে নিহতঃ শরীরে॥

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পুনর্জন্ম নাই,
দেহের নাশেও দেহী থাকে সর্বদাই।
আজাদ, শাশ্বত, নিত্য, চির পুরাতন

প্রভু, আপনার ওই সব হেঁয়ালি মানুষ বোঝে না বলেই পৃথিবীতে ভণ্ডামি এত বেড়ে গেছে। মা মরছে, বাবা মরছে। ভাই ভাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। স্বামী সংসার ভাসিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সন্তান মায়ের কোল খালি করে সরে পড়ছে।

শ্মশানে চড়চড় করে মৃতদেহ পুড়ছে। আর আপনি বলে আসছেন, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পুনর্জন্ম নাই। দেহের নাশেও দেহী থাকে সর্বদাই।

অ্যাটমের যুগে এসব চলে না মালিক। চিরকাল মানুষ আপনার ছায়াটাই দেখে এল। কায়াটা একবার দেখান।

পাগল হলে মহেশ্বর। সশরীরে পৃথিবীতে হাজির হলে আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

জ্যোতির্ময় শরীর ধারণ করে আকাশে ভেসে বেড়ান।

ভূত ভেবে সব ভিরমি যাবে।

তা হলে এই চলবে! কল্প কল্পান্তর ধরে?

বোকা, সেই কারণেই তো আমি অবতার পাঠাই। কিছু শক্তি দিয়ে, কিছু বিভূতি দিয়ে।

বহু বছর তো কোন অবতারও পাঠান নি।

সময় হয় নি এখনও। আমি তো বলেই রেখেছি, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি।

গ্লানির আর কি বাকি আছে প্রভু। রক্ষক ভক্ষক হয়ে প্রাইমিনিস্টারকে শেষ করে দিলে।

তুমি কেবল ভারতের কথাই ভাবছ। পক্ষপাতদুষ্ট ভাবনা। গোটা পৃথিবীর কথা ভাবো।

সারা পৃথিবী জুড়েই কেলোর কীর্তি হচ্ছে। ইরাক-ইরাণে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। অ্যায়সা বায়োবোম ছেড়েছে, মানুষের কি দুর্গতি! গায়ে চাকা-চাকা ফোস্কা। দগদগে ঘা। অন্ধ। চামড়া ফেটে রক্ত ঝরছে। আফগানিস্হানের ঘাড়ে রাশিয়া চড়ে বসে আছে। ইয়লো রেন কাকে বলে জানেন প্রভু?

বিষাক্ত গ্যাস।

ক্যাম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, ফকল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা। জার্মানী ফেঁড়ে দু'ভাগ। ভারত সীমান্তে পাকিস্তানের ঠুসঠাস। চীন আবার মার্কসকে বাতিল করে দিলে। আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি। আপনার সাধের ইংরেজ, যাদের কিংডামে সূর্য অস্ত যেত না, সেখানে কি অবস্হা! থ্যাচারকে তো প্রায় শেষ করেই দিয়েছিল। মাইনাররা ধর্মঘট করে বসে আছে। আয়ারল্যাণ্ড

তেড়ে তেড়ে আসছে। ডিকটেটাররা মানুষ ধরছে আর কোতল করে দিচ্ছে। আর আপনার প্রিয় আফ্রিকা!

আমার প্রিয়?

প্রভু, প্রথম মানুষকে তো আপনি আফ্রিকাতেই ফেলেছিলেন। মানুষের জন্মভূমি।

তা অবশ্য ঠিক। দুর্গম স্থানেই আমি বীজ বপন করেছিলুম ইচ্ছে করেই। ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, মরতে-মরতে। মারতে মারতে, মানুষ অসভ্যতা থেকে সভ্যতার আলোতে আসুক। এই ছিল আমার প্লান।

তা আফ্রিকার কি হয়েছে!

প্রভু, আপনার টেলিস্কোপে একবার ফোকাস করুন না, দেখুন না ইথিওপিয়ায় কি হচ্ছে।

জানি। জানি। জানি রে বাপু। বৃষ্টি নেই, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কঙ্কালসার মানুষ, ধুঁকছে, মরছে। মানুষের উদাসীনতায় মানুষ মরছে। জানি। আমি জানি সব।

পরমেশ্বর পায়চারি শুরু করলেন। হাত দুটো পেছন দিকে মোড়া। মাথায় একমাথা রুপালি চুল। গায়ের রঙ উত্তপ্ত তামার মত। চোখের বর্ণ নীল। স্বর্ণ বর্ণ দন্তসারি। কি ভীষণ রূপ।

মহেশ্বর বললেন, কেন এমন করেন প্রভু? পৃথিবী তো কারুর বাপের সম্পত্তি নয়। কিছু মানুষ ভোগ করবে। আর কিছু মানুষ ভোগ্য হবে। কেন! কেন এই অবিচার?

পরমেশ্বর পায়চারী থামালেন। ঘন নীল দৃষ্টি মেলে মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন বলতো! কেন এমন করি?

কি জানি প্রভু! মানুষ তো বলে, আপনি নাকি কবে কখন তাদের বলে এসেছেন, যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ।

সে তো ওদের কথা। আসল রহস্যটা কি?

যদি বলি আমিই শয়তান। তোমরা এতকাল যাকে পরমেশ্বর ভেবে এসেছ, আসলে সে ছদ্মবেশী শয়তান। জীবিতের রাজত্বের মালিক হল শয়তান। মৃত্যুর রাজা ঈশ্বর। যোজন-যোজন ব্যাপী শূন্যতা। গ্রহ নেই, অসীম অন্ধকার। সেখানে বসে আছেন

তোমাদের ঈশ্বর। জীবন মানে কি মহেশ্বর? জন্ম আর মৃত্যু। ভোগ অথবা দুর্ভোগ। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। জীবন মানে সংঘর্ষ। জীবন মানে বেঁচে থাকার শয়তানী কৌশল। আমার এই নীল চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো। বিষাক্ত নীল। আমার বুকে হাত রেখে দেখো, হৃদয় নেই। আমার কোনও অনুভূতি নেই। মহেশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর পরাভূত। তিনি শুধু কোলে তুলে নেন। কোল থেকে যেখানে নামান সে হল আমার এলাকা।

মহেশ্বর, পার্বতী দুজনেই স্তব্ধ। এ কি পরমেশ্বরের হেঁয়ালি, না সত্য? সত্য কোথায়? সৃষ্টি আর লয় দুটোই তো রহস্য! জানা, অজানা হয়ে যেতে কতক্ষণ।

আমি এবার বিদায় নোব।

মহেশ্বর বললেন, প্রভু, আপনি যদি শয়তানই হন, আমরা কিন্তু এতকাল আপনাকে পরমেশ্বর বলেই জেনে এসেছি। সে ভুল আর না-ই বা ভেঙে দিলেন।

গুহামুখ থেকে পরমেশ্বর অথবা শয়তান যিনিই হোন না কেন গম্ভীর কন্ঠে বললেন, সে তোমাদের ব্যাপার! কি সত্য আর কি মিথ্যা, এ বিচারের ভার আমি তোমাদেরই দিয়ে গেলুম। আমার কাছে সত্যও নেই, মিথ্যাও নেই। মানুষকে আমি নিজে কোনও দিনই বলতে যাইনি, তোমরা ভগবানকে মানো, কি শয়তানের থেকে সাবধান হও। বিশ্বাস আপনিই জাগে। সন্দেহ আপনিই আসে।

মহেশ্বর আর পার্বতী গুহামুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কেউ নেই। রাত নেমেছে কৈলাসে। তুষার-ধবল রাত! হু হু বাতাস বইছে। হিমবাহ নামার শব্দ। বরফে ঘর্ষণে হিলহিলে বিদ্যুৎ খেলছে চারপাশে।

মহেশ্বর বললেন, পারু এতক্ষণ কি আমরা কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম?

হতে পারে?

ভদ্রলোক আবোল-তাবোল কি সব বকে গেলেন!

অতটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ কোর না। দেবতা কখনও ভদ্রলোক হয় না। অমন কথা বলতে নেই, ছিঃ! তোমার বয়েস কয়েক কোটি আলোকবর্ষ হলেও, তোমার এখনও ভীমরতি হয়নি?

দেবতারা তাহলে কি ছোটলোক!

দেবতা দেবতাই। লোক কেন হতে যাবেন! লোক তো পোক!

সে আবার কি ?

কেন? শোনিনি? অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন লোক না পোক। পোক মানে পোকা। উনি তো সৃষ্টির আদি থেকেই উল্টোপাল্টা কথা বলার জন্যে বিখ্যাত। কি আর করা যাবে। অমন বলেন বলেই পৃথিবীতে একদল মানুষ করে-কমে খাচ্ছে গো!

কথা বেচে? কথা সারাজীবন ওলোটপালোট করে?

যারা রাজনীতি করে, তারা ওই রকম কথা বলে। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। এখন একরকম পরমুহূর্তেই আর একরকম। আর একদল হল দার্শনিক পণ্ডিত। পিপে-পিপে নস্যি আর ঘাড় দুলিয়ে তর্ক, তৈলাধারার পাত্র, না পাত্রাধারার তৈল। বীজ আগে না গাছ আগে! ডিম আগে না ছানা আগে!

যাই, বৃদ্ধ মানুষটিকে ফিরিয়ে আনি। তুষার ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

আবার মানুষ বলছ? ঈশ্বর বলো।

তাইতো বলতুম। এই যে বলে গেলেন, আমি ঈশ্বর নই, শয়তান।

আরে বোকা ঈশ্বর আর শয়তান আলাদা নাকি? একই টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। এই যে আমি বারে-বারে পৃথিবীতে যাই, কি দেখে আসি! মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর, মানুষের মধ্যেই শয়তান। বাইরেটা দেখে বোঝার উপায় নেই। এদিকে প্যাণ্ডেলে ধুনুচি-নৃত্য হচ্ছে, আর একদিকে পেট্রোল বোমা চলেছে। বন্ধু বন্ধুর বুকে ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে। তোমার মাথায় তো সারাদিন ঘড়া-ঘড়া দুধ ঢালছে। কেন ঢালছে? কি চায় তারা! ধর্ম? আত্মার উন্নতি?

না পারু। শুধু স্বার্থ। টাকা চাই টাকা। মুনাফা। মানি-মানি-মানি, সুইটার দ্যান হানি।

তবে ? কে ঈশ্বর, আর কে শয়তান, তুমি বুঝবে কি করে !

বেশ আমি তাহলে শয়তানের সন্ধানে চললুম। যদি পাই, ধরে এনে পরমেশ্বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দোব। তখন ধরা পড়ে যাবে, এই জগৎ-সংসার দুইয়ের খেলা, না একের খেলা। গাছের ডালে দুটি পাখি, সু আর কু ! না একটি পাখি সুকু ! কি বলো গিন্নি !

তোমার তো ট্যাঙোস-ট্যাঙোস করে ঘুরে বেড়ানোই কাজ। সেই ছুতোয় বেরিয়ে পড়া। ব্রহ্মাণ্ডটা একবার চক্কর মেরে এসো।

মহেশ্বর বার-গুহায় এসে হাঁক পাড়লেন, নন্দে। এই ব্যাটা নন্দে।

নন্দী আপাদমস্তক চামরি-গাইয়ের লোমের কম্বল ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘুমজড়ানো গলায় বললে, জি হাঁ। ছিলাম প্রস্তুত।

ধ্যার ব্যাটা ছিলাম। মাথাটা গুইলে দিয়ে গেল।

গুইলে নয় প্রভু গুইলে। যাঃ বাবা, নিজেরই গুইলে যাচ্ছে।

অ্যাঁ সে কি রে ! শব্দটা তাহলে কি ? গুলিয়ে। নে ধরে থাক।

কি ধরব প্রভু ?

হস্যাইটাকে আগে আসতে দিবি না।

ঠিক আছে মহারাজ। চেপে ধরলুম। আগে আতসে দোব না।

আতসে কি রে ব্যাটা ! আসতে দোব না।

কি হয়েছে বলুন তো, সব যেন কেমন এমোলেলো হয়ে যাচ্ছে।

কতটা টেনেছিস ? এমোলেলো না এলোমেলো ! ওঠ। ওঠ। উঠে দাঁড়া।

নন্দী উঠে দাঁড়াল। প্রভু আমার মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন ধীরে ঘুরছে। ইস্‌পিড কমে গেছে।

স্পিডোমিটারটা দ্যাখ। আস্তে ঘুরছে কি রে ! তাহলে তো দিন-রাত্রির মাপ ছোট-বড় হয়ে যাবে। ঋতু পাল্টে যাবে। বছর লম্বা হয়ে যাবে।

স্পিডোমিটার দেখে বললে, হ্যাঁ প্রভু, ইস্‌পিড কে কমিয়ে দিয়েছে।

সেরেছে !

তাতে আমাদের কি ? আমাদের কাঁলকচা।

কাঁলকচা কি রে ! বল কাঁচকলা। শুধু আমার আমার করে মরছিস কেন ? মানুষের কথা ভাব। সারা বছর চাল, কলা, মুলো কম দিচ্ছে। দুধ খাওয়াচ্ছে ঘড়া-ঘড়া।

আর বলবেন না। বোগড়া চাল, পচা কলা, জোলো দুধ।

তা আর কি হবে বল ! রেশনের চাল, জাঁকের কলা, ফুকো দেওয়া দুধ। বিজ্ঞানেই বারোটা বাজালে।

ক্যাঁচ করে ভীষণ একটা শব্দ হল। নন্দী আর মহেশ্বর দুজনেই দুম্‌ করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

মহেশ্বর বললেন, নন্দে এটা তোর কি কায়দা !

আমার কায়দা নয় প্রভু। ব্রেক কষেছে। পৃথিবী থেমে গেছে ! আর ঘুরছে না।

কেন কষলে ?

মালুম শয়তানে। অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিল।

শয়তানের ঠিকানা জানিস ? ফোন নম্বর ?

সে যে পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে চেনা।

তোকে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে বলিনি। চল, আমি শয়তানকে ধরতে যাচ্ছি।

সে কি প্রভু ! লোকে মাছ ধরতে যায়, আপনি শয়তান ধরতে যাবেন।

কথা বাড়াসনি, চল।

মহেশ্বর বললেন, নন্দে, পৃথিবীর আকাশে হাহাকার কিসের ?

বেশ বড় কিছু ঘটছে।

আর কি ঘটবে ! ভারতের আকাশে আর কি ঘটতে পারে। স্বর্ণমন্দিরে লড়াই। কর্ণাটকে মন্ত্রীসভার। না কর্ণাটক নয়, অন্ধ্র। অন্ধ্রে মন্ত্রীসভার পতন ও উত্থান। প্রধানমন্ত্রীর তিরোধান। আর কি হবে !

কিছু একটা হয়েছে। এত দূর থেকে বলি কি রে ? চলুন নিচে নেমে দেখা যাক। আপনারাই তো বলেছেন, ধুম দেখলেই বুঝবে বহ্নি আছে।

চলো তা হলে।

মহেশ্বর আর চিরকালের বিখ্যাত সঙ্গী নন্দী ভূপালে এসে

নামলেন। নামার সময় শুধু একবার মাত্র বলতে পেরেছিলেন, কি বিশ্রী কুয়াশার রাত।

তারপর শ্রীমুখে আর কথা সরল না। ডানাকাটা জটায়ুর মত দুম করে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়লেন। মুখ হাঁ হয়ে গেল। তিনবার কোনোক্রমে বললেন, নন্দে, একটু জল। সেই ঘোরের মধ্যেই দেখলেন, শহর ছেড়ে মানুষ পালাচ্ছে। রাজা ছুটছে, প্রজা ছুটছে। মরা পাখির মত, টুপটাপ মানুষ ঝরছে। তারপর আর জ্ঞান রইল না। অসীম শ্বাসকষ্টে জ্ঞান হারাবার আগে একবার শুধু ভাবতে পারলেন, এতদিনে পার্বতী আমার বিধবা হল। কোথায় গেল আমার সেই ক্ষমতা। একদিন এই কণ্ঠে সমুদ্রমন্থনের সব হলাহল ধারণ করেছিলুম!

মহেশ্বর মরলেন না। দেবতার মৃত্যু হয় না। অমর। জ্ঞান হল। নির্জন বনানীর ধারে, নদীর পারে। কার কোলে মাথা? পার্বতীর!

তুমি কে?

আমি পরমেশ্বর। তুমি ওখানে মরতে গিয়েছিলে কেন?

জান না, তোমার আর সে ক্ষমতা নেই। সঙ্গদোষে সব গেছে।

প্রভু, তা ঠিক। আমরা এসেছিলুম হাহাকার শুনে। ভেবে-ছিলুম, শয়তান আবার নতুন চাল চেলেছে। ব্যাটাকে ধরতে হবে।

পরমেশ্বর বললেন, আরে আমিও তো সেই খোঁজেই এসে-ছিলুম। ভেবেছিলুম জালার ভেতর থেকে সেই মহাপ্রতাপশালী ধোঁয়ার কায়া নিয়ে বেরচ্ছে আলাদিনের দৈত্যের মত। ভুল হয়েছিল। এযে আমেরিকান গ্যাস। নাম 'মিক'। সব ছারখার করে দিয়েছে।

এ তারই খেলা।

না-না, এ হল মানুষের বিজ্ঞানের খেলা।

তা হলে বিজ্ঞানই শয়তান।

হতে পারে। তবে আকাশে আমি তার অট্টহাসি আর কণ্ঠস্বর শুনেছি।

কি শুনলেন?

বললে, মূর্খ ভগবান, তোমার সৃষ্টির ভেতর আমি নিজেকে পাউডারের মত ছড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমার আর নির্দিষ্ট

শরীর নেই। আমি এখন বহু হয়ে গেছি। কোটি-কোটি মনের কোথায় আমি তিল-তিল হয়ে আছি, খুঁজে বের করতে তোমার চুল পেকে যাবে।

প্রভু, এই কল্পস্বনা নদীটির নাম?

বৈতরনী।

তাহলে চলুন প্রভু, ভাসাই ভেলা। পারের জন্যে মন কেমন করছে।

জোর আলোটা কমিয়ে দাও। যে সুইজের মুখটা নিচু ছিল হীরেন ফট করে সেটাকে দাড়ি ধরে উঁচু করে দিতেই সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বেশ স্নিগ্ধ অন্ধকার! এই ঘরের ফ্লোরেসেণ্ট আলোর স্টার্টারটা সব সময় চিন চিন করে ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটানা শব্দ করে। বহু ইলেকট্রিসিয়ান এসেছেন, নানা চেষ্টা হয়েছে। অসুখ দুরারোগ্য, সারে নি। হীরেনের বাবা বীরেনের শব্দটা সহ্য হয়ে গেছে। আসলে তাঁর বয়স যত বাড়ছে শ্রবণ শক্তিও সেই অনুপাতে কমছে। যে কোন কথা এখন দুবার না বললে শুনতে পান না। প্রথমবার স্বাভাবিক গলায়, দ্বিতীয়বার জোরে। ঘরটা শুধু অন্ধকার হল না, শান্ত স্তব্ধ হল। বাইরের কিছু শব্দটব্দও শোনা যেতে লাগল। অধীরবাবুর আইবুড়ো ছেলে বেহালা শিখছে। তিনমাস নাগাড় চেষ্টা করেও সেই একই চেরা সুর। চড়া পর্দায় উঠে সুর যেন বলছে—ছেড়ে দে মাইরি এটা তোর সাবজেক্ট নয়। বিয়ে করে পাড়ার লোককে শান্তি দে ব্যাচেলার-এর অনেক জ্বালা।

বীরেনবাবু জানালার ধারে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম-চেয়ারে বসে দুধ খাচ্ছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—আলোটা নেভালে কেন?

—আপনি তো নেভাতেই বললেন।

—নো স্যার আমি বলেছি কমাতে। তোমার চরিত্রের একটা মেন ডিফেক্ট কি জান, কে কি বলছে পুরোটা কেয়ারফুলি শুনতে চাও না। ছাত্রজীবনেও এই এক দোষের জন্যে কখনও তুমি ডিজায়ার্ড রেজাল্ট পাওনি।

—আমি শুনেছি আপনি কমাতে বলেছেন, তবে এ আলো তো সেজ কিংবা হ্যারিকেন নয় যে কমবে, তাই নিভিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে দুধে চুমুক দেবার সামান্য শব্দ হল। বীরেনবাবু অল্প একটু কেসে বললেন ওটাও তোমার চরিত্রের আর একটা মস্ত

দোষ, আগে থেকেই সব কিছু ধরে নাও। চলতি ধারণার বাইরে যেতে চাও না। ইনোভেসান বলে ইংরেজীতে একটা কথা আছে, শুনেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে জেনে রাখ এ আলোও কমাতে জানলে কমে। আলোটা জ্বালো আবার। হীরেন অন্ধকারে বেশ কয়েকবার ঠুসঠাস শব্দ করার পর আলোটা তিড়িং বিড়িং করে জ্বলে উঠল। আলোটার নিচেই বসে আছেন বীরেন। একটা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বললেন—

এইবার পাখার রেগুলেটারটা দেখতে পাচ্ছ? ওটাকে ঘুরিয়ে তিনে নিয়ে এস। দুই নয়, তিন। দুইতে নিয়ে এলে আর জ্বলবেই না।

হীরেন রেগুলেটারটাকে তিনে আনতেই চার ফুট টিউবলাইটটা অস্বচ্ছ একটা মার্বেলের ডাণ্ডার মত হয়ে গেল। কায়দাটা মন্দ নয় তো! বেশ একটা চাপা চাঁদের আলো গোছের ব্যাপার। বীরেনের ঘরে পাখাও ছিল রেগুলেটারও ছিল। সাবেক আমলের ছাপান্ন ইঞ্চি পাখা। ঢ্যাকস ঢ্যাকস করে ঘুরত। জগৎবাবু এসে বললেন—করেছেন কি? যৌবনে কারুর কথা কানে নিলেন না, লাখখানেক হাঁসের ডিম খেয়ে বাত ডেকে আনলেন, এখন আবার পাখার হাওয়া দিয়ে সেই বাতের ডিমে তা মারছেন! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারদিকে এত বড় বড় ডবল জানালা, টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স ঝড় বইছে, ন্যাচারাল হাওয়া সানসাইন, ভিটামিন, ভ্রমণ, ফ্রণ্ট বেণ্ডিং, সাইড বেণ্ডিং এইসব চালান। নেচারোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। সকালে উঠে দুকোয়া রসুন কচরমচর, কচরমচর। ঈষদুষ্ণ জলে নুন ফেলে চান। আর মনটাকে করে রাখুন পাখির মত, সারাদিন চিরাপ, চিরাপ।

জগৎবাবুর পরামর্শে পাখা হয়ত বিদায় হত না। পাখাটা নিজে নিজেই চলে গেল। শব্দ বাড়তে বাড়তে এক সময় হাওয়া আর রইল না, শব্দটাই রইল। তখন পাখা গেল অয়েলিং হতে। একেবারে অগস্ত্য যাত্রা। ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। ইতি-মধ্যে বীরেনবাবু রেগুলেটারটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছেন।

বীরেন ছেলেকে বললেন—এইবার চেয়ারটা টেনে এনে একটু

কাছাকাছি বস। খুব সিরিয়াস কথা আছে। ভেরি সিরিয়াস। দেয়ালের দিকে হাতলহীন সাবেক কালের একটা চেয়ার ছিল, হীরেন হড় হড় করে চেয়ারটাকে জানালার দিকে টেনে নিয়ে এল। বীরেন স্থির দৃষ্টিতে ছেলে হীরেনকে একবার দেখলেন। হীরেন একটু ভয় পেয়ে গেল—কিছু হল ?

—হল বৈকি। চেয়ার সরিয়ে আনারও একটা নিয়ম আছে হে। তুমি যেভাবে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এলে ওটা হল অনার্য-পদ্ধতি। হিড়হিড়, হিড়হিড়। সারা পাড়ার লোক জানতে পারল হরেনবাবু চেয়ারে বসেছেন। আমি হলে কি করতুম জান, চেয়ারটাকে সশরীরে তুলে কোন শব্দ না করে এখানে নিয়ে আসতুম। যাক ম্যান লিভস টু লার্ন। যতদিন বাঁচব ততদিনই কিছু না কিছু শিখব।

বীরেন হাসলেন! বিদ্রূপের হাসি। হীরেন চেয়ারে ভয়ে ভয়ে বসল। হয় মেঝেটা অসমান ছিল না হয় চেয়ারের পায়ায় কিছু গোলমাল ছিল, বসতেই চেয়ারটা খটাখট করে দুলে উঠল। হীরেন সাবধান হতে গিয়ে আবার একবার শব্দ হল।—আমি করিনি, একটু নড়াচড়া করলে আপনিই ওই রকম করছে। আমি বরং নিচে নেমে বসি।

—অন্য কোন উপায় ভাবতে পারলে না। নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। চেয়ারটা একটু সরিয়ে দ্যাখ তো কি হয়! হীরেন চেয়ারটা দু হাতে তুলে সাবধানে একটু সরাল, যেন কাঁচের চেয়ার. তেমনি ভারি। বসে একটু নড়েচড়ে দেখল।

—একটু বেড়ে গেল মনে হচ্ছে ?

—আবার একটু সরাও।

হীরেন আগের কায়দায় চেয়ারটাকে আবার একটু সরিয়ে বসল। আবার সেই ঢকাঢক। বলতেও সাহস হচ্ছে না। তা না হলে বলত, এটা বোধ হয় রকিং চেয়ার। তার বদলে করুণ মুখে বলল—আমার পিছনে বোধ হয় কোনও ডিফেক্ট আছে! অনেকের থাকে না! প্যাণ্টের মাপ দিতে গিয়ে দেখছিতো বাঁ দিকের চেয়ে ডান দিকের পাছাটা ভারি। আমি বরং বাঁ দিকে কিছু খবরের কাগজ গুঁজে বসি।

বীরেন অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। একটু শান

দেওয়া হাসি হেসে বললেন—রিসার্চ করে দেখার মত ব্রেন হে তোমার। নিচু হয়ে চেয়ারের পায়া চারটে একটু চেক করত! দেয়ার মাস্ট বি সামথিং।

হীরেন উবু হয়ে বসে চেয়ারের পায়া পরীক্ষা করছে। কোন কারুকার্য নেই। চৌকো, চৌকো গোদা গোদা পায়া। বহুকাল পালিশ-টালিশ পড়েনি। কালচে ছ্যাতলা রঙ। একটা পায়ায় ছোট মত একটা ফুটো হয়েছে।—একটা ফুটো হয়েছে। হীরেন বীরেনকে খবরটা জানিয়ে দিল।

শেষ চুমুকে দুধের গেলাসটা খালি করে জানালার গবরেটে রাখতে রাখতে বীরেন লাফিয়ে উঠলেন—আই সি! তাই বলি সারা রাত কি একটা কটর কটর করে। ঘুণ পোকা। কই দেখি, দেখতে পাব কিনা জানি না। যাও আলোটা বাড়াও! ফুল করে দাও। বীরেন মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসলেন। হীরেন আলোটা জোর করে দিল।

বাঃ বাঃ। বীরেন তারিফ করলেন। হীরেন ভেবেছিল তিনি বোধ হয় তার আলো জোর করার ভূমিকাকে তারিফ করলেন। তা নয়, বেশ পছন্দসই ফুটো হয়েছে—দেখি একটা কাঠি নিয়ে এস ত!

—দেশলাই কাঠি?

—এনি কাঠি। ওই তো বাইরের বারান্দায় চলে যাও ঝাটা-কাঠি পাবে। ছড়িয়ে ছত্রাকার। ও আমি পারলুম না।

—কি পারলেন না?

—ওই একটা জায়গায় আমি ডিফিটেড। ডগেড টিনাসিটি! একটা জাত বটে! যা ধরবে তা ছাড়বে না। কাদের কথা বলছেন বুঝতে না পেরে হীরেন দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন করল—কাদের কথা বলছেন, ইংরেজদের? জার্মানদের? পূর্বঙ্গীদের? সেনগুপ্তদের?

—আরে না না, কাক, কাক, কাকের কথা বলছি।

একটা খ্যাংরা নিয়ে বছরের এই সময়টায় কাকে আর বীরেনে খুব টানাহেঁচড়া চলে? সারা বারান্দায় কাঠি ছড়িয়ে আছে। বীরেন বলছেন—এই সময়টা ওদের মেটিং সিজন। বাসা বাঁধার সময়। রোজ একবার করে ঝাটাটা বাঁধছি, রোজ খুলে ফেলে

দিচ্ছে। কি ভীষণ শক্তি, কাঠের গোঁজ দিয়ে তার দিয়ে বাঁধা, ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একে কি বলে জান, স্ট্যামিনা। মানুষের বুদ্ধি আর কাকের স্ট্যামিনা বাঙালীদের মধ্যে যদি এক···

—এনেছো ? দেখি দাও। আর একটু মোটা পেলে না ?

—আনব ? অন্ধকার ত, আন্দাজে এনেছি।

—থাক, আমি কেবল দেখব গর্তটা কতটা অবধি নেমেছে !

হাঁটুর ওপর দু হাত রেখে সামনে ঝুঁকে হীরেন দেখছে। বীরেন চেষ্টা করছেন লিকলিকে কাটিটা গর্তের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকাবার। হীরেন বললে—বেড়ে হয়েছে, আগ্নেয়গিরির মুখের মত। দাঁতের বেশ জোর।

ইঞ্চি ছয়েক লম্বা কাঠির সবটাই প্রায় ঢুকে গেল। বীরেন বললেন—দেখ মজা, সাতদিনে প্রগ্রেসটা একবার দ্যাখ ! তোমার মনে আছে, আমাদের সেই পাতকো খোঁড়া। খুঁড়ছে ত খুঁড়ছেই, ফুকফুক বিড়ি খাচ্ছে, গল্প চলছে, দু ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টায় তুলে, কানটি মুলে দুশো টাকা নিয়ে গেল। বিশটা ঘুণ পোকা ছেড়ে দাও, ম্যাটার অফ সেকেণ্ডস। যাক এ আর কিছু করা যাবে না। ফিনিশড। কাঠের গুঁড়ো বেরোচ্ছে দেখছো। ট্যালকাম পাউডারকে হার মানায়। মানুষ করে বিজ্ঞানের বড়াই, হ্যাঃ ! টু হাণ্ড্রেড মেশের ফাইন ডাস্ট বের করে ছেড়ে দিলে সামান্য—একটা পোকা।

—ও বুঝেছি !

—কি বুঝেছো ?

—ওই পায়াটা একটু ছোট হয়ে গেছে বলেই চেয়ারটা ঢকঢক করছে। ধরুন প্রায় ছ ইঞ্চি মত খেয়ে ফেলেছে ত !

—এটা তুমি সিরিয়াসলি বললে, না বুড়োর সঙ্গে ইয়ারকি করলে !

হীরেন ঘাবড়ে গেল—আজ্ঞে ইয়ারকি করব কেন ! আমার মনে হল তাই ··

—জেনেটিকস বোঝো ?

—সামান্য।

—ওই প্রবাদটাও নিশ্চয় শুনেছ—বাপকো বেটা—

হীরেন পরম উৎসাহে বলল—সিপাহীকো ঘোড়া কুছ নেহি

হায় তো থোড়া থোড়া। বীরেন হাত তুলে হীরেনের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বললেন—আমার ছেলে তুমি, আমার পুরোটা না হলেও থোড়া থোড়া তোমার পাওয়া উচিত ছিল, একমাত্র লিভারের ট্রাবল ছাড়া আর কিছু পেলে না। এইবার এস তোমার ছেলেতে, তোমার থোড়া থোড়া তার পাওয়া উচিত ছিল, তা থোড়া কেন সেণ্ট পারসেণ্ট তো পেয়েইছে আরও অ্যাডিশনাল···এই নাও।

একটা পায়ার তলা থেকে পাতলা চৌকো মত একটা ইরেজার বের করে বীরেন হীরেনের হাতে দিলেন—ঢকঢকের কারণটা বুঝলে? নাও এবার বস। বীরেন নিজের জায়গায় বসে আগের কথার খেই ধরলেন—

—ঘুড়ি পেয়েছে, লাট্টু পেয়েছে, বল পেয়েছে, ইয়ার পেয়েছে. ইয়ারকি পেয়েছে, অঙ্কের বোদা মাথা পেয়েছে, হাতে কাঁচা পয়সা পেয়েছে, আলস্য পেয়েছে, কথায় কথায় মিথ্যে কথা পেয়েছে, অমনোযোগিতা পেয়েছে, ফাঁকিবাজী পেয়েছে। এখন বল তুমি একে কি করবে, কি করে সামলাবে! বসে বসে চোখের সামনে এই গোল্লায় যাওয়া আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। তোমার পাঁঠা তুমি সামলাও। আমার ওপর আর ফেলে রেখ না। এরপর তোমরা বলবে বুড়োটাই দায়ী। এই নাও নিজেই দেখ।

বীরেন হীরেনের দিকে নীল মত একখণ্ড মোটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। ষান্মাসিক পরীক্ষার ফল। শ্রীমৃগেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ষষ্ঠ শ্রেণী। রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ইংরেজী ২৩, বাংলা ৩৩, অঙ্ক ১৭। মন্তব্যঃ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রেখে এই শোচনীয় অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করুন নচেৎ · প্রধান শিক্ষক। রেজাল্টটা দেবার আগে বীরেন হীরেনকে অ্যায়সা পাম্প করেছেন, হীরেনের মনে হচ্ছে সে-ই ছাত্র। নিজের রেজাল্টটা হাতে ধরে মুখ চুন করে বসে আছে।

—কি বুঝলে?

—আজ্ঞে মিজারেবল।

—আজ্ঞে মিজারেবল নয়, ভেরি, ভেরি, ভেরি মিজারেবল। ক্লাস সিক্সে যদি এই হয় আর একটু ওপর দিকে উঠলে কি হবে বুঝতে পার!

—আর উঠবে কি করে। আমার ত মনে হচ্ছে ও একই জায়গায় থেকে যাবে।

—রাইট ইউ আর! জীবনে তোমার একটা অ্যাসেসমেণ্ট কারেক্ট হবে। হেডমাস্টার মশাইয়ের কমেণ্টসটা পড়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ পার্সোন্যাল কেয়ার।

—কেয়ার অফ দাদু করে রাখলে চলবে না। নিজেকে দেখতে হবে। তুমি কি কর!

—আজ্ঞে চাকরি করি।

—হ্যাঁ চাকরি কর, সে আমি জানি। এমন চাকরি সংসার চলে না। ছেলেটাকে একটা ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিতে পারলে না! ওকে নিজে নিয়ে কখনও বস, না সে সবের বালাই নেই।

—কেন, সকালে ঘণ্টাখানেক বসি।

—সেটা কখন?

—ওই তো সকালবেলা বাজার থেকে এসেই বসে যাই।

—তুমি ত ঘুম থেকে ওঠোই সকাল সাতটায়। অফিসে বেরোও নটায় এর মধ্যে তোমার ঘণ্টাখানেক আসছে কোথা থেকে। সকালে তোমার তেলমাখাই ত ঘণ্টাখানেক, তারপর চান আর সাবান, সাবান আর চান। তারপর তোমার চুল, চুলের কেয়ারী!

—আপনিই ত বলেছিলেন, বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। এখন তেলের নেশা ধরে গেছে। আর চুল? আপনি বলেছিলেন ছেলে বড় হচ্ছে হীরু, তোমার ওই রমণীমোহন কেশদাম একটু ছোট করে ফেল, তা এই দেখুন।

হীরেন সামনের একটা চুল টেনে কপাল অবধি নিয়ে এল—আগে ছিল দাড়ি পর্যন্ত, এই দেখুন উঠে এসেছে কপাল পর্যন্ত, যে চুল কাটছিল সে পর্যন্ত হায় হায় করে উঠেছিল। আপনি বলছেন—আপনি আচরি ধর্ম। প্যাণ্টের পায়ের দিকের ঘের কাটিয়ে ছোট করে নিয়েছি।

বীরেন বললেন—তা হলে এটা কি? হোয়াট ইজ দিস! চেয়ারের পাশ থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়ে ছেলের কোলে ছুঁড়ে দিলেন। প্যাকেটের ওপর অর্ধউলঙ্গ মেম সাহেবের ছবি। হীরেন লজ্জায় চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল। অবাক কাণ্ড। তাসের প্যাকেটটা কি করে বীরেনের হাতে এসে পড়ল? এটা ত তার

বৌয়ের সম্পত্তি! এরকম কাছাকোচা খোলা মহিলার সঙ্গে ঘর সংসার করা যায়!

তাস নিয়ে এস, তাস নিয়ে এস, মাঝে মাঝে এক আধ চাল খেলা যাবে। ভাল, পালিশ করা তাস চাই মহারানীর। ন্যাতা ন্যাতা এনো না মাইরি। সোহাগের সময় অপর্ণার মুখে তুমি মাইরি শুনবে, শালা শুনবে। গায়ের ওপর ঢলে পড়া দেখবে। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করা দেখবে। হীরেন এখনও ভেবে পায় না তার ব্রীফকেস থেকে থ্রি নাইটস কনট্রাসেপটিভের খালি কৌটো কি করে বীরেনের জোয়ানের কৌটো হয়ে গিয়েছিল! বীরেন একটু করে জোয়ান খেতেন আর হীরেন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত! যদি একবার পড়ে ফেলতেন—সেলফ লুব্রিকেটিং…। নেহাত ঘোড়ার ছবিটা আড়াল করে রেখেছে কথাগুলো! সেই কৌটো ফের চুরি করে সরিয়ে নিতে হীরেনের জান কয়লা হয়ে গেছে।

বীরেন বলছেন—ঠিক এই রকম জিনিস কোথায় থাকে জান—বেশ্যালয়ে, জুয়ার আড্ডায়। ভদ্রবাড়িতে এসব থাকে না। তুমি আমাকে কখনো তাস খেলতে দেখেছ। হীরেন ভয়ে ভয়ে বলল—না স্যার। স্যার শব্দটা বলেই বুঝতে পারলো নিজের ভুল—এটা অফিস নয়, কলেজ নয়, বসে আছে নিজের বাবার সামনে। উত্তরটা দ্বিতীয়বার ঠিক করে বলল—আজ্ঞে না।

—তোমার মনে আছে নিশ্চয় তুমি যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড় তখন তোমাকে তাসে ধরেছিল। কিছু বখাছেলে জুটিয়ে খুব চলত সারাদিন। পালের গোদা ছিল সত্য বোসের ছেলে। সত্য ছিল মদের দোকানের ম্যানেজার। ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা, চরিত্র আদর্শ এসব ওয়াটারে ইনসল্যুবল হলেও ডিজলভস ইন এলকোহল। সেই সত্য মদকোম্পানীর তাস দিয়ে নিজের ছেলের মাথাটি খেয়ে আমার ছেলের মাথাটি খাবার তালে ছিল। কিন্তু…

কিন্তু তুমি যে দেখি সেই সত্যকেও ছাড়িয়ে গেলে। সেই তাস শুধু ফিরে এল না, যে দিকেই তাকাও উলঙ্গিনী—বীরেন হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন—কে মা তুমি উলঙ্গিনী, হাসিছ, খেলিছ আপন মনে সুখের গৃহ শ্মশান করে।

হীরেন দেখলে একটা কিছু উত্তর দিতেই হয়। না দিলে

সমস্ত অপরাধ নীরবে মেনে নেওয়া হয়— আজ্ঞে তাসটা বিলিতি তাস। আমার এক বন্ধু প্রেজেণ্ট করেছিল। তাস ত আমি খেলি না। ওই মাঝেসাঝে একটু পেসেনস—আপনি বলেছিলেন না পেসেনসে, পেসেনস বাড়ে, একগ্রতা আসে।

—তাহলে এটা কি ?

হীরেনের কোলে রঙীন একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন এসে পড়ল। মলাটে জাঙ্গিয়া পরা এক মহিলা বুকটুক বের করে, ঠ্যাং উঁচু করে কি যে সব করছে, যোগাসন-টোগাসন হতে পারে। হীরেন বইটা তাড়াতাড়ি উপুড় করে ফেলল। মেয়েটা বীরেনের দিকে হীরেনের কোলে পড়ে পা-টা ছুঁড়ছিল। এটা কি করে বীরেনের হাতে এল। বইটা তো নিচের ঘরে তার বিছানার তলায় ছিল। ভেতরে আরও সব সাংঘাতিক সাংঘাতিক ছবি আছে। শোবার আগে একটু দেখলে টেখলে মন্দ লাগে না, ঘুমটা বেশ জমে ভাল। বইটা কি ভাবে ওপরে এল ! ইচ্ছে করছে নিচে নেমে গিয়ে সেই ইডিয়েট মহিলাটির গালে ঠাস ঠাস করে—

বীরেন বললেন—এটাও নিশ্চয় এয়ারমেলে বিলেত থেকে এসেছে ! চাপা দিলে কেন ? মলাটটা ওলটাও। গোঁফটা কি তোমার আঁকা ?

—গোঁফ।

—ইয়েস গোঁফ। লজ্জা কিসের ? সোজা কর। সোজা কর না।

হীরেন ম্যাগাজিনটা বাধ্য হয়ে সোজা করল। অন্য সময় হলে এই এক মলাটেই সে কাত হয়ে যেত। অপর্ণার সঙ্গে সেসব অনেক -রকম হৃদয়বিদারক ব্যাপার-স্যাপার করার জন্যে আত্মপুরুষ আঁকুপাঁকু করত। এখন সে শুধু ভোঁদার মত তাকিয়ে রইল। মহিলার ঠোঁটে নব কার্তিকের মত ফাইন গোঁফ গজিয়েছে, নীল রঙের গোঁফ।

—মেয়েছেলেটি কে ?

—আজ্ঞে ফরিয়াল।

—হরিয়াল ? তা এনার পেশা কি ?

—ফিল্ম স্টার, বম্বের ফিল্ম স্টার।

—বেশ বেশ তোমার নিজস্ব সংসার বেশ জমে উঠেছে কি বল ? এ ভাবে চলবে না বাপু। আজ সারা দুপুর তোমার ছেলে এই

দুটো জিনিস নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় গোঁফ দাঁড়ি বসিয়েছে। দু একটাকে একটু জামা কাপড় পরাবারও চেষ্টা করেছে। নুডিটি খারাপ জিনিস নয় তবে কি জান, আমরা ত সাবেক কালের মানুষ, মাকালী অবধি সহ্য হয়, মা বোম্বাইওয়ালীদের প্রতিষ্ঠিত করার মত রুচি বিকৃতি সহ্য করতে পারি না। বয়েস থাকলে ও দুটোকেই এই মুহূর্তে অগ্নিসংকার করে ফেলতুম। এখন বীরেন প্রোপোজেস হীরেন ডিসপোজেস উইথ ডিভাইন লাফটার।

—আমি তাহলে যাই। হীরেন ভয়ে ভয়ে বলল। তার মনে হচ্ছিল, উপায় থাকলে এখনি পাতালে প্রবেশ করে।

—না না যাবে কোথায়! এখনও আর একটু বাকি আছে যে বাবা হীরেন।

বীরেন চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ঘরের কোণে একটা টেবিলের দিকে। টেবিলটা কলকাতা শহরের মতই কনজেস্টেড হয়ে উঠেছে। ছোট জলের কুজো, গেলাস, ওষুধের শিশি, বাক্স, বইয়ের পর বই, খাড়া বই, কাত বই, চিৎপাত বই। টেবিলটার অবস্থা মহাভারতের মত। কি নেই! সেই মহাভারত থেকে বীরেন প্রয়োজনীয় বস্তুটি তুলে নিলেন। পেট চ্যাপ্টা একটা বোতল। বোতলটা হাতে নিয়ে হীরেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—দেখ ত এটাতে মানিপ্লাণ্ট কি রকম হবে!

হীরেনের চোখের সামনে সেই বোতল! কাল লেবেলের গায়ে তিনটে এক্স চোখের সামনে একশোটা এক্স হয়ে নাচছে—এক্স, এক্স, এক্স, এক্স রাম। হীরেন শুকনো গলায় বলল—ভালই হবে।

—বেশ, বোতল যখন এনেছো, প্ল্যাণ্টের দায়িত্বটাও তোমার নেওয়া উচিত। খালি এনেছিলে না ভর্তি? তোমার স্টকে এই সুন্দর বস্তু আর কটা আছে?

কি উত্তর দেবে হীরেন। তার প্রাইভেট ওয়ার্লড বেরিয়ে পড়েছে বিশ্রীভাবে! মলাটের মেয়েটার চেয়েও সে এখন উলঙ্গ। হীরেন তবু জিজ্ঞেস না করে পারলো না—এ সব আপনার কাছে কি করে এল?

—ও তুমি বুঝি সেই নীতিবাক্যটা ভুলে গেছ—পাপ কখনও চাপা থাকে না। হীরেন্দ্র পাপ একপ্রকার একজিমা!

আঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবিতঃ। যে ব্যক্তি শুধু নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ ও স্বার্থ লইয়া আছে পাপময়-জীবন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারনাৎ। যাহারা কেবল আপনার জন্যই পাপ করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও হীরেন তাহলে জেনে রাখ বাপু ফাঁকি দিয়ে হবে না। কিঞ্চিৎ সংযম, কিঞ্চিৎ ত্যাগ, অল্প একটু আদর্শ নিষ্ঠার প্রয়োজন হবে। আর যদি মনে করে থাক জন্ম দিয়েই তোমাদের কর্তব্য শেষ তাহলে—বীরেন সুর করে গাইলেন—শেষের সেদিন অতি ভয়ংকর। তোমাকে বলা বৃথা তবু বলি, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই।

হীরেন আর বসে থাকতে পারছিল না। একই সঙ্গে তার গোটা তিনেক ব্যাপার অবিলম্বে করার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল, বৌয়ের সঙ্গে বেশ খোলসা করে একটা ঝগড়া, ঘুমন্ত ছেলেকে কান ধরে টেনে তুলে ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড়, তাস আর কিছু বই পুড়িয়ে ফেলা। কিন্তু অনুমতি না পেলে ওঠে কি করে।

—শেষ গোটাকতক কথা তোমার ভালোর জন্যেই বলছি—বীরেন চেয়ারে বসলেন—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছ, হবেই—ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ক্রোধ থেকে তোমার মোহ হবে, মোহ তোমার স্মৃতির ওপর চেপে বসে বুদ্ধির টুঁটি চেপে ধরবে, আর বুদ্ধি গেল ত রইল কি! বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি। বাড়িতে তিনটে রেডিও ঢুকিয়েছ, একটা ওপরে দুটো নিচে। পার তো দুটোকে বিদায় কর। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও—ইট ইজ এ মাস্ট। হ্যাঁ বাধা আসবে, তোমার বউ আঁচড়ে কামড়েও দিতে পারে। শুনলুম তিনি নাকি টি ভি-র জন্যে সত্যাগ্রহ করেছেন—গোদের ওপর বিষফোড়া।

—আমি ক্যাটিগোরিক্যালি—না বলে দিয়েছি, বলেছি ওসব

হবে না, পাঁচজনে করে যাহা তুমিও করিবে তাহা, ওসব চলবে না। এ বাড়িতে আপনার নীতি, করিব যাহা অন্যে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া অনুসরণ করিবে তাহা।

—যাক জীবনে একটা না বলতে পেরেছ জেনে বড় খুশী হলুম হে। তবে তোমার না, হ্যাঁ হয়ে যেতে বেশি সময় নেয় না। তোমার দোষ কি জান, তুমি বেশিক্ষণ আদর্শ ধরে থাকতে পার না। খাঁচা খুলে ফুড়ুত করে উড়ে যায়। আচ্ছা, তবু দেখা যাক, বারে বারে চেষ্টা করতে করতে একদিন হয়তো হয়ে যাবে। ইয়েস-ম্যান থেকে নো-ম্যান। তোমার মধ্যে এম, এল, এ, কি এম, পি, হবার সমস্ত গুণই ছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেই হীরেনের খেয়াল হল এটা তো তার প্রসংসা নয়, নিন্দা, সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিয়ে বললে, আজ্ঞে না।

বীরেন ধারাল হেসে বললেন—দেখেছ তোমার না আর হ্যাঁ'র মধ্যে কোন চৌকাঠ নেই। দু নৌকায় দুটো পা, এই না, এই হ্যাঁ। রেডিওর সঙ্গে বিদায় কর ওই সর্বনেশে জিনিসটা—অ্যাকোয়ারিয়াম। পড়াশোনা কাজকর্ম সব কিছু ভণ্ডুল করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সারাদিন বসে বসে মাছের খেলা দেখ, এদিকে পেছন দিয়ে সময় জীবনের খেলা খেলতে খেলতে সরে পড়ুক। সারাদিন একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে মাছের বাচ্চা তুলে একটা জারে রাখ। এরকম মাছও দেখিনি, ফাইটার না ব্লাক মলি, ঘণ্টায় পঞ্চাশটা করে বাচ্চা পাড়ছে। মানুষকেও হার মানিয়েছে। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও হীরেন অবিলম্বে বস্তুটিও দূর কর। তাস, পাশা, দাবা, মাছ সব কটাই কর্মনাশা। যাও তাহলে, হাই উঠেছে, তোমার। দেখি কটা বাজল। ও মোটে এগারটা তেমন কিছু রাত হয়নি।

হীরেন সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নামছে। একটা হাতে তাস, ম্যাগাজিন, অন্য হাতে বোতল। এক কানকাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দু কানকাটা যায় গ্রামের ভেতর দিয়ে। এখন তার আর সেই লজ্জা নেই! মনে মনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর তার কিসের। তার গুপ্তজীবন আজ চিচিংফাঁক হয়ে গেছে।

বীরেন সিঁড়ির ওপর থেকে অবশিষ্ট উপদেশটুকু ঝুলিয়ে দিলেন—সংসার করতে হলে একটা জিনিস জেনে রাখো, বাইরে-

টাকে করতে হবে বজ্রের মত কঠোর, ভেতরটা কুসুমের মত কোমল হোক, ক্ষতি নেই। ম্যাদামারা হলেই ভুগতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বলে হীরেন শেষের দুটো ধাপ হিসেবের গোল-মালে এক সঙ্গে টপকে ফেলল। আর একটু হলেই পা-টা মচকে যেত। খুব জোর সামলে নিয়েছে। বোতলটাও হাত থেকে পড়ে যেত। খুব জোর সামলে নিয়েছে। মোটা হবার জন্যে রাম কিনেছিলে রাসকেল! হীরেন নিজেকেই নিজে গালাগাল দিল মোটা হবে মোটা! এবার রামের ঠেলা বোঝো!

বাঁদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসার ঘরটা দেখল। নিচেটা একেবারেই নির্জন। অনুচ্চ একটা ছোট টেবিলের ওপর আলোকিত অ্যাকোয়ারিয়াম। অন্ধকার ঘরে শুধুমাত্র অ্যাকোয়ারিয়ামের আলো ভারি সুন্দর একটা মায়া তৈরি করেছে। সাদা সাদা কোরাল আর সবুজ শ্যাওলা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর দিকে উঠছে। বালির বিছানার ওপর থেবড়ে বসে আছে চীনেমাটির হাঁ করা ব্যাঙ, মাঝে মাঝে ভুরভুর করে মুখ দিয়ে বুদবুদ ছুঁড়ছে। ছোট্ট একটা স্বপ্নের দেশ যেন। মুক্তোর মত রঙের একটা মাছ, রাজকীয় চালে কোরালের ডালপালার পাশ দিয়ে ওপর দিকে উঠছে। একটি কিশোরের সযত্ন পরিচর্যায় গড়ে তোলা রঙীন মাছের জগৎ।

হীরেন আলো না জেলেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হাতের জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল পাশের সেণ্টার টেবিলে। জল থেকে স্নিগ্ধ চাপা আলো অ্যাকোয়ারিয়ামের তিন পাশের কাঁচ ভেদ করে চারপাশে ক্ষুদ্র একটা জ্যোৎস্না বলয় তৈরি করেছে। সেই আলোতে তাসের সুন্দরী, ম্যাগাজিনের মলাটের পা ছোঁড়া নর্তকী. রামের বোতলের কালো লেবেল সব কিছুর যেন অন্য অর্থ! অদ্ভুত একটা সুখের গন্ধ উঠছে। হীরেন তার শোবার ঘরটাও দেখতে পাচ্ছে। নীল নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। পাখার হাওয়ায় দরজার পর্দা কাঁপছে। নাইলনের মশারির মধ্যে আর এক নীলাভ অ্যাকোয়ারিয়াম। সেখানে নিদ্রিত মাছ আর মাছের মা। বসার ঘরে বসে বসেই হীরেন শোবার ঘরের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। হলদে শাড়ি পরে এক যুবতী, না-চিৎ না-উপুড় হয়ে, নিজের কানকোর ওপর একপেশে হয়ে এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে, মাছের

মত, মারমেডের মত। তার পাশেই কাতলার মত মোটা মাথা আর একটি মাছ। যার ষাণ্মাষিক পরীক্ষার ফলাফল সংবলিত মেটো কাগজটি এখন বোম্বাই চিত্রতারকার পশ্চাদ্দেশে চাপা পড়ে আছে।

গালে হাত রেখে হীরেন অ্যাকোয়ারিয়ামটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল! বসে বসে মাছেদের খেলা দেখল। ব্লাকমলি, ফাইটার, এঞ্জেল, গোল্ড ফিশ। কখনও ওপর দিকে উঠছে, কখনও নিচে নামছে। একটা মাছের পেছন দিকে সরু সুতোর মত কি একটা বেরিয়েছে। মাঝে-মাঝে এক একটা মাছ আর একটাকে তাড়া করছে। ওলটানো একটা কাপ থেকে সুরু সুরু কেঁচো বেরোচ্ছে। বড় মাছটা হাঁ করে খেতে আসছে। হাঁ মুখ মাছটাকে দেখে হীরেনের মনে হচ্ছে সে যেন নিজেকেই দেখছে—হীরেন হাঁ করে তেড়ে যাচ্ছে অপর্ণাকে চুমু খেতে।

তছনছ করে দোবো। সব কিছু তছনছ করে দোবো। হীরেন মনে মনে বললে। অ্যাকোয়ারিয়ামের সংসার আমি তছনছ করে দোবো। আমি বজ্রের মত কঠোর। হীরেন মনে মনে যখন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠছে অ্যাকোয়ারিয়ামের ব্যাঙটা তখন মুখ দিয়ে খুব বুদবুদ ছাড়ছে। হীরেন বললে, জীবন ভাল তবে মানুষের জীবন আদৌ ভাল নয়। না, তাই বা কেন, মানুষ হয়ে জন্মানো খুব খারাপ নয়, খারাপ হল বিবাহিত মানুষ হওয়া। বিবাহে কিছু সুখ যে নেই তা নয় তবে সন্তানে বড়ই অসুখ।

গোল্ড ফিশটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভারি সুন্দর একটা শব্দ হল। সমস্ত জলে গুঁড়ো গুঁড়ো শ্যাওলা। বালির কণা চিকচিক করছে। না বেশিক্ষণ বসলে দুর্বল হয়ে পড়ব। হীরেন আগে কখনও এত মনোযোগ দিয়ে মাছের খেলা দেখেনি। বৌ, ছেলে, রঙীন মাছ সবই এক ধরনের দুর্বলতা। বন্ধুর বেশে পরম শত্রু। পরস্পর পরস্পরকে বাঁশ দিয়ে চলেছে। তুই আমার ছেলে কি রকম ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব, তস্যপুত্র ঘোর একটি লৌহমুষল। হীরেন আপন মনেই হাসল। বীরেন হল কৃষ্ণ, হীরেন হল শাম্ব, 'ইয়েস ম্যান, ব্যক্তিত্বহীন। ওই, মুষল এই তাসের প্যাকেট, ম্যাগাজিন, সব টেনেটুনে ওপরে তুলেছে আর আমার স্ত্রী, যাঁকে আমি দুধ-কলা দিয়ে পুষেছি তিনি হ্যা, হ্যা করে এই ত্রিবিধ অশ্লীল বস্তুর পদযাত্রা হাঁ করে দেখেছেন। সারা

দিন, অত বকবক করলে গুছিয়ে সংসার হয়! যার শাড়ি অনবরতই সায়ার তলায় নেমে যায়, যার ব্লাউজের কাঁধের ফাঁক দিয়ে অনবরতই টিকটিকির ন্যাজ বেরিয়ে পড়ে, যার পিঠের দিকে, কোমরের ওপর প্রায়ই ছত্রিশ নম্বর টিকিট ঝোলে, তাকে বিশ্বাস করে হরিদাসের গুপ্ত কথা বাড়িতে ঢোকানই অন্যায় হয়েছে। আমি একটি মূর্খ! পুংশ্চলী দেবর্ষি নারদকে সেই কবে বলে গিয়েছিলেন—যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধার বিষ সর্প ও অগ্নি—এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান। শাস্ত্রবাক্য না শুনলে দুঃখতো পেতেই হবে মানিক। গুফো ফরিয়াল ম্যাগাজিনের মলাট থেকে হীরেনের দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে আছে।

শেষ থেকেই তবে শুরু হোক। প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম। দ্বিতীয় রেডিও। সচল রেডিও অচল করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ঝামেলা এই আলোকিত মায়া। এরই মধ্যে দুর্বল করে ফেলেছে। তার চেয়েও শক্ত কাজ নিজের সংশোধন। সাধন করনা চাহিরে মনুয়া ভজন করনা চাই। আচ্ছা সে হবেখন। চরিত্র ছেলেখেলার জিনিস নয়।

হীরেন উঠে পড়ল। দুটো ঝঞ্চাটে প্রাণী ও-ঘরে পরমানন্দে ঘুমোচ্ছে। এই তো সময়। অপারেশন অ্যাকোয়ারিয়াম! সকালে উঠে দেখবে, ফককা ফাঁক। সাজান বাগান শুকিয়ে গেছে। হীরেন জানে তার ছেলের যন্ত্রপাতি কোথায় থাকে। বিশাল একটা কার্ড-বোর্ডের বাক্সে। বাইরে থেকে প্রথমে বারকতক টোকা মারতে হবে। আরশোলা, ইঁদুর, বিছে, মাকড়সা যাবতীয় রোমহর্ষক বস্তু হীরেনের আঙুলের মাথায় কামড় বসাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। সে সুযোগ তোদের দেবো না শয়তান। নিজের চরিত্রের ব্যাপারে অসাবধানী হলেও নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন। অত ক্যাবলা-কান্ত নই স্যার। না তেমন কিছু নেই। বাচ্চা একটা টিকটিকি তিড়িক করে লাফিয়ে মেঝেতে পড়ল। সেটাও একটা চমকে দেবার মত ঘটনা। সরীসৃপ মাত্রেই ভীতিপ্রদ।

কত কি যে আছে বাক্সটার ভেতর। একটি শিশুর কল্পনার রাজত্ব ঝাড়-লণ্ঠনের কাঁচ, খানিকটা ফ্লেক্সিবল তার। একটা অচল টেবল ক্লথ। খানিকটা মোম, দুটো ছাতার সিক, একটা কাঁচি, প্ল্যাস্টিক ব্যাগ, গোটাকতক চোপসান বেলুন, ওষুধ খাবার

প্ল্যাস্টিকের চামচে, এক পুরিয়া প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস. গোটাকতক রঙীন পেনসিলের টুকরো, একটা,চশমার কাঁচ ভাঙা পুতুল, রঙের বাক্স, মরচেধরা ছুরি। হীরেন যে বস্তুটি খুঁজছিল সেটি পেয়ে গেল একেবারে তলায়। গোল করে সাপের মত গোটান। ফুটকতক সরু অ্যালকাথিন-পাইপ প্ল্যাস্টিকের ছোট বালতিটাও পাওয়া গেল। সব কিছু এত সহজে পেয়ে যাবে সে ভাবেনি।

হীরেন যখন বসার ঘরে ফিরে এল রাত তখন আরও একটু বেড়েছে। মুক্তো রঙের মাছটা স্থির হয়ে ভাসছে। বাকি মাছ-গুলো তলার দিকে চিতিয়ে আছে। বড় ক্লান্ত সব। জলের জগতেও রাত বাড়ে। টিউবটা হাতে নিয়ে মৎসাধারের সামনে হীরেন আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বড় দ্বন্দ্ব চলছে মনে। হৃদকমলে বড় ধুম লেগেছে মজা দেখিছে আমার মনপাগলে। করব কী করব না? হীরেনের মনে হল সেই একটা ড্রাকুলা। রক্ত শুষে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মাছের জীবন জল। বড় সহজ উপায় মাথায় এসেছে। না একটু শক্ত হতে হবে। একটি ছেলের ভবিষ্যৎ বড় না মাছ বড়!

হীরেন অ্যালকাথিন পাইপটা জলের মধ্যে নামিয়ে দিল, অন্য-মুখটা ঝুলিয়ে দিল নিচের বালতিতে। জলের উচ্চতা ক্রমশই কমছে। মাছেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। মধ্যরাতে এ কী দুর্যোগ! বড় মাছটা কাঁচের জানালায় চোখ রেখে যেন বলছে—এ কি করছিস তুই ঘাতক। তিনের চার ভাগ জল পড়ে গেছে। সিকিভাগ মাত্র জলে সমস্ত মাছের সে কি আতঙ্ক! গায়ে গা লাগিয়ে ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে সেই সামান্য জলে বেঁচে থাকার কি প্রাণপণ চেষ্টা! হীরেন নলটা হঠাৎ তুলে নিল। অসম্ভব? এ তো একপ্রকার হত্যা! বালতির জলটা সে আবার ফিরিয়ে দিল।

আবার শুরু হয়ে গেল মাছেদের উল্লাস। জলটা একটু ঘুলিয়ে উঠেছে। চীনে মাটির ব্যাঙ মুখ দিয়ে বুদবুদ ছুঁড়ছে। হীরেন আবার বসে পড়েছে। রাগতে না পারলে কঠিন কাজ করা যায় না। অসম্ভব কিছু একটা করার জন্যে ভয় পেতে হবে কিংবা রাগতে হবে। রাসকেল ছেলে তুমি সারা দিন বসে বসে মাছের চাষ করছ আর ফারিয়ালের গোঁফ তৈরি করছ। ভেবেছ এই ভাবেই তোমার দিন কাটবে তাই না। মাছের ব্রেন নেই। মাছের আবার

জীবন মৃত্যুর বোধ! কত মানুষ মরে ভূত হয়ে গেল সামান্য কয়েকটা মাছ! সকালে জেলেদের জালে মাছ দেখনি, ষোল টাকা কিলো! মাংসের দোকানে ছাল ছাড়ান পাঁঠা দেখনি, চোদ্দ টাকা কিলো। লাগাও নল, চালাও নল।

হীরেন আবার পাইপটা চালিয়ে দিল। হাসপাতালের মত দৃশ্য—সেখানে বাঁচাবার জন্যে স্যালাইন দেওয়া হয়, এখানের আয়োজন বিপরীত। ধীরে ধীরে জল টেনে নিয়ে উঁচু ডাঙা তৈরি করে দাও। সমস্ত স্ফূর্তি শুকিয়ে দাও। বালতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। মাছেদের মৃত্যুর পদধ্বনি। আর তো আমি তাকিয়ে দেখব না। হীরেন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মাছদের ছটফটানি দেখলেই সে দুর্বল হয়ে যাবে। আবার তাকে জলটা ফিরিয়ে দিতে হবে। সারা রাত এই খেলাই চলবে না কি? কি এমন অপরাধ? আমার বৌ জিয়োনো সিঙ্গি কি মাগুর মাছ সকালে নুন দিয়ে বঁটির পেছন দিয়ে থেতো করে মারে না? সারা রাত যে মাছ একটা কাপড় ঢাকা বাথটাবে একটু মুক্তির জন্যে, জলের সংসারে ফিরে যাবার জন্যে অনবরতই খলবল করে। বাজারে সে দেখেনি? রুপোর মত ঝকঝকে ফলুই মাছ মাঝে মাঝেই জলের গামলা ছেড়ে আকাশ সমান লাফিয়ে উঠে আবার জলেই ফিরে আসছে, ওজন দরে তারই মত মৃত্যুভীত খদ্দেরের ব্যাগে। তবে? তবে? সংস্কৃতে সেই নীতিবাক্যটা ত এই মুহূর্তেই স্মরণ করা যেতে পারে—একটি গ্রামের মঙ্গলের জন্য একটি জনপদ, একটি শহরের জন্যে একটি গ্রাম, একটি দেহের জন্যে একটি অঙ্গ সহজেই ত্যাগ করা চলে! সো হোয়াট?

(২)

সকাল ছটা নাগাদ বাথরুমে জল আসে। কাল রাতে কলটা কেউ খুলেই রেখেছিল। তোড়ে জল পড়ছে। সেই শব্দে হীরেনের ঘুম ভেঙে গেল। রোজকার মতই অজস্র পাখি ডাকছে। কানে আসছে পিতা বীরেনের স্তোত্রপাঠের শব্দ। সেই একই রকম প্রভাত? কোনও ব্যতিক্রম নেই। সাঁইত্রিশ বছর ধরে এই একই ভাবে সকাল আসে। দিন যায়, রাত আসে। হীরেনের হঠাৎ মনে হল – না, আজকের প্রভাতের একটা নতুনত্ব আছে। সাঁইত্রিশ বছরের পুরোনো গুটি কেটে হীরেন আজ নতন প্রজাপতির মত

মশারির ভেতর থেকে উড়ে আসবে একটু সাহস করে বেরোতে হবে এই যা। বাইরে অপেক্ষা করে আছে আহত সন্তান, যার দলে সব সময়েই আছে এক নারী। সন্তানের ডাকে মা সব সময়েই সাড়া দিয়ে থাকেন। জীবন্ত মা আর জগন্মাতায় তফাৎ এই— হীরেন শুয়ে শুয়ে মিনিট পনের ডাকা-ডাকি করেও অন্তরে তাঁর সাড়াশব্দ পেল না। এখন একমাত্র ভরসা সেই গানটা. ছাত্রজীবনে যে গানটা সে খালি-জলের ড্রামের ওপর ঘুষি মারতে মারতে গাইত —হও করমেতে বীর, হও ধরমেতে বীর. হওউন্নত শির নাহি ভয়।

মশারির ভেতর থেকে মাথাটা বের করে বাইরের জগৎটা হীরেন একবার দেখে নিল! অন্য বিছানাটা খালি। যদিও মশারিটা এলোমেলো ঝুলছে এখনও। তার মানে, দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ। ঝুলির বাইরেই বেড়াল। মিঞাও করল বলে। এতক্ষণে জল শুকনো মৎস্যশ্মশান নিশ্চয় চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে দেয়ালের গায়ে লটকান তার লেখা নোটিস—ফেল্টপেনের বড় বড় অক্ষরে—পাপের বেতন মৃত্যু। লেখাপড়ায় অবহেলা করার প্রথম শাস্তি? সাবধান! সাবধান:

এখন মনে হচ্ছে আজকের ভোরটা না হলেই বোধ হয় ভাল হত। কী কাণ্ডই যে হবে রে বাবা? বিছানা থেকে নেমে চটি পায়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে মনে হল যেন ফ্রন্টিয়ারের দিকে এগোচ্ছে। মাথা নিচু করে বসে থাকলে ত চলবে না। পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে। হীরেন পর্দা সরিয়ে দরজার বাইরে আসতেই কানে এল ছেলের গলা—ওই যে নড়ছে দাদি, নড়ছে দাদি।

—নড়বেই তো দাদু, নড়বেই, একে কি বলে জানো উইল ফোর্স।

উইল ফোর্স মানে কি দাদু?

—ইচ্ছা শক্তি।

—ভেরি গুড। সবই তোমার আছে, একটু ছাই চাপা। দেখি বৌমা বাকি জলটা আস্তে আস্তে ঢাল ত।

এক সঙ্গে অনেক চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ হল। হীরেন বসার ঘরের দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিল ঘরের ভেতর কি ঘটছে। লক্ষ্য করেনি দরজার পাশে ঠেসান ছিল বীরেনের বেড়াতে যাবার ছড়িটা। মেঝেতে পড়ে ঠাস করে একটি শব্দ

হল। হীরেন তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ছড়িটা তুলছিল। বীরেন বললেন—এস স্কাউণ্ডেল ? তোমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত। নৃশংসতায় তুমি দেখি গ্রেট ডিক্টেটারদেরও হারিয়ে দিলে। তুমি আমার দাদুর চোখের জল ফেলিয়েছো এমন সুন্দর ভোরেও।

ছড়িটাকে খাড়া করে হীরেন পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। অ্যাকোয়ারিয়ামের চার-পাশে হীরেনের ছেলে, বৌ বাবার ভীষণ কেরামতি চলছে। অপর্ণার মাথায় সামান্য ঘোমটাটাও নেই। ঘাড়ের কাছে থলথলে খোঁপা। প্লাস্টিকের বালতিটা নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাকোয়ারিয়াম জলে টইটম্বুর, অধিকাংশ মাছই যথারীতি সাঁতার কাটছে। দু একটা বড় মাছ কেবল কাবু হয়ে ওপরদিকে ভাসছে।

—দাদি, আমার পার্ল গোরামিটাকে আগে বাঁচান। ওটা একদম নড়ছে না। নাতির কথায় বীরেনের দৃষ্টি হীরেনের দিক থেকে মাছের দিকে ঘুরে গেল।

—সেটা আবার কোনটা ? এই তো একটাকে বাচিয়ে দিলুম।

—ওই যে যেটা মুক্তোর মত রঙ।

—বৌমা তোল ত মাছটাকে।

—তুললে আরও মরে যাবে বাবা।

—আরে তুমিও যেমন, মরেছে আর মরতে কি ? তোল !

অপর্ণা মাছটা তুলে বীরেনের হাতে দিল। হাতের তালুতে মাছটাকে কিছুক্ষণ রেখে, বীরেন চুকচুক করে উঠলেন—ইট ইজ ডেড বৌমা, ইট হ্যাজ বিন কিলড ! ভগবানের কী ক্রিয়েশান দেখেছো ? ওয়াণ্ডারফুল ! যে ভগবান হীরেনকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানই এই মাছ সৃষ্টি করেছেন. বিশ্বাসই হয় না, কি বল বৌমা ?

—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।

—বোতল ধরেছে ?

--বোতল ?

—নাঃ তোমার আই কিউ কমে গেছে। বীরেন ড্রিঙ্ক করে ?

—ড্রিঙ্ক ? ড্রিঙ্ক করলে পে· · সরি ! অপর্ণা আধ হাত জিভ বের করে মাথা নিচু করল

—ঠিক বলেছো। লজ্জা কিসের। বুঝেছি, বুঝেছি, ওই শব্দটা তুমি আমার কাছ থেকেই শিখেছো। আমি খুব পছন্দ করি ওই ওয়ার্ডটা। অমন ফোর্সফুল শব্দ আর দ্বিতীয় নেই। অ্যান্ড হি ডিজর্ভস ইট।

রাসকেল তোমাকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আন। শিশু মনস্তত্ত্ব বোঝো কিছু? তুমি আমাকে কপি করতে গেছ মূর্খ!

হীরেন বললে—আপনি তো কাল রাতে বললেন রেডিও, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রভৃতি বিদায় করতে।

—তুমি একটি মার্জার। নরম মাটিতেই তোমার প্রথম আঁচড়। রেডিও দিয়ে শুরু করলে না কেন? সেখানে তোমার পার্সোন্যাল ইণ্টারেস্ট আছে?

দাদি আমার স্প্যাট?

বীরেন নাতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—সেটা আবার কি?

—ওই যে বাঘের মত ডোরাকাটা মাছটা।

কাঁদবে না। বৌমা যে কটা ভেসে উঠেছে সব কটা তুলে ফেল। দাদু তোমার বাবাকে একটা লিস্ট করে দাও। আজই সব কটা কিনে আনবে। আর শোন চিকেন হার্টের হলে শখ শৌখিনতা চলে না। অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে তুমি বড় কর। স্পেসটা বাড়াও। আমি আগে এত ভাল করে দেখিনি। তন্ময় করে দেয় হে। ইট ইজ এ নাইস হবি!

হীরেন ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করল—তাহলে এটা থাকবে?

- অফ কোর্স! শুধু থাকবে না, বহাল তবিয়তে থাকবে, বড়সড় হয়ে থাকবে? কিন্তু দাদু তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না ত?

—না দাদি, অঙ্কে আশি, ইংরেজী সত্তর।

—মিনিমাম সত্তর, বাংলায় সত্তর মিনিমাম, অন্যান্য সাবজেকটে মিনিমাম আশি।

বাইরে থেকে তারকবাবুর ডাক এল- কই হে বীরেন, আজ এখনও বেরোওনি, আর কখন বেরোবে, সূর্য যে টাকে উঠল।

বীরেন ব্যস্ত হলেন—দাও, দাও ছড়িটা দাও। যাচ্ছি হে।

—কী করছ কী!

বীরেন বেরোতে বেরোতে বললেন—সংসারের চাঁদোয়ায় তালি মারছি।

দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি হাঁটছেন। তারক-বাবু বলছেন—বেশ আছো।

—কেন থাকবো না। তুমি যে আছ সেটা সংসারকে মাঝে মাঝে জানান দিতে হয় বুঝেছ, তা না হলে থাকা আর না-থাকা দুটোই সমান। সংসারের স্থির জলে মাছের মত মাঝে মাঝে ঘাই মেরে উঠতে হয়—হাম হ্যায়, হাম হ্যায়।

দুই বৃদ্ধের বগলে ছড়ি। প্রয়োজন নেই তবু প্রথা। ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে জোরে জোরে হাঁটছেন। কখনও হাত নড়ছে, কখন ঘাড় নড়ছে। মাঝে মাঝে বগলের ছড়ি হাত ধরে রাস্তায় নামছে।

সেই দিন সন্ধ্যায় নিউ মার্কেটের সামনে উদভ্রান্ত একটি মানুষকে দেখা গেল। নিচু হয়ে ফুটপাথে বসে থাকা একটি লোককে জিজ্ঞেস করছে—পার্ল গোরামি হ্যায় ?—হ্যায়। লোকটি একটা শিশি উঁচু করে দেখাল। স্প্যাট ?

—হ্যায়। টাইগার বার—হ্যায়।

হীরেন গোটা তিরিশ টাকার মাছ কিনে বাড়ি ফিরছে। কোলের ওপর থলথলে জলভর্তি প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ।

হীরেনের পাশে বসেছেন এক ভদ্র-মহিলা। কোলে একটি মাঝারি মাপের দুর্দান্ত শিশু। হীরেন আর শিশুটিতে থাবার লড়াই চলেছে। হীরেন একটু অন্য মনস্ক হলেই শিশুটি যে কোনও একটা ব্যাগে থাবা মেরে দিচ্ছে। হীরেনও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা থাবা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি উদাসী ধরনের। কোনও গ্রাহ্যই নেই। হাঁ করে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন।

নিঃশব্দে থাবার লড়াই চলেছে। মিনিবাস চলেছে, লাফাতে লাফাতে। ছেলেটি হঠাৎ হীরেনের কান মলে দিল। হাতে খিমচি কেটে দিল হীরেনের সঙ্গে কিছুতেই সুবিধে করতে না পেরে, উদাসী মায়ের মুখটা কচি কচি হাত দিয়ে প্রাণপণে নিজের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতে চিল চেঁচান চেঁচাতে লাগল—মা, মাছ, মাছ, মা মা, মাছ, মাছ, মা!

সাত মাইল পথ হীরেন এইভাবে এল। সমস্ত যাত্রীর চোখে কঠোর দৃষ্টি।

হীরেনের কানে তালা লেগে গেছে। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বাড়ি ঢুকছে তালে তালে পা ফেলে—মা, মাছ, মাছ, মা, মা, মাছ, মাছ, মাছ, মা! বড় অ্যাকোয়ারিয়ামের দরজা খুলে গেল। অপর্ণাই খুলেছে। পেছনে একটি শিশুর মুখে উৎসুক বড় বড় চোখ। হীরেন মন্ত্রের মত বলছে—মা, মাছ, মাছ, মা, তালে তালে গতি তার বসার ঘরের দিকে।

অপর্ণা হঠাৎ চিৎকার করে বলল—দেখি, কি খেয়েচো হা করত। হীরেন অপর্ণার নাকের সামনে হা করতেই তার কানের তালা খুলে গেল আর শুনতে পেল তার ছেলের সোল্লাস চিৎকার, মা-মাছ। মাছ-মা।

'শার্দুলের রাত'

পরেশ কদিন থেকে লক্ষ্য করছে হল ঘরের উত্তর দিকের দেয়ালে যেন নোনা ধরছে। ছোপ ছোপ অসুস্থ ফুলের মত একরাশি দাগ সারা দেয়ালে ভেসে উঠেছে। হয়তো আরো অনেক দাগ বিশাল পেণ্টিংয়ের নীচে চাপা পড়ে আছে। মৃগাঙ্কভূষণ রায় ছড়ি হাতে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। ছবি বলেই হাসিটা অক্ষয় হয়ে আছে। সাহেব আর্টিস্টকে পঞ্চাশ বছর আগে এই ভাবে হাসি হাসি মুখেই সিটিং দিয়েছিলেন। এই ঘরেই তখন তাঁর হাসির সময়। সারা সংসার তখন তাঁর সঙ্গে হাসছে। তাঁর বিশাল চা বাগান সেই সময় দার্জিলিং হিলসের গা বেয়ে থাকে থাকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। অর্থ, সম্পদ, প্রতিপত্তির উপর একটা পা তুলে দিয়ে তিনি তখন হাসছেন।

পরেশ সারা হলঘরের ধুলো ঝাড়তে পারে। ফ্ল্যানের দিয়ে পিতলের কারুকাজ করা ফুলদানি ছবির ফ্রেম চক চকে করতে পারে। ফেদার ডাস্টার দিয়ে গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর উপর থেকে পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপের মত ধুলো উড়িয়ে দিতে পারে। মৃগাঙ্ক ভূষণের শুভ্র দাঁত থেকে ঝুল সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পঙ্খের কাজ করা উত্তরের দেয়াল থেকে ওই নুনের বিশ্রী ছোপ কি করে সরাবে! যা ভিতর থেকে আসছে, অনবরত আসছে তাকে সে আটকাবে কি করে! অল্প অল্প চূর্ণ গুঁড়ো হয়ে পুরু কার্পেটের উপর ঝরে পড়ছে। দেয়ালের ওই নোনা ছোপ পরেশের মনে তার নিজের পিঠে বেয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসছে।

বয়স যখন তার পনেরো তখন থেকে সে এ বাড়িতে আছে। এখন পয়ষট্টি। যখন এসেছিল তখন তার নিজের জীবনে সকাল এই সংসারের মধ্যাহ্ন। এরপর সে গোধূলি দেখেছে। রাত্রি এসেছে, পায়ে পায়ে। এখন বোধ হয় মধ্যযাম। মাঝে মাঝে মনে হয় ঘোরানো সিঁড়ির নীচে, কিংবা মাল পত্র রাখার খুপরি ঘর থেকে

প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকছে। শহর কলকাতায় শেয়াল ? না শেয়াল তার মনে ! এই বাড়ীতে তার সুদীর্ঘ জীবনে সে অনেক শেয়ালের রজনী দেখেছে। সাদা উর্দি পরে রঙীন গেলাসে রঙীন পানীয় পরিবেশন করতে করতে তার মনে হয়েছে সারসের ভোজ সভায় শেয়ালদের বোকামি।

পুবের জানালা খুলে দিলে, সকালের রোদ কার্পেটে লুটিয়ে পড়ে উত্তরের দিকে কিছুটা গড়িয়ে আসে, তারপর চেয়ার আর টেবিলের পায়ায় জড়াজড়ি হয়ে একটা লোমশ বুড়ো কুকুরের মত কার্পেটের উপর কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে চলে যায়। শেষ বেলায় পশ্চিমের জানলা খুললে একটু রোদের জলাশয় তৈরি হয়। পুরোনো কার্পেট থেকে বয়েসের গন্ধ ওঠে। রোদকে কিছুতেই কিন্তু উত্তরের দেয়ালে তোলা যায় না। অথচ পরেশের মনে হয় দেয়ালটাকে বেশ কিছুটা রোদ খাওয়াতে পারলে যৌবন হয়তো ফিরে আসত দেয়ালের ক্ষয় হয়তো আটকানো যেত।

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে পরেশ মাঝে মাঝে বসে পড়ে। আগেকার মত একদমে কাজ করতে পারে না। অবশ্য কাজের আর আছে কি ? এক সময় ছিল যখন এ বাড়িতে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যেত না, আর এখন ! এখন কাজ খুঁজে বের করতে হয়। পরেশ কাঁধের ঝাড়না সোফার হাতলে নামিয়ে রাখল। মনে পড়ল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এই চেয়ারে বাংলার লাট সাহেব বসে-ছিলেন আর ওই উল্টো দিকেরটায় বসেছিলেন মৃগাঙ্ক ভূষণ। সারা ঘরে লোক থৈ থৈ করছে। মাথার উপর সবকটা ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে। কি সব জমকালো পোশাক, সুগন্ধ ! দিদিমণির বয়স তখন কত হবে ? পরেশ মনে মনে হিসেব করল আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে। একেবারে সাদা পোশাক পরে ওই পিয়ানো বাজিয়ে দিদিমণি গান গেয়েছিলেন সে রাতে।

ঘরের কোণে গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটা মিঠে সুরে একবার বাজল। পরেশ অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল। সামনের দিকে তাকালো তার দৃষ্টি হল ঘর থেকে গড়িয়ে কার্পেট বেয়ে দরজা পেরিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি-বেয়ে একটা বাঁক পর্যন্ত ওঠে, পেতলের ফ্রেমে আঁটা একটা ল্যাণ্ডসেপে আটকে গেল। আর একটা বাঁক উঠলেই পরেশ দোতলায় উঠে যেত। টানা মার্বেল পাথর বাঁধান চওড়া

ঢাকা বারান্দা পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। মেহগনী কাঠের ব..
বড় বড় দরজা লাগান সারি সারি ঘর। একেবারে শেষের ঘরে এই
বাড়ির শেষ উত্তরাধিকারীনী এখনো বিছানায়। বিশাল খাটের
তুলনায়, খাটো শরীর। কোঁচকানো চাদরের সমুদ্রে মোচার
খোলা। মৃগাঙ্ক ভূষণের একমাত্র মেয়ে পদ্মিনী।

পরেশ পদ্মিণীর কথা ভেবে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। মা মরা
মেয়েকে পরেশই মানুষ করেছে। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে
মৃগাঙ্কভূষণকে মধ্যরাতে শোবার ঘরে তুলে দিয়ে. বিছানায়
শুইয়ে দিয়ে জুতো খুলে দিয়ে, আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে
পরেশ দৌড়ে আসতো পদ্মর ঘরে। কোনো দিন দেখতো ফুলের
মত ঘুমোচ্ছে, কোনো দিন দেখত জানালার কাছে চেয়ারে বসে
আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেই পদ্ম আজ প্রৌঢ়া। বাতে পঙ্গু। বিছানা আর তার ঘর
এরই মধ্যে জগৎ সীমাবদ্ধ। সাড়ে আটটা নটার মধ্যে পরেশ এক
গেলাস গরম জল, চা, আর হট ব্যাগ নিয়ে উপরে উঠবে। সাবধানে
দরজা খুলে ট্রেটা টিপয়ের উপর রেখে, একটা ওয়াশ স্ট্যাণ্ড
বিছানার কাছে টেনে আনবে। কোনো কোনো দিন কার্পেটের উপর
থেকে গড়িয়ে যাওয়া কাঁচের গেলাস তুলে রাখতে হয়। শেষ পেগ
এক চুমুকে শেষ করে পদ্মিনী এই ভাবেই গেলাস ছুঁড়ে ফেলে
দেয়। পদ্মিনী উঠবে। কোনো দিন এক ডাকে। কোনো দিন
ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙে না। তখন পরেশ হাতির দাঁতের একটা
পেপার কাটার নিয়ে পায়ের তলায় বার কতক সুরসুড়ি দেয়।
মোমের মত পা আপেলের মত রক্তাভ গোড়ালি।

বিছানায় বসে ওয়াশ স্ট্যাণ্ডে মুখ ধোবেন পদ্মিনী তারপর
এক কাপ চা খাবেন, লেবু আর অ্যাসপিরিণ দিয়ে। টকটকে
মুখে অসম্ভব খাড়া একটা নাক। টানা টানা প্রতিমার মত চোখ
অসম্ভব একটা ব্যক্তিত্ব। পরেশ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে
পদ্মিনী যখন ছোটো, যখন একসঙ্গে দুজনে খেলা করত তখন
দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই ব্যবধান ছিল না। তারপর বয়েসের
সঙ্গে সঙ্গে লাল রক্ত যখন নীল হয়ে আসতে লাগল, পরেশ আর
তখন খেলার সাথী নয়। সম্পর্ক তখন প্রভু ভৃত্যের।

পরেশ পেছন ফিরে তাকালো. মৃগাঙ্কভূষণ হাসছেন। পরেশ

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। হাসিটা যেন নীরব ভৎর্সনা যে সোফায় লাট বেলাট বসতেন, যে সোফায় স্বাধীন ভারতের যত ভাগ্যবিধাতারা বসে গেছেন, সেই সোফায় পরেশ তুই! সাম্যবাদের চূড়ান্ত হয়ে গেল যে! এতটা কি ভাল। পদ্মিনী যখন চলতে ফিরতে পারতেন তখনও পরেশ কোনোদিন সোফায় বসার সাহস পেত না। কার্পেটে বসে হুকুম শুনতো। ইদানিং সে নির্ভয়। বয়েস আর অত্যাচার আর নীল রক্তের অভিশাপ তার শেষ প্রভুকে শক্ত দুটো হাতে যেন পাকিয়ে দিয়েছে। শেষ কতবছর আগে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ওই সিঁড়ি দিয়ে পদ্মিনী ঘুরে ঘুরে পায়ে পায়ে নেমে এসেছে তার মনে নেই। এই ঘর এই সোফা এই কার্পেট এই আয়োজনের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছর ঘুরতে ঘুরতে পরেশ মাঝে মাঝে নিজেকে প্রভু ভেবে ফেলে; কিন্তু সে সাময়িক, কোথা থেকে সেই পঞ্চাশ বছরের ভৃত্য এসে কান ধরে তাকে প্রভুর আসন থেকে তুলে দেয়।

হল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে পরেশ দরজার কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ালো। দরজার পাশেই সেই ছবিটা। আর এক মৃগাঙ্কভূষণ। ১৯৪৭ সালের মৃগাঙ্কভূষণ। জনপ্রতিনিধি। মন্ত্রী মৃগাঙ্কভূষণ। উল্টোদিকের দেয়ালের অয়েল পেণ্টিংয়ের হাসি মুখে নেই। গম্ভীর সৌম্য মুখ। ব্রত উদযাপনের সংকল্প মুখে। পরেশ যেন অজস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি শুনতে পেল অজস্র হাতের তালি। মৃগাঙ্কভূষণ আজ থেকে ২৮ বছর আগে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যে বক্তৃতাকে উচ্ছ্বাস জানিয়ে একমাঠ মানুষ উল্লাসে উদ্দীপনায় ফেটে পড়েছিল শব্দ তরঙ্গে কান পাতলে পরেশ যেন এখনো স্পষ্ট শুনতে পায় জলোচ্ছ্বাসের কলোরবের মত। পরেশ কাঁধের ঝাড়ন নামিয়ে ছবির ফ্রেম আর কাঁচটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিল। সংসারে মৃগাঙ্কভূষণ এতবড় একটা উপস্থিতি ছিলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিটা যেন সহজে মেনে নেওয়া যায় না, ফুলের গন্ধের মত হাওয়ায় ভাসে, ছায়ার মত লুটিয়ে থাকে। পরেশ বাড়ির কয়েকটা জায়গায় গেলে এখনো যেন চমকে ওঠে। মনে হয় আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন। টেবিলে বসে লিখছেন। কলমের ঠাণ্ডা শরীরে এখনো হাতের গরম। বাথরুম বন্ধ থাকলে মনে হয়, শাওয়ার খুলে চান করছেন। ওয়াশ বেশিনের কাছে খাবার

পর সামনে ঈষৎ ঝুঁকে উপরের পাটির বাঁধানো দাঁত পরিষ্কার করে নিয়ে চট করে মুখে পুরে দিচ্ছেন। খুট করে দাঁত সেট হয়ে যাবার শব্দ যেন এই মাত্র বেশিনের কাছ থেকে ভেসে এল। শোবার ঘরে গেলে মনে হয়, বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন বিশাল বুকের উপর আড়াআড়ি দুটো হাত, একটা পায়ের পাতার সঙ্গে আর একটা পায়ের পাতা জড়ানো। পরেশের জীবনে মৃগাঙ্কভূষণের পঞ্চাশ বছরের অস্তিত্ব যেন মুছে ফেলা যায় না। ফুলদানি ফুলের মত মনের কোণে প্রতিষ্ঠিত।

কেটলিতে চায়ের পাতা ভেজালেই জলের ভাপের সঙ্গে দার্জিলিং চায়ের গন্ধ পরেশের নাকে এসে লাগে। এই গন্ধটা যেন পরেশের বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সাঁকো। জলে চা ভেজে। অতীতে৷ পরেশের বর্তমান ভেজে। যে রাতে মৃগাঙ্কভূষণ শহরে ভুখা মিছিলের উপর গুলি চালাবার নির্দ্দেশ দিলেন সে রাতের কথা পরেশ কোন দিন ভুলতে পারবে না। সারা শহরে সান্ধ্য আইন। রাত প্রায় বারোটার সময় মৃগাঙ্কভূষণের বিশাল কালো গাড়ি নিঃশব্দে একটা অপরাধীর মত বাড়ীতে এসে ঢুকলো। ক্লান্ত মৃগাঙ্ক সিঁড়ির হাতল ধরে ধরে উপরে উঠে গেলেন। কিছুই খেলেন না সে রাতে। ইদানিং পান করতেন না। সেদিন আবার দীর্ঘ কয়েক বছর পরে, বোতল আর গেলাসের খবর পড়ল। পরেশ সারা রাত বসে রইল ঘরের বাইরে। সারা রাত মৃগাঙ্ক পান করলেন। শেষ রাতে পরেশ শুনতে পেল মৃগাঙ্ক নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, নিজেকে তিরস্কার করছেন, কাকে যেন বোঝাতে চাইছেন, মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছেন ষড়যন্ত্র।

মৃগাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনের চাকা সেই রাত থেকেই যেন ঘুরে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, আত্মবিশ্বাস খুলে পড়ে গেল। দীর্ঘ সময় উদাস দৃষ্টি মেলে ডেক চেয়ারে শুয়ে থাকতেন। দেখে মনে হত গতিশীল প্রচণ্ড একটা ইঞ্জিন যেন ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে আসছে।

এর পরই সেই দিন, মৃগাঙ্ক নির্বাচনে হেরে গেলেন। যে কেন্দ্র থেকে তিনি এতকাল হাজার হাজার ভোটে জিতেছেন সেই কেন্দ্রে তাঁর হার হল খুবই অল্প ভোটে। তাঁর দল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সারা শহর উল্লাসে, বাজি পুড়িয়ে চিৎকার করে

মিছিল বের করে পুরোনো দিন, পুরোনো নেতৃত্বকে বিদায় জানাল মৃগাঙ্কভূষণ সে রাতে অত্যন্ত স্থির, আত্মসংযমী হয়ে রইলেন। রেকর্ড প্লেয়ারে গান শুনলেন, খুব অল্প আহার করলেন, দু চারটে লিখলেন, ডায়েরী লিখলেন, ফোনে অল্প দু একজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর মাথার কাছে আলো জেলে শুয়ে শুয়ে ছবির বই উল্টালেন। পরেশের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পও করলেন। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, একেবারে সাধারণ মানুষ। ঘাটের অন্ধকার কোণে বাঁধা ডিঙ্গি নৌকার মত স্থির, কর্মহীন।

অতবড় বিশাল মানুষটি, পরেশের চোখের সামনে দেখতে দেখতে কেমন বিবর্ণ, চাকচিক্যহীন হয়ে গেলেন। শীতের ডালের শুকনো পাতার মত। কালো রংঙের বিশাল গাড়ির পরিবর্তে এল একটা ছোটো অস্টিন। গাড়িটা প্রায়ই গেরেজে পরে থাকত। আগে বাড়ী সবসময়েই গুণগ্রাহী, স্তাবক, পার্টির দলবলে জম জমাট থাকত। দেখতে দেখতে তারা কর্পূরের মত উবে গেল। গোটা চারেক টেলিফোন মিনিটে মিনিটে বেজে উঠতো। তারাও নীরব হয়ে গেল।

আগে প্রায় প্রতিদিনই গোটা কতক সভা সমিতিতে হয় প্রধান অতিথি না হয় সভাপতি হতে হত। ব্যস্ত ডায়েরির পাতা উল্টে সময় দিতে হত। বহু জায়গায় দুঃখ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান পত্র পাঠাতে হত কিম্বা বাণী পাঠিয়ে কাজ সারতে হত। ক্ষমতাচ্যুত হবার পর সব ব্যস্ততা নিমেষে কমে গেল। শেষে বহুদিন পরে কারা যেন একবার এসেছিলেন, শিশু উদ্যানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। মৃগাঙ্কভূষণ হেসেছিলেন। করুণ হাসি। পরেশকে বলেছিলেন, তলোয়ারে মরচে পড়ে গেলে শিশুদের খেলার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।

দল ভাঙা কিছু প্রবীন একবার এসেছিলেন, দল গড়ে নতুন স্বপ্ন দেখার প্রস্তাব নিয়ে। শীতের রোদে পিঠ রেখে লনে বসে সেই বৃদ্ধ শার্দুলের দল মৃগাঙ্কভূষণকে ঘণ্টাখানেক ধরে উত্যক্ত করে চলে গিয়েছিলেন। নতুন দলের উদীয়মান নেতারাও একবার এসেছিলেন তাঁদের নতুন দলে আসবার প্রস্তাব নিয়ে। মৃগাঙ্ক-ভূষণ রাজি হননি। বলেছিলেন, মোমবাতির পরমায়ু শেষ হয়ে গেছে। নতুন রোশনাই আর সম্ভব হবে না। মৃগাঙ্কভূষণ নেতা ছিলেন না। দাপট ছিল, লোভ ছিল না।

পরেশ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। হাতে ট্রে, গরমজল, লেবু, চা, হট ব্যাগ। দশ বছর আগের সকাল আর আজকের সকাল অনেক তফাত। আগে জীবনের দিনগুলো লেবুর কোয়ার মত টেনে টেনে ছাড়াতে হত।

বারান্দার একপাশে টবের পালগাছের পাতায় ধুলো জমেছে। সারি সারি ছবির কোন কোনটা কাত হয়ে আছে। আগে এরকম থাকত না। একটা হুক খালি। একটা ছবি ছিল এখন আর নেই। এই বাড়ির একমাত্র জামাই, পদ্মিনীর স্বামীর ছবি ছিল ওই হুকে।

দিদিমণির বিয়ে হয়েছিল। দু'বছরের বৈবাহিক জীবন ভুল বোঝাবুঝিতে শেষ হয়ে গেল। রাজনীতির হাওয়ায় প্রেম বোধহয় এমনি করেই শুকিয়ে যায়। জীবন থাকে ঠিকই তবে অনেকটা বিবর্ণ ঘাসের মত। পদ্মিনী শুধু মৃগাঙ্কভূষণের মেয়ে ছিলেন না, প্রাইভেট সেক্রেটারিও ছিলেন। হয়ত এমন আশাও ছিল রাজনীতির মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে একদিন দাঁড়াবেন। স্বপ্ন অনেকটা ঘুন ধরা বাঁশের মত, গুঁড়ো গুড়ো পাউডারের মত নিঃশব্দে ঝরে যেতে থাকলে কিছুতেই থামানো যায় না।

বারান্দা ধরে এগিয়ে চলেছে পরেশ ধীর পায়ে। বাঁ দিকে ঘাড় ফেরালেই পরেশ দেখতে পাচ্ছে সবুজ লন। লনটা এখনো সবুজ আছে। আগের মত তেমন মনে করে ছাঁটা না হলেও একেবারে খাপ ছাড়া হয়ে যায় নি। মৃগাঙ্কভূষণের জীবনের শেষ দিন গুলো এই লনেই কেটেছে। লনের দিকে তাকালে পরেশ যেন এখনো দেখতে পায়, মৃগাঙ্কভূষণ ছড়ি হাতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন চওড়া কাঁধে ঝুলছে ঢল ঢলে পাঞ্জাবী। বিশাল শরীরের কাঠামোটা ঠিকই ছিল, তেমনি ঋজু, সরল, উদ্বৃত্ত মাংস আর মেদ ঝরে গিয়েছিল। যখন হাঁটতেন, পা এক টু টেনে টেনে ফেলতেন আর্থ্রাইটিস। পদ্মিনী তাঁর একমাত্র বংশধর। উত্তরাধিকারিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে

এবারের পুজো তাহলে শরৎকালেই হচ্ছে ! আকাশে ঘন কালো মেঘের তান্ডব নেই। বন্যা নেই। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভেসে চলেছে নীল আকাশে। ভোরের দিকে পূব আকাশে তাকিয়ে চমকে উঠতে হয়। ক্ষীয়মাণ চন্দ্রের সঙ্গে উদয়োন্মুখ আদিত্যের প্রায় হাত ধরাধরি মিলন। সাক্ষী একটি মাত্র তারা। বিরহী চন্দ্র যেন চুমকির মত ফ্যাকাসে। শেষরাতে চুপি চুপি বেরিয়ে এসেছেন প্রেমিকের কুঞ্জকানন থেকে। ধরা পড়ে গেছেন শেষ প্রহরী একটি তারার কাছে। সূর্য ছুটে আসছেন পেছনে সাত ঘোড়ার রাশ টেনে। সোনালী আলোর বন্যায় চাঁদের রুপোলী আলোর আয়ু এখনি শেষ হয়ে যাবে।

এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছি কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার কিরীট পৃথিবীর অধীশ্বরের মত উর্ধ্ব আকাশ থেকে মানবের লীলাভূমির দিকে নিরাসক্তের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাইন আর পপলারের ফাঁক দিয়ে বয়ে আসছে ফিতের মত জলধারা। ওইখানেই কোথাও মা উমার সংসার। মহাদেব ঘুম থেকে উঠেই হয়ত চা চাপাও চা চাপাও বলে চেঁচামেচি শুরু করেছেন। উমা বলছেন, চেল্লাচেল্লি কোরো না কেরোসিন বাড়ন্ত, কাঁচাকাঠে আগুন ধরছে না। সরস্বতী বীণায় তাহীর ভৈঁরোর আলাপ ধরেছেন, বিরক্ত হয়ে বলছেন, কি যে আরম্ভ করলে তোমরা সংসারে লক্ষ্মী লাভ হল না তোমাদের ! মেয়েটাকে ইউটিলাইজ করতে পারলে না তোমরা। উৎপাতের ধন কলকাতার চিৎপুরে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল। মহাদেব কেবলই বলছেন কুছ নেহি মাংতা, চা লেআও, অ্যাসপিরিন লেআও।

গণেশ ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে কার্তিককে বলছেন, কি ভায়া সকাল থেকেই পাঞ্জাবির হাতায় গিলে মারতে বসে গেলে আর কোন কাজকর্ম্ম নেই, সারাজীবন সেরেফ কাপ্তেনী ! কার্তিক ধমকে উঠলেন থামো, মহব্বতসে ইয়াদা কুছ নেহি, কুছ নেহি, কুচ্ছ নেহি। হু হিন্দী সিনেমার এফেক্ট !

তুমিই ত তার ফাইনেনসার। তোমাকে উল্টে উল্টেই ত আমার মামার বাড়ির দেশের কিছু লোক তোমার মত কোঁতলা হয়ে গেল। সেই টেস্টই ত মামুরা ছড়াচ্ছে!

শাক্ত কবি তন্ময় হয়ে গাইছেন, যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী।

মা আসছেন মর্তে শুম্ভনিশুম্ভ বধার্থায়। রামচন্দ্র রাবণ বধের আগে অকাল বোধন করেছিলেন। তিনি জানতেন না রামরাজত্বের শেষেই রাবণ রাজত্ব শুরু হয়ে যাবে। রামের একটি মাথা, রাবণের একশোটা। শুম্ভরা রক্তবীজের ঝাড়। এখন আর তাই রামের অকালবোধন নয়, শুম্ভ নিশুম্ভের বারোয়ারি পুজো। মা এই তথ্য জেনে গেছেন। তাই তিনি ফ্রেণ্ডলি ভিজিটে আসেন সেজে-গুজে। তিনি আর রক্তারক্তি করেন না। করি আমরা।

বিশ্বকর্মা থেকে পুজো পুজো ভাব! বাজারের বেপারী বললে পুজো ইসপিরিট। আজ্ঞে হ্যাঁ, কপি গরম জিনিস, তাই হাত দিলেই ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। পকেটে কত আছে? শুধু কপি হলেই ত হবে না। একপাশে দাঁড়িয়ে চোখ বুজিয়ে ভাবুন, কপি কড়াই-শুঁটি তেল। সরষে না বাদাম, বাদামে হাওয়া লেগেছে। ফুলে উঠেছে। কিলোতে বেড়েছে পাঁচ। ভেটকি লাগাতে চান? তাহলে মাছের বাজারটা টইল দিয়ে আসুন। ধোঁয়া ছাড়ছে। মাছে ইসমোক করছে। পঞ্চাশে একবেলা বেশ জুতসই হবে।

না থাক, আমি ভেজ হয়ে গেছি। হত্যা না করলে নন ভেজ হবার উপায় নেই। বধ করে আহার। চাণক্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নন্দবংশ ধ্বংস না করে চুলের জট ছাড়াবেন না। দেখাই যাক না, সেণ্টার প্রাইস লাইন হোল্ড করতে পারে কিনা। ততদিন শাক্ত না হয়ে বৈষ্ণব হয়ে থাকাই ভাল। কুমড়ো। কুমড়ো খুব ভাল জিনিস। অফকোর্স ভাল জিনিস। ডেঙ্গো শাক আরও ভাল জিনিস। ডাঁটাতেও ম্যারো আছে, ম্যারো দিয়ে ভাত মার। মাংস খাবার মতই এফেক্ট হবে। টুথপিক দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে যখন কায়দা করে ফাইবার বের করব, সবাই ভাববে মাটন সাঁটিয়েছে। এখন তো এফেক্টের যুগ, সাউণ্ড এফেক্ট, লাইট এফেক্ট। চুল কাটি না, প্যাণ্টের কাট হাওয়া ভরা পিপের মত সরু করি না তাও এফেক্ট। জুতোর হিল উঁচু, টল এফেক্ট। অনিরুদ্ধের স্ত্রী তার কাঁধের নীচে ছিল, হঠাৎ দেখি তিনি উঁচু হয়ে স্বামীর চেয়েও লম্বা হয়ে

পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। হেসে বললে, একদিন বেঁটে বউ ভোগ করেছি এবারে একেবারে আস্ত গার্ডনার মারমার ব্যাপার।

তা, কাল তুমি বোনাস পেলে আর আজ বাড়ি ঢুকলে ডেঙ্গো আর কুষ্মাণ্ড নিয়ে। সাধে বিদ্যালয়ে তোমাকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলত। এই আক্রমণের একটিই উত্তর, বৈষ্ণবের সবিনয় হাসি, তৃণাদপি সুনীচেন, তরুরোপি সহিষ্ণুনা, মেরেচো কলসির কানা, তা বলে প্রেম দেবো না? বোনাস পুরোটাই দেবো। বেণীর সঙ্গে মাথা, মাইনেটাও দোব প্লাস আরও কিছু ধার করে আনব। তারই এফেক্ট এই শষ্পরাজি, তাই তো আজ ভুলুণ্ঠিত কুষ্মাণ্ড খণ্ড, মৃত চিংড়ি যাকে অবহেলা করে বলা হল, উচ্চিংড়ি।

নেপোলিয়ানের মত পুজো হল আমার 'ওয়াটারলু'। 'সেকস চেঞ্জ' হয়ে গিয়ে আমি যেন দৌপদী। কাছা কোঁচা ধরে টানাটানি, দিলে আমায় উলঙ্গ করে। কাঞ্জিভরম, সাউথ ইণ্ডিয়ান, ধনেখালি, টাঙ্গাইল। 'ইকো' হচ্ছে কানের কাছে, টাঙ্গাইল, আইল, আইল, এইট্টি টোয়েণ্টি, ভয়েল, ভয়েল, অয়েল।

ঘটনাটা সত্যি কিনা জানি না, ভেরিফাই করিনি তবে হতেও পারে। জনৈক সদাশিববাবু, বোনাসের টাকা বুকপকেটে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে মেঝেতে উপুড় হয়ে অ্যালসেসিয়ানের মত শুয়ে আছেন, লাস্ট থ্রি ডেজ। কেউ কাছে গেলেই গোঁ গোঁ করছেন। বিস্কুট দেখিয়ে, স্ত্রী তাঁর শরীর দেখিয়ে কিছুতেই বের করে আনতে পারছেন না। স্কেল, কাঁচ, ফেদার ডাস্টার দিয়ে হোল ফ্যামিলি খোঁচাখুঁচি করে ফেল করেছে। মনে হয় তিনি পুজোর পর আবার মনুষ্য স্বভাব ফিরে পাবেন।

গতবার বন্যা আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। তার আগেরবার একটা হার্ট অ্যাটাক তৈরি করেছিলুম। তার আগের বার ব্যাসিলাই ডিসেণ্ট্রি। এবার? বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান এইবার আমি তোর বধিব পরাণ। লেখো—ফ্রক দশটা, বাবাসুট পাঁচটা; ধুতি সাতখানা, শাড়ি দশখানা, কোন ভয় নেই, ওই যে ডক্টর চ্যাটার্জি এসে গেছেন, একটা কোরামিন ঠুকে দিলেই মনে হবে— মরেছি আর মরতে কি। মনে পড়বে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই লাইন, পালাচ্ছিস কোথায় প্যালা!

বউদি চাঁদা হাহা। শরতের নীল আকাশ পেছনে। রোদ ঝলসাচ্ছে। গ্রিলের বাইরে দুটি তামাটে মুখ। কপাল বেয়ে

ঘাম ঝরছে। চাঁদা টাঁদার ব্যাপার বউদিরাই ভাল 'ট্যাকল' করেন। যত প্রেসার বাড়ির লোকের সঙ্গে ব্যবহারে! ঠাকুরপোদের বেলায়, হাসি হাসি পরব ফাঁস। দশ নয় বউদি কুড়ি এবার। পাড়ার পুজো। 'কস্ট' কত বেড়ে গেছে! একটা বাঁশের দাম মিনিমাম পনের টাকা।

বাঁশের দামের সঙ্গে চাঁদার কি সম্পর্ক। তুমি চুপ কর। টাকা-পত্তর যেখানে চেপে রেখেছ সেখান থেকে বের কর, রেডি রাখ। তুমি সাপ্লায়ার আমি কনজিউমার।

হ্যাঁ কি বলছিলে, বাঁশ, চাঁদা, চাঁদা বাঁশ!

মা দুর্গার ফ্যামিলিতে পাঁচজন, অসুর একজন, সিংহ একটা, মোষটাকে ছেড়েই দিচ্ছি, সেটা তো লটকে পড়ে আছে আর্ট মেরে। এই সবকটাকে খাড়া রাখতে কটা বাঁশ লেগেছে একবার হিসেব করুন। বাঁশ দেখলেই চাঁদা অটোমেটিক বাড়াতে হবে। দুটাকা চাঁদা ঠেকিয়ে হেসে হেসে মায়ের মুখটাই খালি দেখেন, পেছনে একটু ঘুরে গিয়ে কাঠামোটা একবার দয়া করে দেখলেই ল্যাঠাটা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ এবার থেকে তাই দেখব ভাই। ব্যাকগ্রাউণ্ড দেখে রেস্তো যোগাব।

আবার বকবক করছ। তোমার আর কি,এরা পুজোর যোগাড় করে তবেই না মা আমাদের আসেন। সিগারেট খেয়ে মাসে একশো টাকা ওড়াবে; বছরে একবার দশের জায়গায় পনেরো দিতে কত জেরা! কত গাওনা। লেকচার। তখন সব হিসেব বেরিয়ে পড়ল, আলুর দাম, পটলের দাম, বেকার সমস্যা, কয়লা, কেরোসিন, হ্যানা ত্যানা।

ওই জন্যেই বলি, মুরগী হৃদয় মধ্যবিত্ত একবারে টাকা বের করতে আঁতকে মরে। একসঙ্গে অনেকটা রক্ত দর্শনের মত মুহ্যমান অবস্থা। একটু একটু করে বৈশাখ থেকে পারচেজ শুরু করুন। ব্যবসাদাররা ধরতেই পারবে না পুজোর কেনাকাটা হচ্ছে। কিংবা শীত থেকেই শুরু করুন। মনে নেই—লিটল ড্রপস অফ ওয়াটার, লিটল গ্রেনস অফ স্যাণ্ড। প্রথমে একটা করে গাড়ির দুটো হেডলাইট, তারপর মাডগার্ড, স্টিয়ারিং, ক্লাচ, ব্রেক, এইভাবে কত লোক একটু একটু করে গাড়িবাড়ির মালিক হয়ে যাচ্ছে। ইনসিওরেনসের সামান্য প্রিমিয়াম বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে—বিশাল টাকার

বাণ্ডিল। আর সামান্য কয়েকটা জামা কাপড়-শাড়ি মাড়ির জন্যে ফি বছর এত জড়াজড়ি!
পুজো এলেই মনে হয়, ইস কি বিচ্ছিরি চিন্তা! ভেরি ব্যাড চিন্তা। কি ভাবে আমরা বাড়ছি! গতবছর ছোট ভাইরা ছিল তিনজন, এবছর চারজন। মেজো চারে ছিল জাম্প করে পাঁচে। অবশ্য খুবই লজ্জায় আছে। 'সেনসিবল' লোক তো, প্রচার-ট্রচার শোনে। পুজো এলেই মালুম হয়, আসা যাওয়ার জোয়ার ভাঁটা। গতবছর মামাশ্বশুরকে একটি ধুতি দিয়েছিলুম, যেমন দিয়ে আসি প্রতিবছর। এবছর তিনি আর নেই। নিকেল ফ্রেমের একটি চশমা স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে। পিসতুতো বোনকে একটি শাড়ি দিতুম এবার দিতে হবে না। স্টোভবাস্ট করে মারা গেছে। জমাদার লক্ষ্মণ গেটের সামনে একটা গেঞ্জির জন্যে ষষ্ঠীর দিন আর এসে দাঁড়াবে না। গতবছর প্রতাপ তার স্ত্রীর শাড়ি কেনার জন্যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। এবছর তাকে আর শাড়ি কিনতে হবে না। শেষ রাতের চাপা হরিবোল এখনও কানে ভাসছে।

তবে মৃত্যু পরাভূত। উর্বর মানবজমিনে অসংখ্য তৃণকেশ প্রতিমুহূর্তে গজিয়ে উঠছে। মৃত্যুর মালী কিছুই করতে পারছে না। তা হলে কি হবে? সাতটা বাবাস্যুট। ওপর দিক থেকে কিছু ছাঁটাই করে দোব। যেমন মেজ ভাইয়ের বড় মেয়েটিকে বাদ দিয়ে দিলে কেমন হয়। নবজাতককে লিস্টে ঢুকিয়ে সংখ্যা সেই তিনেতেই রাখা যাক। ঝাড়াই বাছাই করে প্রাণে বাঁচি।

কোমর জড়িয়ে ধরেছে মিষ্টি দুটি হাত। সরু সরু রুলি চিক চিক করছে কচি হাতে! অনামিকায় শঙ্খের আংটি। জেঠু এবার পুজোয় তুমি আমাকে কি দেবে।

যা ভেবেছিলুম তা আর হল না। যাকে বাদ দিয়ে বাজেট ঠিক রাখতে চাই সে এসে স্নেহের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলে। তাই বলি মা, প্রতি বৎসর তুমি এক মহা-জ্বালা। যদি ধন দিলে না ভাঁড়ে, তবে তুমি কেন আস ভাঁড়ে মা ভবানীর ঘরে।

বিস্কুট

রসিক বললে—দেখিস বাংলায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরেই রসিক রায়ের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। রঞ্জন এইমাত্র হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট মুখে লাগিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—লিখে রাখ আমার নামে, মাস কাবারে সব দিয়ে দেবো। এক বাণ্ডিল লাল সুতোর বিড়ি দিয়ে দে, কেটে পড়ি, আজ আবার মগরা যেতে হবে বালি আনতে। রঞ্জন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল। রসিক খেরোর খাতার তেরোর পাতায় রঞ্জনের একাউণ্টে সব লিখে নিল। বসন্ত এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল একবার খাতার পাতায় উঁকি মেরে দেখল রঞ্জনের কাছে রসিকের পাওনা. এরি মধ্যে কুড়ির অংক ছাড়িয়েছে।

খাতা বন্ধ করে রসিক একটু মুচকি হাসল—দোকানটা সাতদিনেই বেশ জমেছে মাইরি। ঝটাঝট মাল কাটছে। এইভাবে যদি চলে ভাবতে পারিস. বছরখানেকের মধ্যেই আর একটা নতুন কারবার ফেঁদে ফেলব. তারপর আর একটা. তারপর আর একটা। বড় কিছুর শুরু কিন্তু ছোটতেই।

গজেন এক গ্লাস চা আর একটা কাপ দিয়ে গেল—চা টা দু ভাগ করে এক ভাগ বসন্তকে দিল, তারপর কাঁচের জারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো হাতি ঘোড়া বিস্কুট বের করে সেদিনের খবরের কাগজের উপর ছড়িয়ে দিল।

বসন্ত এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। রসিকের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এক চুমুক চা খেয়ে এইবার সে মুখ খুলল—প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম তো রাখবি, বেশ বুঝলাম, কিন্তু তোর এই দোকান-দারির সাতদিনে আমদানি ক'টাকা হয়েছে ?

—কেন পুরোটাই তো আমদানি। আজ না পাই কাল তো পাব। মাসের শেষে আর কে টাকা দেবে বল ! মাসের প্রথমে দেখবি শালা তবিল উপচে পড়ছে।

বসন্ত কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না, নিমেষে একটা

লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেল। জগদীশ্বরবাবু একটা লাল লুঙ্গি পরে, গায়ে একটা হলদে গামছা ফেলে উগ্র মূর্তিতে দোকানের রকে এসে উঠলেন। একটা কাগজের মোড়োক দুম্ করে কাউণ্টারের উপর ছুঁড়ে ফেলে বললেন—ভেবেছ কি রসিক, রসিকতা পেয়েছ! আমি চাইলুম মানুষে খাবার বিস্কুট তুমি আমায় দিলে ডগ বিস্কুট। আমার বাচ্চা মেয়েটা রোজ সকালে বিস্কুট দিয়ে চা না খেলে সারাদিন সকলকে কামড়ে বেড়ায় আর আজ তোমার এই বিস্কুটের একটা খেয়েই সকাল থেকে কেঁউ কেঁউ করছে।

রসিক শিশুর মত অবাক মুখে বলল সে কি মেসোমশাই, এমন কেন হল। আগে কখনও কুকুরে কামড়ায় নি তো?

জগদীশ্বরবাবু মুখ ভেঙচে বললেন—আজ্ঞে না, তোমার এই বিস্কুট খেয়ে হয়েছে। আমি বলে রাখছি রসিক, ওই আমার এক-মাত্র মেয়ে সাত রাজার ধন এক মানিক, ওর যদি কিছু হয় রসিক তোমাকে আমি হাজত বাস করাব। রসিক ইতিমধ্যে কাগজের ঠোঙা খুলে বিস্কুটগুলো কাগজের উপর ঢেলে ফেলেছে। সেই হাতি ঘোড়া বিস্কুট। একটা বিস্কুট হাতে নিয়ে রসিক বলল—কেন কি হয়েছে মেসোমশাই, এই তো কি সুন্দর দেখতে, এই তো দেখুন না একটা খরগোস এই দেখুন আমি মাথাটা কামড়ে খাচ্ছি।

রসিক মাথাটা কামড়েই, মুখটা কেমন করল তারপর কোনরকমে ঢোঁক গিলে বলল—এই দেখুন না ফাস্ট ক্লাস খেতে, এইতো আমি পুরোটাই খাচ্ছি। খরগোসটা তার পেটে চলে গেল। রসিক এবার একটা হাতি তুলে বলল—এই দেখুন এটাকে আমি পুরো একগালে খাব। বলেই হাতিটা মুখে ফেলে মনে হল বেশ বেকায়দায় পড়েছে। খরগোস ছিল নিরীহ প্রাণী, হাতি যেন মত্ত মাতঙ্গের মত তার মুখের এ মাথা থেকে ও মাথায় গুঁতোগুঁতি করতে করতে অবশেষে গলার গর্ত গলে উদরে চলে গেল। রসিককে তখন যথার্থই কাবু দেখাচ্ছে। তবুও সে ছাড়ার পাত্র নয়। এবার একটা কচ্ছপ হাতে নিয়ে বলল—এই দেখুন এটাকেও, এটাকেও আমি সাবড়ে দিচ্ছি। বিস্কুটটা হাতে নিয়ে বেশ বোঝা গেল সে একটু ইতস্তত করছে, তারপর একেবারে মরিয়া হয়ে সেটাকে মুখে পুরে ট্যাবলেট গেলার মত গিলে নিল। গিলে নেবার পর সে মুখ তুলে তাকাল, মুখে একটা অদ্ভুত করুণ হাসি, তারপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল—

রসিকের সমস্ত মুখটা কালো হয়ে গেল, দানবের মুখোসের মত একটা অসাধারণ বিকৃতি ফুটে উঠল, তারপর একটা 'ওয়া' শব্দ করে হুড় হুড় করে বমি করে ফেলল। জগদীশ্বরবাবু একলাফে চাতাল থেকে রাস্তায় পড়লেন – পড়েই বসন্তকে বললেন—বসন্ত ও বোধহয় বেশীক্ষণ বাঁচবে না! যদি মরে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবে, আর যদি বাঁচে তাহলে ফাঁসিতেই মরবে। আমি এখন চললুম, দেখি আমার বাড়িতে আবার কি হচ্ছে।

বসন্তর পাঞ্জাবীতে বমির ছিটে লেগেছিল। রসিক ইতিমধ্যে টুলে বসে পড়েছে, মাথাটা লটকে কাউণ্টারে। সামনে ছড়ানো বিস্কুট বমিতে ভাসছে। বসন্ত দুবার রসিকের সিক বলে ডাকল, কোন সাড়া পেল না। মহামুসকিলর, রসিকে বাড়িতে খবর দিতে হবে; কিন্তু খোলা দোকান কাউকে রেখে যাওয়া উচিত, তা না হলে মাল-পত্র সরে যাবার সম্ভাবনা। এই সময় রসিক একবার ধনুকের মত বেঁকে উঠল। গলা দিয়ে জেট প্লেনের মত একটা আওয়াজ বেরোলো।

বসন্তকে বেশীক্ষণ চিন্তা করতে হল না। কাপড়ের ওপর পাক মেরে আদুল গায়ে ভুঁড়ি ফুলিয়ে ভূষণ গোয়ালা এসে হাজির হল। তারও মার-মূর্তি। বসন্ত আসতে আসতে জিগ্যেস করল—কি হয়েছে? এখন কটা বাজে?

—কি হয়েছে? এখন কটা বাজে?

—প্রায় নটা।

—আমি সেই সকাল থেকে, ভোর পাঁচটা থেকে, চেষ্টা করছি, এখনও পারলুম না।

—কি পারলে না?

—দুধ গুলতে পারলুম না। কাল রসিকের কাছ থেকে পাঁচশো মিল্ক পাউডার কিনেছিলুম, কার বাবার সাধ্য তাকে জলে গোলে। শালা সমস্ত গুঁড়ো ভুসির মত জলে ভেসে বেড়াচ্ছে, আমরা বাপ-বেটায় মিলে চেপে ধরেও শালাদের ডোবাতে পারছি না, ফস্ ফস্ করে পালাচ্ছে আর ভেসে উঠছে। এটা কি দুধ? চালাকি পেয়েছে। আমরা চারটে দামড়া ঝাড়া চার ঘণ্টা হিমসিম খেয়ে গেলুম। গেল, ইজ্জৎ গেল। এতক্ষণ রাগের চোটে কথা বলছিল। রসিকের দিকে নজর পড়েনি। হঠাৎ সামনে গড়ানো বমি আর তার পেছনে

রসিকের লটকানো মুণ্ডু দেখে ভূষণ লাফিয়ে উঠল—ছি, ছি, একি কাণ্ড রাম রাম, সকালেই মাল খেয়ে, লুটোপুটি খাচ্ছে !

বসন্ত বললে—না না মাল খাবে কেন ! হঠাৎ গা গুলিয়ে বমি করে ফেলেছে।

—গা গুলিয়ে, তার মানে দোক্তা খেয়েছে।

—না না দোক্তা নয়, গোটাকতক বিস্কুট খেয়েছিল, তাই খেয়ে !

—বিস্কুট, ওই বিস্কুট, কি সর্বনাশ, আমিও যে ওই বিস্কুট নিয়ে গেছি। কি মুসকিল ! দেখি বাড়ি গিয়ে কেউ খেয়ে মরেছে কি না !

ভূষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োল বাড়ির দিকে।

বসন্ত ভাবল ফাঁড়া কেটেছে। রসিকের সেই এক হাল, মাঝে মাঝে ধনুকের মত বেঁকে উঠছে, আর গর্জন করছে। বসন্তর একবার মনে হল, কি এমন বিস্কুট, একটা খেয়ে দেখলে হয়। তারপর ভাবল দরকার নেই, রসিকের মত হলেই মুসকিল। রসিককে দেখে মনে হল তার পেটের মধ্যে প্যাটন ট্যাঙ্ক চলেছে।

এর মধ্যে কখন রাখালবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন, বসন্ত লক্ষ্য করেনি।

—এই যে বাবা বসন্ত, ব্যাটাকে শেষ করে দিয়েছ দেখছি। জানতুম ওই ভাবেই একদিন অপঘাতে মরবে। পাড়াঘরে দোকান, বলি এঁ্যা, লোক ঠকানো কারবার আর কদিন চলবে।

কি বলছেন আপনি ? শেষ করব কেন রসিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

—অসুস্থ, ও সুস্থ ছিল কবে ? রাখালবাবু একটা জলে ভেজা সাবান বের করে বললেন—বাবা বসন্ত, এটা কি ?

—সাবান জ্যাঠামশাই।

—কোথা থেকে কিনেচি ? এই দোকান থেকে।

—কি হয়েছে কি আপনার সাবানে ?

—আমার সাবান ? রসিকের, রসিক সাবান বাবা। জলে দিতেই শালা কেবল হলদে রঙ ছাড়ছে, সাবান ছাড়ছে কই ?

হঠাৎ রাখালবাবু প্রচণ্ড রেগে, চীৎকার করে বললেন—ভেবেছে কি রাসকেল ? আমি ওর বাপের চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড় আমার পাঞ্জাবি গেল, গেঞ্জি গেল, আণ্ডারওয়ার গেল। শালা

যেন জনাডসের রুগী, সব হলদে। চোখে সরসে ফুল দেখিয়ে দিলে ?

বসন্ত ভয়ে ভয়ে সাবানটা হাতে তুলে নিল, জিনিসটা কি ভাল করে দেখার জন্যে। রাখালবাবু বললেন—ও মাল তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই। তুমি কি কেমিষ্ট ? এ হল রসিকের কারখানায় তৈরি।

বসন্ত রাখালবাবুকে ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করল—জ্যাঠামশাই এটা রেখে আপনি বাড়ি যান। রসিক একটু সুস্থ হলেই আপনাকে সব জানাব। এখন আর ওকে গালাগাল দেবেন না।

—মানে ? সাবান রেখে বাড়ি যাব তুমি ভেবেছ অত বোকা লোক আমি। আমি এই মাল নিয়ে থানায় যাব, আর তোমাকেও আমি ফাঁসাব। এডিং এবেটিং এ ক্রাইম।

বসন্ত এতক্ষণ মেজাজ ঠিক রেখেছিল—আর পারল না, তেরিয়া হয়ে বলল—যান যান যা পারেন করে নিন। নিজেও তো একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা। রেশনের দোকানের মাল পাচার করে দুপয়সা করেছেন, ভেবেছেন সব কিনে নিয়েছেন।

—কি বললি ?

—বললি নয় বললেন।

—তাই নাকি ছোকরা ?

পল্টু কোথায় যাচ্ছিল সাইকেলে করে ঝগড়া দেখে নেমে পড়ল।

—কি হয়েছে রে বসন্ত। রাখাল শালা কি পিঁড়িক মারছে ?

রাখালবাবু পল্টুকে দেখে ফ্যাকাসে মেরে গেলেন। পল্টু পাড়ার উঠতি মস্তান। রাখালবাবু কোনরকমে পালাতে পারলে বাঁচেন। রাখালের নাড়ি-নক্ষত্র পল্টুর জানা। পল্টু মুখের কাছে ডান হাতটা গোল করে লাগিয়ে পলাতক রাখাল সাধুখাঁকে একটা পুঁক দিল। এইবার চোখ পড়ল রসিকের দিকে—এ কিরে, শালার এ কি অবস্থা। এ্যাঁ উলটি কিয়া হায়। রসিকের মাথায় একটা টকাস করে গাঁট্টা মারল। মাথাটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে কাত হয়ে গেল।

—কি করে এরকম হল রে। শালার যা অবস্থা যমেও ছোঁবে না।

— বিস্কুট খেয়ে।

বস্কুট ! না খেলেই পারত। পেটে যখন সহ্য হয় না।

—খাবো বলে খায়নি। খাবার ডিমনস্ট্রেশান দিচ্ছিল।

—এখন যা হয় কিছু কর। চল চ্যাঙদোলা করে পুকুরে চুবিয়ে আনি।

—কী দরকার! মরে গেলে হাতে দড়ি। ও শালার বিস্কুটে নির্ঘাত কিছু আছে মাইরি। বোধ হয় ডগ বিস্কুট।

—কী বিস্কুট দেখি? পল্টু হাত বাড়িয়ে কাঁচের জার খুলে বিস্কুট তুলে নিল।

বসন্ত হাঁ হাঁ করে উঠল—খাসনে পল্টু। এক সঙ্গে জোড়া খাট আমি সামলাতে পারব না।

—দাঁড়া না, কি মাল একবার মুখে দিয়ে দেখি। কি আর হবে! আমরা শালা যমের অরুচি।

বসন্তর হাঁ করা দৃষ্টির সামনে পল্টু টকাস করে একটা ক্যাঙ্গারু বিস্কুট মুখে ফেলে দিল। বিস্কুটটা এক সেকেণ্ড মুখে রইল, তারপরই পল্টু থু থু করে ফেলে দিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল—শালা জানে মারা জানে মারা। প্রথমে দু'পায়ে নাচছিল, তারপর এক পায়ে। মুখে হিন্দি ছবির গান—দিল—মে চাকু মারা, হায় হায় ইয়া হুঁ জনি মেরা নাম, হায় মারো হায় মারো। তারপর ফাটা রেকর্ডের মত—মারো মারো মারো মারো করতে করতে টুইস্ট নাচতে লাগল আর মুখ চোখ জঙ্গলী ছাঁদে শাম্মি-কাপুর যে ভাবে বিকৃত করেছিল সেই রকম করতে লাগল।

বসন্ত প্রথমে ভেবেছিল পল্টু ইয়ারকি করছে; কিন্তু পল্টু যখন নাচতে নাচতে তিন ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল, বসন্ত বুঝলো ব্যাপার সিরিয়াস।

রসিকের দোকান থেকে বিশ গজের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। যাঁর রোগীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী। বসন্ত হাতে পায়ে ধরে সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এল। বৃদ্ধ মানুষ, খিটখিটে চেহারা। প্রথমে দশ পা দূর থেকে ঝুঁকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন, তারপর পকেট থেকে চশমা বের করে নাকের ডগায় লাগিয়ে বসন্তকে জিগ্যেস করলেন—বমির রঙটা কিরকম হে, সরষের তেলের মত, না মাছের পিত্তির মত, না সাপের বিষের মত?

বসন্ত বলল—হলদে হলদে।

পল্টু এদিকে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে, কাউণ্টারে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজিয়ে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে—ওরে বাবা মর গিয়া, ওরে বাবা মর গিয়া।

ডাক্তারবাবু পল্টুর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচে বললেন—এটা আবার কে। কেত্তন গাইছে না কি? দোহার দিচ্ছে। মূল গায়েন ওপরে মূর্ছা গেছে দোহারি ভাবের ঘোরে নীচে গড়াগড়ি। এ্যা একেবারে নদের লীলা। তা, কি করে হল?

বসন্ত বলল—বিস্কুট খেয়ে।

—সর্বনাশ বিস্কুট খেয়ে? বল কি হে? ফুড পয়েজ্‌নিং। দেখ তো মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে কিনা?

বসন্ত বলল—আমিই যদি সব দেখব তা আপনাকে ডাকব কেন?

—দেখবে না মানে! রুগী আমার না তোমার! আমার ই, এস, আই, আছে আমি পরোয়া করি না কারুর।

—আহা রাগছেন কেন? এই কি রাগ করবার সময়। বসন্ত সেই বুড়ো ডাক্তারকে একটু তোয়াজ করার চেষ্টা করল।

—শোন, কি নাম তোমার? ও হ্যাঁ বসন্ত। শোন বসন্ত কেস খুব সিরিয়াস। আমার চিকিৎসার বাইরে। এ পেনিসিলিন মোনিসিলিনে কিছু হবে না। কাফ মিকস্‌চার দিলেও যে হবে না সেটুকু জ্ঞান আমার আছে। ক্রীমি থেকে বমি হলে আমি হেলমাসিড কি এণ্টিপার দিতে পারতুম। মেয়েরা পোয়াতি হলে অনেক সময় বমি করে, এ সে কেসও নয়। বুঝেছ? ব্যাপারটা আসলে খুব জটিল! জলে ডোবা কেস হলেও কিছু করতে পারতুম কারণ সে ট্রেনিং আমার আছে। পুড়ে গেলেও একটা যা হোক ব্যবস্থা হত—

বসন্ত বলল—সব বুঝেছি, এখন কি হবে তাই বলুন।

—আরো বমি করতে হবে। হুড় হুড় করে বমি করতে হবে। বমি করে সব ভাসিয়ে দিতে হবে। বুঝেচ বসন্ত? তবে পেট থেকে সব বিষ বেরিয়ে যাবে। শোন তাহলে বলি, একটা ছোট্ট যৌগিক প্রক্রিয়া। তুমিও শিখে রাখতে পার' কাজে দেবে। আমরা সব করতুম যৌবনকালে।

পল্টু হঠাৎ দুম করে একটা লাথি ছুঁড়ে বলল শালাকে হাটা আর সহ্য হচ্ছে না-আ-আ—বাবারে মর গিয়া।

ডাক্তারবাবু একলাফে পিছিয়ে গিয়ে, পল্টুর দিকে ঝুঁকে পড়ে, ব্যাণ্ড মাষ্টারের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন—বমি কর, বমি কর, আরো কর, আরো কর, বমিতেই মুক্তি, বমিতেই ধৌতি।

পল্টু হঠাৎ তার ঘোরের মধ্যেই লাফিয়ে উঠল—তবে রে শালা।

ডাক্তারবাবু আর এক ধাপ পিছিয়ে গেলেন শোন বসন্ত, আমরা যৌবনকালে খুব খেতুম। আমি, অক্ষয়, হরিচরণ সব ডাক-সাইটে খাইয়ে ছিলুম। বুঝেছ। এক বালতি লেডিগিনি, এক বালতি পোলাও, ষাটখানা মাছ, ওসব আমাদের কাছে নস্যি ছিল, নাথিং। তবে কি হত জান? মাঝে-সাঝে সকালে মানে একেবারে প্রাতঃকালে একটু-আধটু অম্বল মত হত, অম্বল, অম্বল আর কি? একটু চোঁয়া ঢেঁকুর ডুকরে উঠত। তখন আমরা ওই প্রক্রিয়াটা করতাম, অব্যর্থ, সঙ্গে সঙ্গে ফল। জল খেতুম, এক গেলাস, দু গেলাস, তিন গেলাস, পারছি না তাও আর এক গেলাস আকণ্ঠ জল খেয়ে নর্দমার কাছে গিয়ে, সামনে এই ভাবে ঝুঁকে, এই যে দেখো, এই ভাবে ঝুঁকে, গলায় এই আঙ্গুল, এই যে মধ্যমা আর তর্জনী সাঁদ করিয়ে দিয়ে সুড়সুড়ি দিতুম, একবার দুবার তিনবার সঙ্গে সঙ্গে বমি ওয়াক্ করে ব-ব-ব—

বলতে বলতেই ডাক্তারবাবু হুড় হুড় করে সত্যি সত্যি বমি করে ফেললেন। বমি করেই বসে পড়লেন—ওরে বাবারে, আমার মাথা ঘুরছে রে, ওই বমিটা দেখেই আমার গা গুলিয়ে গেল রে, আমার আবার হার্ট আছে রে!

ডাক্তারবাবু আবার বমি করলেন।

—বসন্ত! ডাক্তার ডাক বাবা। এ্যমবুলেন্স আসতে দেরি করে, তুমি বরং আমার নাম করে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন কর, দমকলই আসুক। আগে হোস পাইপের জল দিয়ে আমাদের পরিষ্কার করে দিক। ওরে বাবারে আমার ঘেন্না করছে রে।

ব্যাপার স্যাপার দেখে বসন্তর চোখ কপালে উঠল। ছিল রসিক, এল পল্টু। যেমনই হোক একজন ডাক্তার এনেছিল, সেই ডাক্তারও কাত। সংক্রামক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। বসন্ত ভাবছে কি করা

যায়! বেলা বাড়ছে, সামনে বমিতে মাছি বসছে। রসিকের কি হল কে জানে? হয়ত মরেই গেল। না মরেনি শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে। তাছাড়া বসন্তই বা কতক্ষণ আটকে থাকতে পারে। সকালে-রসিকের দোকানে আড্ডা মারতে এসে, এ কি ফ্যাসাদ?

এমন সময় কুশলা এসে হাজির হল। রসিকের দোকানের সামনে হলদে রঙের দোতলা বাড়ির ওপরের তলায় কুশলা থাকে। স্কুল ফাইনাল পাস করার পর নার্সিং এর ট্রেনিং নিচ্ছে। কুশলা দোকানে পা রেখেই বলল—এ কি ব্যাপার।

পল্টুই জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিল—আমরা মরে গেছি। আমাদের গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে—

কুশলা বসন্তর দিকে তাকাল, ইশারায় প্রশ্ন করল - ব্যাপারটা কি?

বসন্ত কুশলাকে প্রথম থেকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। কুশলা বলল—তাহলে তো এখুনি কিছু করতে হয়। আমি এইমাত্র হাসপাতাল থেকে আসছি। চলুন সেখানেই নিয়ে যাই তাহলে। বসন্ত বলল—সবইতো হবে কিন্তু এই ডাক্তারের ডাক্তারি কে করবে?

—ও কিছু নয়। চলুন ওঁকে পেঁছে দি আগে বাড়িতে। ওই তো ডিসপেন্সারির ওপরেই থাকেন। একটু শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

দোকানের এককোণে একটা ছেঁড়া কাগজের বাক্স পড়েছিল, বসন্ত তাইতে মোটামোটা করে লিখল—বিক্রয় বন্ধ।

কুশলা বলল—ওসব করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কে আসবে এ দোকানে। একমাত্র ধারের খদ্দের ছাড়া। আর একটা সুবিধে ক্যাশেও কোন টাকা নেই কারণ এ দোকানে লেখাই আছে—নগদে জিনিস কিনিয়া লজ্জা দেবেন না। কুশলার সুনিপুণ ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে গেল। এম্‌বুলেন্‌স এল দমকল নয়। পল্টু আর রসিক হাসপাতালে গেল। কুশলা নিজে হাতে কাউণ্টার সাফ করে, ফিনাইল দিয়ে দোকান পরিষ্কার করে বন্ধ করে আবার চলে গেল হাসপাতালে। বসন্ত রইল সঙ্গে সঙ্গে।

হাসপাতালে পুলিশ এল। পয়জ্‌নিং কেস। মারাত্মক কিছু একটা বিস্কুটে ঢুকেছে। বিস্কুটের স্যাম্পল সিজ করা হল।

সন্ধ্যের দিকে জানা গেল রসিকের নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।

রসিক নিজেকেই নিজে বিষাক্ত বিস্কুট খাইয়েছে। ওই হাসপাতালে অন্তত আরো তেরটা ওই একই জাতীয় কেস এসেছে।

রসিক, তখন একটু সামলেছে। কুশলাকে বলল—আমাকে এখানেই রাখার ব্যবস্থা কর। ছেড়ে দিলেই পুলিসে ধরবে।

—পুলিসে না ধরুক, জনসাধারণ যার অন্য নাম পাবলিক তারাই তোমাকে পিটিয়ে মারবে। এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিও না আপাতত ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমরা কাল সকালে আবার আসব। মাথার বালিশটা ঠিক করে দিয়ে কুশলা চলে গেল।

থানার বড়বাবু বললেন—রসিকবাবু আপনি কি বলে জেনে-শুনে ওই বিস্কুট বিক্রি করলেন? আপনি জানেন এই এলাকায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার খুব পাবলিসিটি হয়ে গেছে।

—আরো হবে, যখন আপনি জেলে যাবেন।

—কিন্তু আমি জেলে যাবার আগে স্যার ওই প্রহ্লাদ যাবে। বিস্কুট আমি প্রহ্লাদের বেকারি থেকে কিনেছিলুম।

· প্রহ্লাদবাবু কিছু বলার আছে?

প্রহ্লাদের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল ঢোক গিলে বলল—স্যার আমি নাবালক। গোঁফটাই বেরিয়েছে, বুদ্ধি পাকেনি।

—তার মানে?

—মানে স্যার পৃথিবীতে যত বড় বড় মূর্খ জন্মেছে আমি তাদের মধ্যে একজন।

—এই হল আপনার কনফেসান?

—ইয়েস স্যার।

—একটু ব্যাখ্যা করুন।

—যেমন ধরুন আমি একটা বেকারি করেছি। তৈরি করি রুটি আর সস্তা বিস্কুট। আমার তৈরি রুটি স্যার চলে বেড়ায়। যেমন ধরুন, টেবিলের এইখানে রাখলুম, কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন ওই ওইখানে হেঁটে হেঁটে চলে গেছে।

—বাঃ বাঃ ভারি সুন্দর তো। ঐন্দ্রজালিক রুটি। আপনার রুটি তাহলে ম্যাজিসিয়ানরা কেনে।

—না স্যার কেউ কেনে না। কেউ কেনে না বলেই হেঁটে হেঁটে নিজেরাই খদ্দেরের দিকে চলে যেতে চায়। রুটি তৈরির পথ পড়ে

থাকে, একদিন, দুদিন, তিনদিন, রুটিদের গায়ে স্যার লোম বেরোয়, আর নিচের দিকে ছোট ছোট পা, সারা কারখানায় তারা গুটি গুটি হাঁটে।

—আর বিস্কুট ?

—বিস্কুট স্যার একবারই তৈরি করেছি। বিস্কুটের ফর্মুলায় স্যার একটু গোলমাল হয়ে গেছে। বিস্কুটে এ্যামোনিয়াম-বাই-কারবোনেট দিতে হয়। আমি ভুল করে এ্যামোনিয়াম ফসফেট দিয়ে ফেলেছিলাম। এ্যামোনিয়াম ফসফেট হল সার। ভেবেছিলুম সারবান বিস্কুট স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই হবে। গাছেরা ওই সার খেয়ে কেমন হৃষ্টপুষ্ট হয়। মানুষও তাই হবে। কিন্তু স্যার এত তেজী হয়েছে যে সহ্য হল না।

—বাঃ বাঃ বাঃ প্রহ্লাদবাবু, আপনাকে অতিথি হিসেবে পেয়ে আমরা গর্বিত। রসিক আর কুশলা থানা থেকে বেরিয়ে এল।

দুজনে পাশাপাশি হেঁটে থানার কম্পাউণ্ড অতিক্রম করে রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর কুশলা হঠাৎ তাড়াতাড়ি দুকদম এগিয়ে গিয়ে রসিকের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—দাঁড়াও। রসিক দাঁড়িয়ে পড়ল। কুশলা রসিকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল—না।

কি না ?

—হবে না। ব্যবসা হবে না। তোমাকে আমি একটা নার্সারী করে দেব। ছোট ছোট কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সারাদিন বেশ থাকবে। মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাবে, হেঁটে বেড়ান রুটি, জ্যান্ত বিস্কুট, ভেসে বেড়ানো দুধ। মজায় থাকবে, মজায় রাখবে।

—তাতে তোমার একটু সুবিধে হবে, তাই না। নিজের বাচ্চাকেও আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সারাদিন নেচে বেড়াবে।

—যাঃ ভারি অসভ্য।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পচা কুমড়োর ভুতির মত মানুষের ভেতরটা ক্রমশ বেরিয়ে আসছে। মানুষ এখন মানুষ। দেবতা হবার খুব একটা চেষ্টা আগের মত চোখে পড়ে না। ধ্যার মশাই, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বেশ জাঁকিয়ে গদীয়ান হয়ে বসি, নিজেকে, নিজের পরিবারকে একটু সামলাই তারপর অন্যের কথা ভাবা যাবে। আপনার বাবা ? কেন ? ফাদার তো বেশ সুখেই আছেন ? রাতে একপো করে খাঁটি দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পিওর মিল্ক। এই পুরু সর পড়ে। বুড়োর গোঁফে কৃতজ্ঞতার মত সাদা সাদা লেগে থাকে। পারফেক্ট হ্যাপিনেস দুধ খাবার পর মুখ দেখলে মনে হয় হ্যাপিয়েস্ট ক্যাট, এভার বর্ণ ইন দি ওয়ার্ল্ড। বেশ বেশ। তা মার জন্যে কি করেছেন ? কেন ? গর্ভধারিণীকে দেড় টাকা দিয়ে বাজারের বেষ্ট তুলসীর মালা কিনে দিয়েছি। সকাল সন্ধ্যে জপ করেন। একবার বেনারস ঘুরিয়ে এনেছি। গুরু পুর্ণিমার দিন গুরুদেবের জন্যে একখানা করে তাঁতের ধুতি কিনে দি, প্লাস পাঁচ টাকার নরম পাক। শীতকালে এক কৌটো চ্যবনপ্রাশ। রোজ দশ পয়সার পান দোক্তা। নিচের পাটির এক সেট দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছি। এ বছর বোনাস পাইনি। সামনের বছর পেলে ওপর পাটি বাঁধিয়ে দেবো।

মার শাড়ির খোলটা তেমন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না কেন ? অথচ আপনার স্ত্রীর শাড়ি ! এ আপনি কি বলছেন ? স্ত্রী আর মা এক জিনিস হল ? একটা যুগের তফাৎ। সাবেক আর আধুনিক। স্ত্রী পরেন রুবিয়ার ছ'ইঞ্চি ব্লাউজ। মাকে মানাবে ? বলুন ? তিনি পরবেন ঘটি হাতা লংক্লথ। মোটা শাড়ির আবরুও যেমন ইজ্জত ও তেমন। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে, পৌনে দুশো টাকার নাইলন জর্জেট স্ত্রীকেই মানায়। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা তাই না। তা ঠিক। তবে একটা গরদ কিম্বা একশো কুড়ি সুতোর ধনেখালি চওড়া লাল পাড়, মার মাতৃত্বের গৌরব কি একটু বাড়াতো না ? কি করবো বলুন। বাপ মাকে আমরা চার ভাই ভাগাভাগি করে নিয়েছি তো ! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একজনের

কাছে এক একজন তিন মাস করে। কোয়ার্টারলি ট্যাক্সোর মত। মা-বাবার ঋণ কি সহজে শোধ করা যায়। তবু কারুর কারু ট্যাক্স ফাঁকি দেবার প্রবণতা। ট্যাক্স ফাঁকির যুগ পড়েছে। সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, পেরেণ্টাল ট্যাক্স। মেজো যদি জনতা দিয়ে সারে, ছোট যদি তা-না-না-না করে, বড় কেন মুর্খের মত, চৌষট্টি টাকার শাড়ি কিনে মরবে। মামদোবাজী না ? তাই বুঝি রাজার দুধ-পুকুরের অবস্থা। হ্যাঁ। তাই দাঁড়িয়েছে। এ ভাবছে ও, ও ভাবছে এ যদি শুরু পরে পরে।

আমারও কি মশাই ভাল লাগে, তিন মাসে অন্তর ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর ছাতা বগলে বাবা চলেছে। কলকাতা থেকে দুর্গাপুর, দুর্গাপুর থেকে রামপুরহাট, রামপুরহাট থেকে জলপাইগুড়ি। মাকে অবশ্য মারামারি করে আমার একার দখলেই রেখেছি। ভাইয়েরা বলে, স্বার্থপর। ছেলেমেয়ে ধরার জন্যেই নাকি মাকে দাসী করে রেখেছি। নাতি নাতনি নিয়ে বুড়ী একটু আনন্দে থাকে। তার মানেটা কুচুটেরা কি করেছে দেখুন। আরে শিশু সঙ্গে স্বর্গ সুখ, শাস্ত্র বলেছে। তোরা শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়বিনি, অজ্ঞানের অন্ধকারে হাবুডুবু খাবি আর সরল শাস্ত্র বিশ্বাসীদের সমালোচনা করবি। এই তো তোরা আধুনিক। ঘেন্না ধরে গেল দাদা।

বাবাকেও তো থ্রু আউট দি ইয়ার রাখতে চেয়েছিলুম। ভাইয়েদের বললুম এসো বারোয়ারী পুজোর কায়দায় চাঁদা করে বাবাকে আমার কাছে রাখি। বিশ্বাস হল না বাবুদের। ভাবলে লাভের বারোয়ারীর মত আমি লাভের বাবা-বারোয়ারী ফন্দি এঁটেছি। চাঁদার টাকার সিকি যাবে পিতৃসেবায়, বাকিটা আমার সেবায়। কত বোঝালুম অ্যানুয়েল হিসেব, হিসেব পরীক্ষক দিয়ে সই করিয়ে সাবমিট করব। বলে কিনা ম্যানিপুলেশান হবে। ফাদারকে নিয়ে কেউ বিজনেস করে। পৃথিবীতে এরকম চামার কেউ আছে। পিতা কি পাথরের বুড়ো শিব রে মুর্খ। পাল্লা মেরে প্রফিট করবো ! যত মত তত পথ ! বুদ্ধ এখন চার ঘাটের জল ঘোলা করে, ঘোলাটে চোখে ঘুরছেন।

বেকার ছোটো ভাইটার জন্যে প্রতিষ্ঠিত দাদারা কি করছেন ? কি আর করবো বলুন ? দু-বেলা আমার অন্ন ধ্বংস করছে আর

ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যত চাকরি কলকাতায়! কার সাধ্য তাকে কলকাতা থেকে হাটায়। এত করে বললুম, দুর্গাপুরে লাকট্রাই কর। বীরভূমে গিয়ে আদার চাষ কর। কি জলপাই-গুড়িতে গিয়ে স্কুল টিচারি কর। চোর না শুনে ধর্মের বাণী। কলকাতার মধ্যেই আটকে আছে। আমার বৌ মশাই একটু পুরুষাকার জাগাবার জন্যে কম দুর্ব্যবহার করে। গণ্ডারের চামড়া। কুম্ভক করে বসে আছে। ভাল ট্যাক-টিক্স। দাদার হোটেলে খাও দাও আর ঘুরে বেড়াও। এদিকে সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। সরকারী চাকরির বয়েস চলে গেল। এখন কি করবে বাছাধন। বেশি কিছু বলার জো নেই। মারমুখ অমনি তোলা হাঁড়ি। তিন বেকারের হুলায় গলায়, মা, বাবা, বেকার ভাই। ছোটো ছেলের জন্যে স্নেহের ভাণ্ড উপচে পড়ছে। চাকরির দরখাস্ত আর পোস্টাল অর্ডারে মাসে অ্যাভারেজে তিরিশ টাকা খরচ। সাধে আমার বৌ রেগে যায়। আজ পর্যন্ত একটা চাকরি জুটলো না। বললেই বলবে ফেভারিটিজম।

আইবুড়ো বোন ছিল না একজন? ছিল তো! আমার কাছেই ছিল। দুবেলা বৌদির সঙ্গে চুলোচুলি। বয়স্থা মেয়ে বিয়ে না হলে যা হয়। বিয়ে হবে বলেও মনে হয় না। মাব মুখ কেটে বসানো। সামনের দুটো দাঁত, উঁচু। এখনকার ছেলেরা তো আর আমার বাবার মত অন্ধ নয়। তারা বাজিয়ে নেবে। রূপ চাই, গুণ চাই, চাকরি চাই। কোনোটাই তার নেই। এদিকে বাবা আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা পুরো মেয়েকে উৎসর্গ করে বসে আছেন। কারুর ভোগেই লাগছে না। ডগ ইন দি ম্যানজার পলিসি। অতগুলো টাকা, ন দেবায়, ন হবিষায়। এত লেদাড়ুস মেয়ে তুই, একটা বর জোটাতে পারছিস না। যৌবন থাকতে থাকতে চারে একটা ভেরা। দেখা যাক কি হয়, দুর্গাপুরে গেছে। আইবুড়ো চাকরেদের আড়তে।

আপনার নিজের বৃদ্ধ বয়েসটা কেমন যাবে বলে মনে হচ্ছে। ওঃ ফাইন। আমি তো আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছি। প্ল্যানড ফিউচার। প্ল্যানড ফ্যামিলি। ফিক্সড ডিপোজিট। ইনসিওরেন্স পেনসান। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড। নিজের বাড়ি। একটা অংশে ভাল ভাড়াটে। মোটা ভাড়া। একটি মেয়ে। অলরেডি ম্যারেজ

পলিসি ওপন করে ফেলেছি। এখন থেকে ধান্দায় আছি, অভি-ভাবকহীন, মালদার, ভাল চাকুরে ছেলের। আড়কাঠি বেরোবে। বিয়ে দিতে পারছি কিনা জানি না। মেয়ের মাথায় যদি আমার হেডের ছিটে ফোঁটা থাকে তা হলে আজকালকার মত নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। হয়তো করবেও না। মর্ণিং শোজ দি ডে। এখন থেকেই তার যা চালচলন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মত। আমাদের স্বভাবই ডাইল্যুটেড হয়ে ক্রমশই পোটেনসী বাড়ছে। আত্মপরতা থার্টি থেকে টু হাণ্ডেডে থেকে থিব্রটায় গিয়ে উঠবে। জামাইটা মনের মত ধরতে পারলে আমার ভবিষ্যৎ আরো পাকা। বৃদ্ধ শ্বশুর হামেসাই জামাই বাবাজীবনের কেয়ারে একটু মেয়ের আদর পাবে। তোরা ছাড়া বুড়োর আর কে আছে বল ? ঈশ্বর তোমাকে আরো উন্নতি দিন, অর্থ দিন (আমি তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গি, উহ্য)। ভুলে যেওনা, মেয়ে আমার, তোমাকে আমি পারচেস করেছি। তুমি এই বৃদ্ধের পালকি বেহারা। কোনো-রকম বেচাল দেখলেই মেয়ে আমার দেবে টাইট দিয়ে। তখন ওসব সভ্যতা ভদ্রতা মানবো না। পাশবিক জগতের সোজা নিয়মেই চলবে আচার আচরণ।

একটা ছেলে। মানুষ করে যাবো। দেখে দেখবে, না দেখে কুছ পরোয়া নেই। নিজের ব্যবস্থা করেই রেখেছি। না দেখাটাই স্বাভাবিক। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। আর বুড়ী যদি বুড়োকে লাথি মারে ! টাকা দিয়ে নয়া দিল কিনে নোবো ম্যান। ইওরোপ আমেরিকায় বুড়োর বুড়ো তস্য বুড়ো টাকার জোরে বিয়ে করে মিসট্রেস রাখে। লাইফ হচ্ছে গিভ এণ্ড টেক, বার্টার সিসটেম।

মানুষের জীবনে সমস্যার শেষ নেই। কিছু আমরা সমাধান করতে পারি। আর কিছু আমাদের সঙ্গের সাথী হয়ে একেবারে চিতায় গিয়ে শেষ সমাধান খুঁজে পায়। সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে আমরা সংসার করি। কিন্তু অপরেশবাবুর ব্যাপারটাই আলাদা সমস্যার শর-শয্যায় পিতামহ ভীষ্মের মত অপরেশ বাবু শায়িত। তাঁর কোনো সমস্যারই ভৌতিক সমাধান সম্ভব নয়। অপরেশবাবু সমস্যার সজারু।

যারা অফিস কাছারি করে তাদের সকালটা এমনিই খুব সংক্ষিপ্ত। তার ওপর দু একটি অপরেশবাবুর উদয় হলে হয় স্নান না হয় দাড়ি কামানো, যে কোনো একটা বাদ দিতেই হয়। দাড়িতে সবে সাবান মেখেছি মহাচিন্তিত মুখে অপরেশবাবু হাজির। হাতে এক টুকরো কাগজ। এক আধদিন একটু বিরক্ত হয়েছি বলেই আগেই ভূমিকাটা সেরে নিলেন, ঠিক এক মিনিট সময় নেবো। দাড়ি চাঁচা-ছোলার মধ্যেই হয়ে যাবে। এই চিরকুটটা। টুকরো কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিলুম। কাগজে বিশাল একটা সংখ্যাঃ ১০৪০৭১৩২১১৪৬৬৪৩১১০৮১১২৫২৪০৩২৭৩৬৪০৮৫৫৩৮৬১৫২৬২ ২৪৭২৬৬৭০৪৮০৫৩১১১২৩৫০৪০৩৬০৮০৫১৬৭৩৩৬০২১৮০১। মাথাটা ঘুরে গেল। একেই লো-প্রেসার। ধকল সহ্য হয় না। অপরেশবাবুর ধোঁয়া ধোঁয়া মুখের দিকে তাকালুম। 'এটা কি মশাই মানুষ মারার কল!'

অপরেশবাবু যথারীতি গম্ভীর, 'এক মাস আমার ঘুম নেই। যতক্ষণ না সমাধান পাচ্ছি ঘুম আর আসবে না।'

আমি তখন একটু সামলেছি। সাহস করে বললুম, সমস্যাটা কি না বুঝলেও সমাধানটা বলে দিতে পারি। সমাধান হল এই— কাগজটা টুকরো টুকরো করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলুম। অপরেশ-বাবুর মুখ দেখে মনে হল, আমি যেন এই মাত্র একটা মার্ডার করেছি। ছিঁড়ে ফেললেন। জানেন এই সংখ্যাটা আপনার জন্যে লিখে আনতে আমার পাক্কা এক ঘণ্টা সময় লেগেছে। কেবল গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে। আপনি ছিঁড়ে ফেললেন।'

ভদ্রলোক এমন কাঁদো কাঁদো মুখে কথা কটা বললেন, বড় মায়া হল। বললুম বসুন চা খান। ওসব এক গাদা নয় ছয় নিয়ে মাথা খারাপ করে কি হবে ?

অপরেশবাবু মোটা শরীর নিয়ে থপাস করে বসে পড়ে বললেন একশো তের বছর ধরে পৃথিবীর গণিতজ্ঞরা সংখ্যাটা নিয়ে বিব্রত

বিব্রত হবার কারণ ?

সংখ্যাটাকে ভাগ করা যায় কিনা ? এই হল তাঁদের সমস্যা।

সব ছেড়ে আপনি সেধে ওই উটকো সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছেন কেন ?

এমন কিছু রূঢ় কথা বলিনি। অপরেশবাবু চা না খেয়েই অত্যন্ত আহত মানুষের মত একটি কথাও না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

একদিন সকালে মাছের বাজারে এই অদ্ভুত চরিত্রটিকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম। ভীষণ ঝগড়া চলছে। মাছওলাও চেঁচাচ্ছে আর এক খদ্দের অনর্গল হিন্দি বলে চলেছেন। চারপাশে গোল হয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। দূর থেকে আমার কানে আসছে চালাকি পা-গিয়া। কেতনা রোজ আয়সা জোচচুরি চলে গা সিসটেম চালু করনে পড়ে গা।

মাছওলার খালি একই কথা, যান না মশাই, আপনার মত খদ্দে আমি অনেক দেখেছি।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি স্থূলকায়, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক। এক হাতে মাছের ব্যাগ অন্য হাতে একটা দশ টাকার নোট। উত্তেজনায় মুখ টকটকে লাল। ঝগড়াটা দেখলুম সকলেই উপভোগ করছেন। কেউই থামাবার চেষ্টা করছেন না।

জিজ্ঞেস করলুম আপনি বাঙালী ?

ভদ্রলোক বললেন, জরুর বাঙালী!

তবে হিন্দিতে কথা বলছেন কেন ?

মাছওলা বললে, এর নাম হিন্দি।

ভীড়ের মন্তব্য, এর নাম ব্রজবুলি। ব্রজের রাখালরা এই ভাষায় কথা বলতো, বুঝলে মধু। মাছওলার নাম মধু।

ঝগড়ার কারণটা কি ? কারণ ভারি অদ্ভুত। অপরেশবাব

বেশ একটা পাকা রুই মাছ থেকে তিনশো গ্রামের মত একটা টুকরো ওজন করিয়েছেন। তারপর মধুকে বলেছেন আঁশ ছাড়াও। মধু ছাড়িয়েছে। তারপর বলেছেন আবার ওজন কর। দ্বিতীয় ওজনে পঞ্চাশ গ্রাম কম হয়েছে। অপরেশবাবু আড়াই শো গ্রামের দাম দেবেন। তাঁর যুক্তি তিনি পনেরো টাকা দরে মাছ নেবেন আঁশ নিতে যাবেন কি কারণে। আঁশ আর মাছ এক! মধু জীবনে এমন যুক্তি শোনে নি। তার বক্তব্য আঁশ ছাড়া মাছ হয়? অপরেশবাবু যখন মাছ ওজন করিয়ে আঁশ ছাড়াতে বাধ্য করেছেন তখন তিনশোর দাম দিয়ে মাছ নিতেই হবে। না নিলে অপরেশবাবুকে বাজার থেকে বেরোতে দেবে না। হৈ হৈ ব্যাপার। দু-পক্ষই অনমনীয়। ভদ্রলোককে দেখে আমার মায়া হয়েছিল। মাছওলার অপমান থেকে রেহাই দেবার ভার আমিই নিলুম। তিনশোর দাম দিয়ে মাছ আমিই ব্যাগে পুরলুম। অপরেশবাবু গজগজ করতে করতে চলে গেলেন চোখে সেই দৃষ্টি, আমি যেন কত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি।

ওই ঘটনার দিনই সন্ধ্যের দিকে কিভাবে ঠিকানা যোগাড় করে অপরেশবাবু এসে হাজির। ভীষণ বিক্ষুব্ধ। আমি নাকি মহা অন্যায় করে ফেলেছি। একটা দীর্ঘদিনের অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছি। যাই হোক প্রায়শ্চিত্তের একটা রাস্তাই খোলা আছে। ওজনে কম দেওয়ার বিরুদ্ধে যে ভলেণ্টিয়ার ফোর্স গড়ে তুলতে চলেছেন, তার পেছনে আমাকে মদত দিতে হবে। অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, সবকো এক সাথ চুলা মে চড়ায় গা।

উত্তেজিত হলে মশাই আমি হিন্দি বলি। চেয়ারে বসে পা ঠুকতে ঠুকতে অপরেশবাবু গাইলেন, কদম, কদম বাড়ায়ে যা! কদম, কদম?

অপরেশবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। ছোট্ট ফ্ল্যাট। স্বামী স্ত্রীর ছিমছাম সংসার। একটি মাত্র ছেলে ছিল। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লেবার অফিসার হিসাবে কাজ করতেন। দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই স্ত্রী ধর্মের দিকে গেছেন, অপরেশবাবু অধ্যায়নের দিকে। নানা বই পড়েন। আর রাজ্যের সমস্যা মাথায় নিয়ে সারা রাত নির্জনে রাস্তার দিকের জানালায় বসে একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে যান।

সেই সকালে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার পর অনেকদিন অপরেশ-বাবুকে দেখিনি। হঠাৎ একদিন দেখা। আমাকে দেখেও না দেখার মত ভাব করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম কি ব্যাপার? রাগ হয়েছে?

ফিস ফিস করে বললেন ভীষণ চিন্তায় পড়েছি।

আবার কি হল? সেই সংখ্যাটা?

না—না, ওটার সলিউশান করে ফেলেছি।

অবাক হতে হল। কে এমন ধনুর্ধর। এই মহাগাণিতিক সমাধানটি করে ফেলেছে।

বললাম, আপনি?

আমার অজ্ঞতায় তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, মানুষের একশো তের বছরের চেষ্টায় যা হয়নি, এক কথায় কম্পিউটারে সেই সমাধান বেরিয়ে এসেছে। সংখ্যাটি প্রাইম, ভাগ করা যায় না।

তা হলে আর সমস্যাটা কি?

পাশ দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। বড়রা যেভাবে শিশুকে টেনে নেয়, সেইভাবে আমাকে নর্দমার ধারে নিরাপদ স্থানে টেনে নিয়ে বললেন ঃ এবারে অন্য, আচ্ছা বলতে পারেন, সাদা ধবধবে, কালো-কুচকুচে, লাল টকটকে, হলদে কী?

এবার আমার অবাক হবার পালা, হলদে কী মানে?

অপরেশবাবু ব্যাখ্যা করলেন, আমরা সাধারণত কি বলি—সাদা ধবধবে, কালো কুচকুচে, লাল টকটকে। তাইতো হলদের বেলায় কি দিয়ে মেলাবো। হলদে কি? বলুন, হলুদ কি?

বলতে বলতে অপরেশবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার সেদিনের চোখের দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা উন্মাদ উন্মাদ ভাব ছিল। যত দিন গেল, অপরেশবাবুর শুধু এক প্রশ্ন। হলদে কি? যেই আসে, যার সঙ্গেই দেখা হয়, আর কোনো কথা নেই—হলদে কি? মাঝে মাঝে মাঝরাতে মৃত পুত্রের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন—

বলতে পারিস, সাদা ধবধবে, লাল টকটকে, কালো কুচকুচে, হলদে কী? মধ্যরাতে প্রৌঢ়ের সেই চিৎকার প্রতিবেশীদের কানে আসে—হলদে কী? বলতে পারিস না হলদে কী হলদে কী অপদার্থ।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে উটমুখো হয়ে আকাশ দেখছিলুম। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে ফিরে গিয়ে ছাতা নিয়ে আসবো। তা না হলে সোজা এগিয়ে যাবো। সামনের বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নরেনবাবু। প্রবীণ মানুষ। হাতে রং চটা ছাতা। এই বয়েসেও সদাসর্বদা ব্যস্ত। সারা জীবনই পয়সা পয়সা করেছেন। পয়সা করেছেনও। নরেনবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কি দেখছো ছেলে সেলট্যাক্স, বাপ আয়রন এণ্ড স্টিল। আড়াইতলা হবে না কেন? লেফট হ্যাণ্ডের ইনকাম থাকলে আমাদেরও হত'।

প্রথমে বুঝতে পারিনি।

বোকার মত তাকিয়ে রইলুম। নরেনবাবু ছাতা খুলতে খুলতে বললেন, ওই নতুন বাড়িটা দেখছো তো? পাশেই একটা নতুন বাড়ি উঠছে। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নরেনবাবু ভেবেছেন আমি হাঁ করে বাড়িটা দেখছি। খুব গোপন কোনো কথা বলার জন্যে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন, দিয়েছি একটা ছেড়ে। ওয়ান লেটার-এ ও কাজ বন্ধ। আমার চোখের সামনে তো আর বেআইনী হতে দিতে পারি না। মনে আছে নিশ্চয়ই, আমার যৌবনে, তোমরা অবশ্য তখন ছোটো, কত ভাল ভাল কাজ করেছি, চাঁদা তুলে ভাঙা গঙ্গার ঘাট মেরামত করিয়ে দিয়েছি। নিবারণের টি বি হয়েছিল কাঁচড়াপাড়ায় পাঠিয়েছি। ফটিকের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শব্দ হত বলে পাড়া থেকে দূর করে দিয়েছিলুম। আমার বাড়িতে প্রথম টেলিফোন এনেছিলুম পাড়ার লোকের সুবিধে হবে বলে। পয়সা ফেল ফোন কর। সেই আমি বুড়ো হয়েছি কিন্তু এখনো তো মরিনি হে। তোমরা সব ক্যালাস। নিজেরটাও বোঝো না, পরেরটাও বোঝো না।

নরেনবাবু চলে যাবার ভান করে পা বাড়ালেন। গেলেন না, ফিরে এলেন আবার। এগিয়ে এস, এগিয়ে এস একটু।

একটু এগিয়ে গিয়ে বাড়িটার সামনে দাঁড়ালুম। এই দেখ,

এনক্রোচমেণ্ট। সামনের ভিতটা তুলেছে দেখেছো। একেবারে নর্দমা ঘেঁসে। মিউনিসিপ্যাল প্রপার্টি ইঞ্চিখানেক এনক্রোচ করে।

আমি বললুম, ওঃ. আপনার চোখ বটে, ঠিক লক্ষ্য করেছেন তো।

নরেনবাবু খুব গর্বিত হয়ে বললেন, হুঁ হুঁ আমার চোখ, বুঝেছো খোকা

মনে মনে বললুম শকুনের কাকাবাবু।

নরেনবাবু তখন বলে চলেছেন, দিলুম মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা চিঠি ছেড়ে। নে এখন সামলা।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এতে আপনার কি অসুবিধে হচ্ছিল।

তিনি বললেন, আমার অসুবিধে! আমার আবার কি অসুবিধে! এই নাও। তোমাদের ন্যাশান্যালিজম গ্রো করে নি হে। দিস ইজ পাবলিক প্রপার্টি। ইচ এণ্ড এভরি বডি শুড গার্ড ইট।

বলতে ইচ্ছে করছিল, আপনি নিজে যে দাদা তিন ফুটের মত কালভার্ট করে আপনার বাড়ির সামনের নর্দমা এনক্রোচ তো করেইছেন, প্লাস দুদিকে দুটো বসবার রক।

নরেনবাবু চলে যেতে যেতে বললেন, এইবার ইনকাম ট্যাক্সে একটা উড়ো চিঠি ঝেড়ে দেবো। এই বাজারে এত টাকা আসে কোথা থেকে?

নরেনবাবু আমাকেও রেহাই দেন নি। আমার বাড়ির একটা অবাধ্য গাছের ডাল রাস্তার দিকে ফুটখানেক ঠেলে গিয়েছিল। তাতে নরেনবাবু কেন, কারুর কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু নরেনবাবু আমাকে না জানিয়েই গোটা ছয়েক চিঠি ছেড়েছিলেন। একটি মিউনিসিপ্যালিটিতে অন্যটি ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে।

এই নরেনবাবুরা আমাদের একঘেয়ে বিস্বাদ জীবনে সর্ষের মত। আমাদের জীবন গোলাপের কাঁটা। বিবর্ণ একটি ছাতি বগলে ভাল মানুষের মত মুখ করে ঘুরে বেড়ান। এখানে ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে শিশুসুলভ উদাসীনতায় বিশ্বসংসারের কাণ্ডকারখানা দেখেন। যতটা উদাসীন বলে মনে হয় ততটা কিন্তু উদাসীন নন। ধার্মিক বকের মত। এই দুপুরে গজেনের বৌ বড় বড়

…লওলা ওই ছেলেটার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন! ছেলেটা …? সকালে বাজারে গজেনের সঙ্গে দেখা। ওহে গজেন আছো কেমন? গজেনের খুশি খুশি মুখ। আহা জ্যাঠামশাই কি সোস্যাল। জ্যাঠামশাই ভাবছেন, দাঁড়াও, তোমার হাসিমুখ আমি ফিউজ করে দিচ্ছি এখুনি। তা গজেন, তোমার কল্যাণে পাড়ায় তাহলে একটা নববৃন্দাবন হল কি বল। তোমার বৌটি বেশ লিবারেল হে। বেশ ফ্রি। পাড়ার যত উঠতি মস্তান তার কথায় একেবারে ওঠ বোস করছে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে হে।

ব্যাস, ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে সন্দেহ বৃক্ষের বীজটি বুনে দিলেন। নাও এবার ম্যাও সামলাও। গজেনের সংসারে নোনা ধরিয়ে দিলুম একটু ওথেলো করে ছেড়ে দিলুম হে। তোমার ডেসডিমোনাকে রাখলে রাখো, মারলে মারো। বিভিন্ন বয়েসের নরেনবাবু পাওয়া যায়। আসলে ছোটো শ্যামলারাই বড় হতে থাকেন। যত বাড়তে থাকেন স্বভাবটিও তত তীক্ষ্ম হতে থাকে। পুংলিঙ্গ নরেনবাবুর মত স্ত্রীলিঙ্গ নরেনও আছেন। এঁরা আমাদের প্রতিবেশী, সহকর্মী সহযাত্রী পরিবারের সভ্য।

সহকর্মী নরেনরা অনেকটা ব্রুটাসের মত। কখন যে চাকু চালিয়ে দেবেন বলা শক্ত। আচরণে ইন্দুর মত। মনে হবে কত বড় হিতৈষী, অতি অন্তরঙ্গ। হাঁড়ির খবরটি পর্যন্ত জেনে নেবেন। তারপরই ঝোপ বুঝে কোপ মারবেন। অফিসে বিকাশের কাছে …ই আসে, বিকাশ তাদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে, নরেনও তাদের মধ্যে একজন। নরেন বলবেন, বিকাশ এত পয়সা পায় কোথায় শুনবে কোথায় পায়, ঘুষ ঘুষের পয়সায় কাপ কাপ চা …চ্ছে। আরে সেদিন অমুকের বাড়িতে গিয়েছিলুম বুঝেছো! …বৌয়ের আটপৌরে শাড়ি দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ফার্ণিচার বুঝেছো ঝকঝক করছে, সোফাসেট, খাট, ডাইনিং টেবিল, কি নেই। সব চুরির পয়সা।

নরেনদের সেই কারণে বাড়িতে আনার আগে ভেবেচিন্তে আনা উচিত। নরেনরা প্রেস রিপোর্টারের মত স্কুপ নিউজের সন্ধানে, …তরে দপ্তরে, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। কার প্রমোশন …চ্ছে, অফিসে কোন সহকর্মী মহিলার স্বামী দীর্ঘদিন প্রবাসী …থচ ভদ্রমহিলা কেমন করে সন্তান-সম্ভবা হলেন! নরেনবাবুরা

গবেষক। সমাজ আর জীবন নিয়ে এঁদের গবেষণার ফলাফল অতি মারাত্মক। এঁরা প্রমাণ করেই ছাড়বেন শেকস্‌পিয়ার আসলে মার্লো।

এঁরা যখন বলেন, আহা অমুকটা হঠাৎ মারা গেল, সংসারটা ভেসে গেল হে। তখন মনে হতে পারে এঁদের বুঝি দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। আসলে তা নয়। মনে মনে এঁরা একধরনের আনন্দ পায়। ডেকে জিজ্ঞেস করেন, ওহে পাশ করেছো নাকি? উত্তর হ্যাঁ হলে চুপসে যান। না হলে মুখে চুকচুক করেন বটে তারপর জনে জনে ডেকে বলেন. শুনছো শুনছো অত কষ্ট করে অমুক ছেলেটাকে পড়াল, সব জলে গেল। কেউ লিভারের অসুখে ভুগলে ভাবেন নিশ্চয়ই মদ্যপান করে হয়েছে। টি বি হয়েছে শুনলে বলেন হবেনা? বেটা চরিত্রহীন, লম্পট। কারুর মৃগী হয়েছে শুনলে মন্তব্য করেন, হবেইতো, সময়ে বিয়ে দেয়নি। অমুকের ছেলের বৌ মাকে খেতে দেয় না, তমুক বাপকে দেখেনা, আরে ও আর কত রোজগার করে, ধার করে কাপ্তেন, বিশু খুব উঠছে হে, শৈলেন তোমার মেয়েকে যেন দেখলুম হে সেদিন ময়দানে একটা ছেলের সঙ্গে খুব ঢলাঢলি করছে। অপরের সমালোচনায় নরেনবাবুর মহা উৎসাহ, এদিকে নিজের অবস্থা চালুনির মত।

নরেনবাবুরা একদিন প্রকৃতির নিয়মে মারা যান। তখন কাঁধ দেবার লোক মেলেনা। এঁদের বেঁচে থাকাটা যেমন আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি মৃত্যুতে তেমনি হাল্কা বোধ করি। জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে তাকে দশ টাকার ফুল দিতে রাজি আছে ট্রাবল্ড সোল, তুমি মোরে বাঁচিয়েছো।

সব সংসারেই এখন বাবাদের মহা সমস্যা। বিশেষত যাঁরা ষাটের দশকে বাবা হয়েছেন। এইসব বাবাদের অধিকাংশেরই গোঁফ নেই। থাকলেও খুব বাহারী। মানে কালটিভেটেড বা চাষ করা, কেয়ার-ফুলি ট্রিমড, অনেকটা বড় লোকের বাড়ির লনের খাটো করে ছাঁটা হেজের মত। এ গোঁফ গুম্ফের পর্যায়ে পড়ে না। চেহারায় স্লিম। পরনে ট্রাউজার। কোমরে চওড়া বেল্ট। ঢ্যাপোস বকলস। গায়ে ছাপকা জামা। পাতলা চুল, তৈল হীন। সেলুন বিলাসী। চলচ্চিত্র রসিক। সৌখিন ভোজী। তিরিশের দশকের বাবারা এঁদের বাবা হবার যোগ্যতা স্বীকার করেন না। তিরিশের বাবাদের গোঁফ দেখলেই মালুম হত বেড়াল কি রকম শিকারী। বেশ প্রমাণ সাইজের ভুঁড়ি থাকতো। মাথায় হয় টাক না হয় খেজুর-কাট চুল। গোঁফের ওপর সরষের তেলের ছিটের মত র-নস্যির দরানি। ধুতি, শার্ট কিম্বা পাঞ্জাবিতেই পারসোন্যালিটি কমপ্লিট। সংসারে তাঁরা ছিলেন কত্তা—ছোট কত্তা, বড় কত্তা। ছেলেদের নাম রাখতেন—প্যালা, ফ্যালা, ন্যালা, ক্যাবলা। ডাক দিয়েই মাত করে দিতেন। শাসনের সময় ফ্যালা, আদরের সময় ফেলু। পোশাকী নাম অবশ্যই থাকতো যেমন, পতিতপাবন, গদাধর, হরিপদ, কেষ্টপদ, হরিচরণ, ভূতনাথ।

ষাটের দশকের বাবারা ছেলেদের নাম রেখেছেন অভিধান কনসাল্ট করে। বিশ্বরূপ, অর্কপ্রভ, ধ্রুবজ্যোতি। ইংরেজীতে লিখতে ছেলে তিনবার টাল খায়। ষাটের বাবাদের সমস্যা হল ছেলে মানুষ করা। যেটা তিরিশের বাবাদের ছিল না। তাঁরা মানুষ করতেন পশু-পালনের কায়দায়। তাঁদেরটা ছিল কৃষি আর এঁদেরটা হল হর্টিকালচার। ঘরে ঘরে এঁদের গোলাপের বাগান—ভাল সার, ভাল পরিচর্যা। পটিং ম্যামিওরিং, মালচিং ট্রিমিং। তিরিশের বাবাদের ছিল ধর তকতা মার পেরেক। হাওড়া কি মঙ্গলার হাটের ইজের হাফ শার্ট। গোলমাল করলেই রদ্দা না হয় অর্ধচন্দ্র। অত সোজা নয়। শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে, জানতে

হবে, পড়তে হবে। দেয়ালে পুষ্টি তালিকা—কলা, মুলো, গাজর, ডিম্ব। ট্যাকে করে স্কুল। আউটিং অ্যামুজমেণ্ট। পিতা পুত্র সংসারে দুই ইয়ার। একটি নমুনা ডায়ালগ—ছেলেঃ খুব তো বাতেলা মারো, দেখি একটা ক্রিকেটের টিকিট ম্যানেজ করো তো। বাবাঃ ক্রিকেটের তুই বুজিস কি। ছেলেঃ চল্, তোমার চেয়ে ভাল বুঝি, স্লিপ, গালি, একস্ট্রা কভার। বাপ ছেলে কাঁধ ধরাধরি করে চলল টি ভি দেখতে।

তিরিশের এ সব ল্যাঠা ছিল না। বিকেলে ঘণ্টাকতক গাদি, কপাটি কি ফুটবল। ছেলেরা মায়ের আঁচল ধরে গোবৎসের মত মানুষ হত। মাঝে মাঝে মার আদেশে বাবাকে বাইরের ঘরের আড্ডা থেকে ভয়ে ভয়ে এইভাবে ডাকতঃ বাবা, আপনাকে ভেতরে একবার ডাকছে। তিরিশের বাবার সংসারের উপর পেপার ওয়েটের মত চেপে বসে থাকতেন। ষাটের বাবাদের কোনো ওয়েটই নেই সব ফুর ফুরে কৃষ্ণকান্ত।

তিরিশের বাবারা বেঁচে থাকলে এখন দাদু। তাঁরা খুব সমীহ হয়ে, নাতিকে ডাকার প্রয়োজন হলে ডাকেন—বিশ্বরূপবাবু। প্রভু বলতে ইচ্ছে করে, চেপে যান। তিরিশের দাদুরা নাতিকে ডাকতেন—এই শালা এদিকে শোন। এখন শালা বললে দাদুকে কান ধরে পার্কের বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে আসা হবে, আনসিভি-লাইজড বলে। বুড়ো বয়সে ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে। কি দরকার বাবা, পড়ে আছি গোলাপবাগের এক পাশে। দেখি না ষাটের বাবাদের সিভিলাইজড কেরামতি।

সব জানা চাই

কিছু উদাসীন মানুষ যেমন আছেন, কিছু অতি আগ্রহী মানুষও আছেন। এঁরা হলেন 'কী হলো দাদার দল'। চারিদিকে যা কিছু ঘটছে এঁদের নাক বাড়িয়ে জানা চাই। 'কী হলো, কী হলো' করে এঁদের ভেতরটা সব সময় লাফাচ্ছে। কিছুতেই সুস্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না। এদিকে তাকাচ্ছেন, ওদিকে তাকাচ্ছেন। রাস্তায় ছোটোখাটো কোনো জটলা দেখলেই একটা কাঁধ উঁচু করে, ডিঙি মেরে মেরে, ঘাড়টাকে পারলে সারসের মত লম্বা করে দেখে নিতে চান কিসের জটলা, কাকে ঘিরে জটলা. না পারলে প্রশ্নে প্রশ্নে উত্যক্ত করে তোলা' 'কী হলো দাদা, কি হলো দাদা ?'

আমি নিজেও একটি 'কী হলো দাদা। বহুবার অপ্রস্তুত হয়েছি, অপমানিত হয়েছি, তবু স্বভাব না যায় মলে। অল্প বয়সেই সংশোধন করে নেবার মত কান মলা একাধিকবার খেয়েছি তবু শিক্ষা হয়নি। বাসে বেশ মাখোমাখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই আছেন। কিছুক্ষণের এই যন্ত্রণা সকলেই চোখ বুজিয়ে পার করে দিতে চাইছেন। আমার চোখ কিন্তু খোলা। দাঁড়িয়ে থাকলে চলমান রাস্তার যতটুকু দেখা যায় ততটুকু এক ফালি রিবনের মত উল্টোদিকে হুহু করে ছুটে চলেছে। পা দেখছি, ভাঙা ফুটপাত দেখছি, নর্দমা দেখছি, দোকানের সিঁড়ির ধাপ দেখছি, গরুর নিচের আধখানা দেখছি। হঠাৎ দেখলাম তিন চার জোড়া পা দ্রুত ছুটছে, একটা অন্য ধরনের হল্লা। সঙ্গে সঙ্গে 'কী হলো দাদা' আমার পেছন দিকটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত উঁচু হয়ে আমার পেছনে দাঁড়ানো লোকটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিল, আমার উর্ধ্ব অংশ সামনে ভেঙে সিটে বসা দুটি প্রাণীর মাথার ওপর একটা চাঁদোয়া তৈরি করে আমার কৌতূহলী মুখটাকে জানলার ফাঁকে পরিপূর্ণ চন্দ্রের মত শোভনীয় করে ধরে রাখল সামনে দোমড়ানো আমার এমন একটি শরীর বাসের দোলায় চিড়িয়াখানায় একহাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকা শিমপাঞ্জির মত ডাইনে বামে দুলতে

লাগল। আমার বুকের ঘষায় বসে থাকা চরিত্র দুটির মাথার চুল এলোমেলো হতে লাগল। আমার কোমরের সংঘর্ষে পেছনে দাঁড়ানো মানুষেরা অনবরত সামনের দিকে উথলে উঠতে থাকলেন। 'কী হলো দাদা?' 'দৌড়োচ্ছে কেন?'

শিক্ষিত মানুষরা সাধারণত মেয়েলি প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা অসম্মানজনক বলে মনে করে থাকেন। তিন জোড়া পা হঠাৎ কেন দৌড়োচ্ছে আমাকেই তা দেখে জেনে নিতে হবে। এই অবস্থায় আমাকেই অনেকের প্রশ্ন—'কী হলো দাদা?'

মশারির চালের মত আমার ঝুলে পড়ার কারণটা কি? যাঁদের মাথার ওপর 'কী হলো' বলে ঝুলে পড়েছিলুম তাঁরা দু হাত দিয়ে ঠেলেঠুলে সোজা করার চেষ্টা করলেন। আমি সোজা হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করে সহযাত্রীদের কী হয়েছে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করে বললুম 'কিছু হয়নি। ট্রাম ধরার জন্যে দৌড়োচ্ছে।'

শিক্ষিত মানুষ আবার অন্যের কথা বিশ্বাস করেন না। কারুর মুখেই কোনো ভাবান্তর হল না। তবু কী হল যেমন জানা দরকার কী হয়েছে, তেমনি জানানও দরকার।

সাত সকালেই পাশের বাড়িতে ধুম ঝগড়া বেঁধেছে। পুরুষ কণ্ঠ ও নারী কন্ঠের কোরাস উচ্চ গ্রামে। আমার মাথা ঘামাবার মত কোনো ব্যাপারই নয়। স্বচ্ছন্দে চা খেয়ে বাজার চলে যেতে পারি। কিন্তু আমি হলুম গিয়ে 'কী হলো' দাদা। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতেই হচ্ছে—'হলোটা কী'? পাঁচিলের এপাশ থেকে প্রতিবেশীর উঠোনের দিকে আমার মুণ্ডুটাকে জ্যাক দিয়ে ধড় থেকে তুলে ধরলুম। বাঃ বেশ সুন্দর দৃশ্য। বড় ভাই পরান্ন ভোজী, ছোটো ভাইকে জুতো দিয়ে একটু দলাই-মলাই করে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করছেন। ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মধ্যস্থতার জন্যে বড় ভাই সম্পর্কে একগাদা অভিযোগ আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। অভিযোগের ভাষা খুব শালীন নয়। আমি যেন পাঁচিলের এ-পাশে জজ সাহেব। সকালে গার্ডনিং করছিলুম। মামলাটা আমার হাতে এসে গেল।

পারিবারিক কেচ্ছার ম্যানহোল খুলে গেছে। বড়র হাতের জুতো শূন্যেই তোলা রইল। সাময়িক বিরতি। ছোটো ভাই

সম্পর্কে তাঁরও নানা অভিযোগ। বড় যদি স্বার্থপর শয়তান হন, ছোটো চোর এবং লম্পট। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুন্ডু গুটিয়ে এল। কী হল দাদারা কখনো সমস্যার গভীরে যেতে চান না বা সমাধান এগিয়ে দেন না। সালিশীর দায়িত্ব তাঁদের নয়। কী হল? মোটামুটি জানা হয়ে গেলেই তাঁরা উদাসীন মুখে সরে পড়েন, যেন কিছুই হয়নি। পরের ঘটনা লোক-মুখে জেনে নেন—তারপর কী হল? তারপর কী হবে?

'কী হল' দাদাদের পেছনেও 'কী হল দাদারা' থাকে। রাস্তার দিকের ঘর। ছেলেকে পড়াতে বসেছি। আজকালকার ছেলেদের পড়াতে বসানো মানেই লো প্রেসারকে হাই করানো। তারপরই স্কেল দিয়ে পেটানো। পেটাপেটির একটা পর্যায়ে ছেলের গর্ভ-ধারিণীর আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কালে মাসিরা আস্কারা দিয়ে ছেলেদের বারোটা বাজাতেন। এখনকার কালে মায়েরা। 'স্পেয়ার দি রড স্পয়েল দি চাইল্ড'—আজকের কথা না কি? চির-কালের সত্য। ছেলের মার সঙ্গে হাতাহাতি। তিনি স্কেলটি কেড়ে নিতে চান! আহা বাছা আমার, গোমুখ্য হয়ে চিরকাল বাপের হোটেলে থাক। বাপ যখন, বাপবাপ করে ভরণপোষণ করতে বাধ্য। ছেলে পড়ে রইল মাঝ মাঠে ফুটবলের মত। গোলের কাছে স্বামী-স্ত্রীতে স্কেল নিয়ে ড্রিবলিং। একটু চেঁচামেচি—খবরদার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকের জানলায় একটি মুখ—'কী হল দাদা?'

এই 'কী হল দাদাদের' জন্যে কোনো কিছুই চেপে রাখার, লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। সব সময় আমরা পাদপ্রদীপের সামনে। সবাই জেনে গেছেন, যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতসকালে স্কেল-যুদ্ধ হয় সেই স্ত্রীর সন্ধ্যেবেলা মুখে আদর করে রসগোল্লা।

নৃত্যের তালে তালে

মধ্যবিত্ত বাঙালীর মত এত ভাল নাচতে আর নাচাতে কেউ পারে না। ওয়ার্লডস গ্রেটেস্ট ড্যানসিং রেস। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় বিরল একটি প্রাণীর সঙ্গে তুলনা চলে—পনিটেল্ড নয়। স্বভাবে কাছাকোচা খোলা। মনে করে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাত। আসলে নিরেট। সব কিছুতেই বিশ্বাস। পরমুহূর্তেই অবিশ্বাস টোটকাও বিশ্বাস করে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ভক্তি। ভূতও মানে, ভগবানও মানে, আবার কিছুই মানে না। পরজন্মেও বিশ্বাস করে অথচ ইহজন্মটা নয়-ছয় তছনছ করতে ভয় পায় না। তারপর নৃত্য। বাঙালীর মধ্যবিত্ত নাচুনে নয়। যেই বললেন, ভালা নাচতো দেখি, অমনি নেচে উঠল।

ঘিয়ের নাচ

ন-টাকায় খাটি গব্য ঘৃত। বোতলের জন্যে এক টাকা একস্ট্রা। ঘি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। মেধাবী হয়, দিব্যকান্তি তনু হয়। অকালে চুলে পাক ধরে না। নোয়াপাতি একটি ভুঁড়ি হয়। ফলে সরকারী ঘি-নৃত্য। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সুরভীতে ঘন ঘন ফোন, হ্যালো দাদা, এসেছে? কবে তিনি আসবেন? এসে গেছেন! উয়ু ঘি এসেছে, ঘি এসেছে। রইল ফাইল, রইল কাজ। চার-পাশের অফিস থেকে ঘি অভিযাত্রীরা ছুটলেন ঘিয়ের লাইনে। আজকাল আবার হরিণঘাটা থেকে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা বাল্ক ঘি কিনে বোতলে ভরে বিক্রি করেন। দাম একটু বেশি। তবু মন্দের ভাল। পাড়ায় পাড়ায় সরকারী গব্য। দোকানের রোলিং শাটারের বাইরে বেলা দেড়টা থেকে বোতলের লাইন। বোতলের মালিকরা উল্টো দিকের গাড়ি বারান্দার তলায় রোদ কিম্বা বৃষ্টি থেকে গা বাঁচিয়ে তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে। ঘি দান শুরু হবে বেলা পাঁচটা থেকে। লাইনে শিশু আছে, প্রবীণরা আছেন, আছেন অবসরভোগী বৃদ্ধরা। বসে সংসারের অন্ন ধ্বংস করলে চলবে না। যাও লাইন দাও, ঘি আন—। ছেলে খাবে, নাতি, পুত্রবধূ খাবে। তুমি কিন্তু খাবে না। কোলেস্টোরাল বাড়বে। থ্রম্বোসিস হবে। আপনাকে এত সহজে হারাতে চাই না। তাহলে কার এত সময় আছে, ঘিয়ের লাইন দেবে, না নাতিনাতনীকে স্কুলে দিয়ে-নিয়ে আসবে। বাজার করে দেবে। বাড়ি পাহারা দেবে!

দুধ নিয়ে

পাশের বাড়ির নমিতা এ বাড়ির শমিতাকে দোতলার বারান্দা থেকে হেঁকে জানালেন, দিদি দুধ কেটেছে। অনেকটা সকাল, সাতটা পঁচিশের নিউজের মত। এ বাড়ির শর্মিতা সব কাজ ফেলে দুধ চাপালেন এবং ফট্। দুধ কেটে গেল। ছানা আর জল কেয়ারফুলি বোতলে ভরা হল। দু বাড়ির কর্তা ছানা আর ছানার জল নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন দুগ্ধ শিবিরের উদ্দেশ্যে একজনের এক গালে দাড়ি কামানো ফেলেই দৌড়োতে হয়েছে। বন্ধ হবার আগেই বামাল সমেত হাজির হতে হবে। সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে দুধ কাটার কথা রেকর্ড না করালে নো-রিফাণ্ড। রোজ সকালেই দুধের নাচ। দুধ আনায় কেরামতি কত? বোতল বসাবার তারের গোলগোল খোপ। ক্লিং ক্লিং শব্দ করতে করতে বোতল আসছে। ফোটা ফোটা দুধ ঝরছে স্নেহের মত। শিশু খাবে, বৃদ্ধ খাবেন, রোগী খাবেন, ভোগী খাবেন, কাবাইডে পাকান আমের রস দিয়ে। দুধ আমাদের মর্নিং ওয়াকে অভ্যস্ত করিয়েছে।

রিবেটের খদ্দর

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে, পুজোয়, দেওয়ালীতে খদ্দরের নাচ। রিবেটে কিনতে হবে পাজামা, বেনিয়ানা, পাঞ্জাবি, বুশ-শার্ট, রেশমের শাড়ি এণ্ড হোয়াট নট। ভোর হতে না হতেই হোল ফ্যামিলি বেরিয়ে পড়লেন রিবেটের খদ্দর কিনতে! যত বেলা বাড়বে, যত রোদ চড়বে, তত ভিড় বাড়বে। খদ্দরের দোকানে যেন শকুনি পড়েছে। মারামারি, ঠ্যালাঠেলি। ভিড়ে সাফো-কেসান। মণিবাবু সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর স্ত্রী হাতের কাছে কিছু না পেয়ে কাউণ্টার থেকে এপিয়ারী হনির শিশি খুলে দু ফোটা ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেন। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি ধরে দুই ভদ্রলোকে টানাটানি। কীচক বধের মত মাঝখান থেকে ফেঁড়ে গেল। বিমানবাবুর পকেট মার। মাধবীর হাত ধরে কে টেনে নিয়ে গেছে। নন্দিতার হার ছিঁড়ে নিয়েছে। সেলসম্যানের গায়ের জামাটাই খুলে নিয়েছিল বলে তিনি কাউণ্টারের ওপাশ

থেকে ঘুসি চালিয়ে একজনকে ফ্ল্যাট করে নিজে চলে গেছেন। সেই শোকে দোকান সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। দোকান খোলো, রিবেট দাও। বছরে তিনবার এই রিবেট নৃত্য। এর সঙ্গে আছে তাঁতের রিবেট আর সেল। পচা ধসা লাটামাটা যা আছে নেচে নেচে হাঁউ-মাঁউ করে নিয়ে যাও। সেলের জুতো পায়ে ফিট করছে না, তাতে কি হয়েছে! এ সুযোগ যদি না আসে আর, এক সাইজ ছোটো কিম্বা বড় নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।

গ্রেটেষ্ট শো অন আর্থ

গো-ও-ওল বলেই বিষ্ণুবাবুর ছেলে গ্যালারির কাঠ গলে পড়ে গেল। মুণ্ডুটা ধাপ বেয়ে বলের মত গড়াতে গড়াতে নিচে চলে গেল, ধড়টা পড়ে রইল গ্যালারির খাঁজে। শহীদ হয়ে গেল, খেলাপাগল খোকা। দু রাত আগে লাইন দিয়েছিল শংকর। তলপেটে ভোজালি চালিয়ে তার জায়গাটা আর একজন দখল করে নিয়েছে। ইলেকট্রিক তারে প্রিয় দলের পতাকা ঝোলাতে গিয়ে সংসারের বড় ছেলে হাফ মাস্ট হয়ে গেছে। খেলা ভেঙেছে সেই সঙ্গে গ্যালারি ভেঙেছে, দোকান ভেঙেছে, গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে, ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙেছে, মানুষের মাথা ভেঙেছে, ট্রামের ডাণ্ডা ভেঙেছে, বাসের চাল ভেঙেছে। সিপাহী বিদ্রোহের দৃশ্য। ঘোড়সওয়ার, দু দল সৈনিক, ইট, সোডার বোতল, কাঁদুনে গ্যাস। ডবল ডেকারের দোতলার জানলা গলে তরুণ ক্রীড়ামোদী জনৈকা তরুণীর পাশে ল্যাণ্ড করেছেন। ট্রামের ছাদে এরা কারা! খেলা ভাঙার ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে, বাস পালাচ্ছে, পালাচ্ছে অখেলোয়াড়ের দল।

নাচো, নাচো, নেচে যাও। নাচতে নাচতে সময়ের শিকারীর হাতের গুলি খেয়ে আফ্রিকার নুর মত ক্রমশ বিরল হতে হতে ইতিহাস হয়ে যাও।

শুধু সংসারের জন্য

'বল, জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।' মায়ের জায়গায় সংসার শব্দটি বসিয়ে নিয়েছি। জন্ম হইতেই সংসারের জন্যে বলি প্রদত্ত। প্রশস্ত উঠানে সিঁদুর মাখানো একটি হাঁড়িকাঠ, তার চারপাশে দিবারাত্র ঘুরছি আর গুণ-গুণ করে গাইছি, মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত। বহুরূপে সম্মুখে তোমার সুখের সংসার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ মুক্তি। তুমি যে সেই সংসারের এক ছিনাথ বহুরূপী। কখন পর্যটক, কখন যোদ্ধা, কখন শাসক, কখন শোষিত, কখন প্রেমিক, কখন ছাগল, কখন পাগল, কখন ধোপা, কখন গাধা, কখন মেকানিক, কখন গৃহ ভৃত্য, কখন শিক্ষক, কখন ছাত্র। আমি কে মাগো! আমার কেটা যে হারিয়ে গেছে। সবাই খাবলা-খাবলি করে নিয়ে সটকেছে।

আলোচাল না সিদ্ধচাল

সারা সপ্তাহে বাড়ি আর রেশনের দোকান বারেবারে আসা-যাওয়া। সরল রেখায় চললে কাবুল কিম্বা কান্দাহারে পেঁছে মেওয়া মারতে পারতুম। দোকানের মালিকের ভুঁড়িতে সুড়-সুড়ি দিয়ে, এক মুখ হেসে বিগলিত প্রশ্ন, পঞ্চুদা, সেদ্ধ কি আসচে ভাই। (ভাইটা যেন জেলির মত সোনালী থকথকে। নিজের ভাইকে জীবনে এভাবে সম্বোধন করা হল না)। বিকেলটা দেখুন। বিকেল গড়িয়ে সকাল, সকাল গড়িয়ে বিকেল। স্নায়ুর ওপর সে কি চাপ। সেদ্ধ যেন বেরিয়ে না যায় ভগবান! তোমাকে হারাই, তোমাকে না পাই ক্ষতি নেই। জানি পরপারে তুমি আমার জন্যে কোল পেতে রেখেছো। কিন্তু এক ফাঁকে সেদ্ধ এসে আমাকে না পেয়ে যেন চলে না যায়। আমার বৌ যে বলেছে, বিধবা না হওয়াতক আলো ছোবে না। সেদ্ধ চালের ভাতে চুনো মাছের সরষে ঝাল, আহা তার বদনভরা হাসি। বৌয়ের মুখের হাসি ওরে পঞ্চু, পঞ্চা আমার, দেখতে বড় ভালবাসি। পাশের বাড়ির আশু সেদ্ধ পাবে আর আমি পাব মুখঝামটা তা যেন কোরো না প্রভু।

কে বলেছে সেন্ধ আসে না? আসে আসে, তুমি এক অপদার্থ, জানতে পার না। তাইতো আমি পঞ্চুবাবুর পদপ্রান্তে। পিতাঠাকুর বলেন, আলো একটু ঘি চায়, তা না হলেই আমাশা। তাইতো আমি সব কাজ ফেলে সন্ধ্যেবেলা পঞ্চুবাবুর সঙ্গে দাবা খেলি। আর ইচ্ছে করে হেরে যাই। পঞ্চু শেষ চালটি ঝাড়েন নাও সামলাও মাৎ। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রশ্ন, কাল আসবে দাদা? কি আসবে? সেন্ধ! আসবে কি এসেই তো আছে। কাল একেবারে খোলার সঙ্গে সঙ্গে চলে এস। একেই বলে খেলতে খেলতে খোলা। এক গেলাসের দোস্ত না হলে কিছু মেলে না রাজা! একটু নিচু হও, নিচু হয়ে পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে নাও। মাথা উঁচু করে চললে একটা জিনিসই মেলে ঠোকর।

গম থেকে আটা

পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা। ওরা আটা ভাঙিয়ে আনে কেমন মিহি। আহা যেন ময়দা। মাঝে মাঝে সুজি করেও আনে। ডালিয়া! ওরে নন্দেবাসী বলে দেরে আমি কোথা পাব সেই কল, যে-কলে গম হয় ময়দা, গম হয় সুজি কিম্বা ডালিয়া। চলে যাও মাইল খানেক দূরে, সেথায় পাবে বিঠলদাসের নয়া কল। কম ভুষি বেশি আটা। সেই স্থলে গম চালিয়া ভার্টিকাল চাকিতে ভাঙাই করা হয়। কাঁধে তোমার ব্যাগটি ফেল, ভোলো অহংকার, নাকের সোজা হাঁটা দাও। মধ্যবিত্তের আবার অহংকার কি রে বেটাচ্ছেলে!

চিনি

রোজ সেই লোকটাকে দেখি। পাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, হেঁকে যায়, চালের খুদ আছে, চালের খুদ। তখন কি জানতুম ভাই আমারও দিন আসচে যখন আমাকেও ওইভাবে ঘুরতে হবে— বাড়তি চিনি আছে, কার্ডের ছেড়ে-দেওয়া চিনি। আমি তো একটাকে বধ করেছি, তুমি গোটাকতককে মার—গৃহিণীর উক্তি। বাড়িতে যে কাজ করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি কয়েকটা কার্ডের চিনি ম্যানেজ করেছেন। আমাকেও করতে হবে। ছাড়ে ছাড়ে অনেকেই চিনি ছাড়ে। তকে তকে থাকতে হয়।

পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়। লোকের আর্থিক সঙ্গতি চিনতে হয়। অফিসের পাঁচজনকে বলতে হয়। মুখ গোমড়া করে ঘরের মধ্যে টাইট হয়ে বসে থাকলে কিস্যু হয় না। নগরবাসীদের হেঁকে বল, ওহে পুরবাসী, তোমাদের ছেড়ে-দেওয়া চিনি আমার সংসারের সেবায় উৎসর্গ কর। ওই যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে নেড়ার মা, বাড়ি-বাড়ি কাজ করে, ও নিশ্চয়ই চিনি ছাড়ে। কানে কানে জিজ্ঞেস কর, মাসি চিনি ছাড়চো নাকি? আ আমার মুখপোড়া, চিনি ছাড়বো কেন রে ড্যাকরা। চিনি তো বেলাক করি রে। প্রায় তিন টাকা, কিলোতে দামের তফাত। ওভাবে হবে না ভাই। আমতলার বস্তিতে গিয়ে মোক্ষদা কি মেনকার সঙ্গে প্রেম করতে হবে। ওরে প্রেম বিলিয়ে কণ্ট্রোলের চিনি আন। আপনি বলেছিলেন, চিনি হোয়াইট পয়েজন। আমার সংসারে আপনার সেই বাণী শুনছে না, হে মহাত্মা গান্ধী! বারে বারে চা খাচ্ছে, খাবলা খাবলা চিনি। দই খাচ্ছে, চাটনি খাচ্ছে, গন্ধরাজ লেবু দিয়ে সরবৎ খাচ্ছে। দুধে খাচ্ছে, বাচ্ছারা চুরি করে সাবাড় করে দিচ্ছে। চিনি তো চুরি করেই খাবার জিনিস। কে না জানে শৈশবে সব মানবই ছিঁচকে চোর। এরাই পরে সাধু হয়, না হয় পাকা চোর। হে মা চিনি, তুমি যে আদ্যামূলে মাগো! গত মাসে চিনিতে গুড়েতে এই পিঁপড়ের দল একশো চৌত্রিশ টাকা খেয়েছে। লাগে টাকা দেবে তুমি গৌরী সেন। আমরা সেনের ফ্যামিলি। এদিকে গৌরীবাবু নিজের ব্যয় সংকোচ করে খোলা বাজারে চিনি কিনছে। চিনি গো চিনি তোমায় আমি চিনি, তুমি আমার হাত খরচায় টান দিয়েছো। চিনির টোপ ফেলে পাড়ার এক উঠতি যুবক আমার স্ত্রীর ঠাকুরপো। বড় ঘনিষ্ঠ। বড় ব্যথা প্রভু পরাণে। কণ্ট্রোল দরে বাড়তি চিনি চাই, তা না হলে সংসার ভেঙে যায়। ঠাকুরপোর দল ক্রমশই বড় হচ্ছে।

জয় মঙ্গলবারের ফলার

যে এই ব্রত করে তার কোনও দুঃখ থাকে না। (আমার স্ত্রীর মত এবং পরিবারস্থ অন্যান্যদের মত দুঃখী ভূ-ভারতে কেউ নেই, অন্তত তাদের তাই ধারণা। অনবরতই গাওনা জীবন আমাদের বিফলে গেল। শাড়ির পর শাড়ি হল না, গাড়ী হল না, ফ্যাশান

হল না, ফাংশন হল না, ভাল বাংলা ছবি এল না, হিন্দি ছবি ফুরিয়ে গেল, রাঁধতে হল বাড়তে হল, কষ্ট করে নাইতে হল, আবার খেতেও হল, খেয়ে আঁচাতে হল, ছেলেকে পড়াতে হল, কত দুঃখ।) জলে ডোবে না (তা ঠিক এত দিনে হোল ফ্যামিলিরই রাস্তায় বর্ষার জলে ডুবে মরা উচিত ছিল।), আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, হারালে পায়, মরে গেলে বেঁচে ওঠে. (সকলেই তো মাসের মধ্যে বার কতক টাল খায়) সেই জয় মঙ্গলবারের ফলারের জোগাড় করতে আমার প্রাণান্ত। চিঁড়ে, মুড়কি, সুপুষ্ট কদলি, ল্যাংড়া আম, প্রচুর দধি, মিষ্টি, সাবু ভিজে, নারকল। প্রতি মঙ্গলবার ফিফটি রুপিজের ধাক্কা মাকুর মত আমি টাকু, বাজারের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো দৌড়োচ্ছি এই নারকেল, হোই আম, হোতা কলা। আঁসের বাজার। নিরামিষ বাজার, ফলারের বাজার। কোনটার সঙ্গে কোনটা যেন ঠেকে না যায়। হেই মা। মাত্র দুটো হাত, চতুর্ভুজা করে দাও মা মঙ্গলচণ্ডী। দু' হাতের রোজগার চারহাতে ডবল হবে। নারকেলের বড্ড দাম। আমের শরীরে টাকার জ্বর। মেমসাহেবরাও যে জয় মঙ্গলবার করতে লেগেছে।

ডাক্তার

সারাদিন ধরেই টিপটিপ বৃষ্টি। আজ ক'দিন ধরেই চলেছে। আকাশ যেন ঘষা কাঁচ। রুগীপত্তর একেবারেই নেই। মাসখানেক হ'ল বিনোদ ডাক্তারের এই অবস্থা চলেছে। এদিকটায় কলকারখানা বেশি। বেশির ভাগই পাটকল আর কাপড়ের কল। চারদিক ঘিঞ্জি। সব সময় গিজ-গিজ লোক। বিনোদ ডাক্তার কি দরের ডাক্তার কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন চক বাজারের লোক দেখল তেলে ভাজা আর দেশী মদের দোকানের পাশে ফালি ঘরটা ঝাড়-পোঁছ করে সাইন বোর্ড পড়ে গেছে কমলা মেডিকেল হল. ডাক্তার বিনোদভূষণ রায় এল, এম, এফ। একস অমুক তমুক। সন্ধ্যের দিকে চারিদিক লোকে লোকারণ্য, ট্রানজিস্টারে চড়াগান বাজছে। মদের দোকানের কাটা সুইং ডোর অনবরত খুলছে আর বুজছে। খুললেই দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার পর্দাঘেরা ঘরে একরাশ মাথা, উঁচু কাউণ্টারে রাশি রাশি বেঁটে বেঁটে মা কালী মার্কা বোতল। তেলে-ভাজার দোকানে গ্যাসের আলো। কড়াতে চিংড়ির চপ ফেনা ফেনা তেলে হাবুডুবু যাচ্ছে। মদের জিভে বড়িয়া চাট। ছাবকা ছাবকা জামা গায়ে চোঙা প্যাণ্ট পরা ছোকরারা ভিড় করেছে। দূরেই সিনেমা, দেয়ালে হিন্দি ছবির নায়িকা পেট আর বুক দেখাচ্ছে। মাদ্রাজী মেয়েরা নাভীর নিচে কাপড় পরে পিঠের দিকে আদহাত কালো কোমর বের করে কেনা কাটায় বেরিয়েছে। খোঁপায় সাদা ফুল। নাকের টিপের মতো ছোট্ট নাকছাবি মাঝে মাঝে আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। এরই মাঝে বিনোদ ডাক্তার চেম্বার পেতে ভারিক্কী চালে বসে। চোখে চওড়া কালো ডাঁটির চশমা। মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের রঙ পোড়া পোড়া। মুখে একটি দুটি বসন্তের দাগ দেখলেই মনে হয় জীবনে পোড় খাওয়া, সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ।

প্রথম প্রথম রুগী পত্তর বেশ ভালই ছিল। কলে কারখানায় কাজ করা অশিক্ষিত মানুষ! চিকিৎসার কোন ঝামেলা ছিল না।

তিনটে অসুখই ঘুরে ফিরে আসতো। যৌন রোগ, ফুটো ফুস-ফুস আর খেয়ে যাওয়া পাকস্থলী। ঝটাঝট সুঁই মেরে দাও, ভিজিটের টাকা পকেটে পোরো। একটা ইনজেকসান ঠিক তো পরের দিন শুধুই নির্ভেজাল ডিসটিলড ওয়াটার চালিয়ে দাও শরীরের কোষে কোষে! প্রথম প্রথম বিবেকে লাগতো এখন আর লাগে না। বিনোদ ডাক্তার নিজস্ব একটা জীবন দর্শন গড়ে তুলেছে। তুমি ব্যবসাদার তেলে হোয়াইট অয়েল ঢালছ, দুধে জল পাইল করছ, ঘি-এ চর্বি চালাচ্ছ, ওষুধ থেকে ওষুধ উধাও করে নিচ্ছ—তাতে যখন কোন দোষ হচ্ছে না, বাজারের মেয়ের সঙ্গে সোহাগ করে রক্তে বিষ নিয়ে বুক ফুলিয়ে আসছো নির্লজ্জের মতো, তখন বিনোদ ডাক্তারই শুধু ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে শাল-গ্রামের গায়ে লেপটে থাকবে কেন। বিনোদ ডাক্তার ছেলেবেলায় পড়া সংস্কৃত শ্লোকটিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়েছে নিজের মতো করে। আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন অথচ অগাধ জ্ঞান সমুদ্র, না ঐ জ্ঞান সমুদ্রের জায়গায় সে ধন সমুদ্র বসিয়েছে। তাড়াতাড়ি টাকা চাই। রাতারাতি ধনকুবের হতে হবে। টাকা চিনেছি বলেই না কোথাকার মানুষ কোথায় এসে বসেছি। খানদানি পাড়ায় বসলে লোকে বলতো ঘোড়ার ডাক্তার ; কিন্তু এই মিলপটিতে সে ডাক্তার সাব। কম খাতির তার! হোক না রোগীদের ঘাম চিটচিটে দুর্গন্ধ শরীর, ছাপ ছাপ ময়লা জামা বুক পিঠ। স্টেথো বুকে ঘামের সঙ্গে তেলের সঙ্গে জড়িয়ে চ্যাট চ্যোট করুক ক্ষতি কি, ভিজিটের টাকা পেলেই হ'ল। প্রথম প্রথম বগলের তলায় হাত চালিয়ে উপরের বাহুকে টান টান করে ছুঁচ ফোঁড়ার সময় তার ঘেন্না করতো, এখন সব সয়ে গেছে, এখন সে স্বচ্ছন্দে মেয়েদের অতি গোপনীয় অঙ্গে মলম লাগিয়ে দিতেও পেছপা নয়। বরং এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মেয়েদের আঁটসাঁট শরীর তার ভালই লাগে। ডাক্তার হিসেবে এ সব দুর্বলতা তার মনে না আসাই উচিত ; কিন্তু ওই! বিনোদ ডাক্তারের নিজস্ব একটা জীবন-দর্শন আছে এখন কমবয়সী চটকদার মেয়ে রুগী এলে সে যেন একটু বেশি যত্ন নিয়ে দেখে। পর্দা ফেলে একটু আড়ালে আব্রুর মধ্যে রেখে সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে। সারা শরীরে রোগ সন্ধান করে বেড়ায়, সময় সময় দয়া পরবশ হয়ে এক আধ টাকা মকুব করে দেয়, সুঁই

দেবার কোন আলাদা ফি নেয় না। কোন কোন মেয়ের অতি সংবেদন শীল শরীর তার হাতের ছোঁয়ায় সুড়সুড়ি লেগে খিলখিলিয়ে উঠলে বিনোদ ডাক্তার ধমক-ধামক দেয়—দিল্লাগি পা গিয়া। মেয়েটি চমকে গম্ভীর হয়ে যায়, ভাবে সত্যিই তো ডাক্তারবাবুকে ভাল করে দেখতে না দিলে চিকিৎসা ঠিক মতো হবে কি করে ?

খুব সামান্য অবস্থা থেকে বিনোদ ডাক্তার উপরে উঠেছে। গ্রামের ছেলে শহর কলকাতায় এসেছিল সেই কোন ছেলেবেলায় ভাগের সন্ধানে। বহু ঘাটের জল খেতে খেতে শেষে কম-পাউণ্ডার কমপাউণ্ডার থেকে ডাক্তার। অনেক কষ্ট করেছে। ফুটপাতে রাত কাটিয়েছে। বস্তির খোলার ঘরে নর্দমার গন্ধে রাতের পর রাত কেটেছে। কোন কোন দিন এক বেলাও খাবার জোটেনি। তারপর অবশ্য দিন বদলেছে। সহজ পয়সা আসার সোজা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। বড়লোকের শির উঠা শীর্ণ হাতে মরফিন কি কোকেন পুরেছে মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে। সবই পয়সার জন্যে। বিনোদ ডাক্তার মাঝে মাঝে সেই কারণেই বলে বোধহয় ওরে পেট তোর জন্যেই মাথা হেঁট।

ধুরন্ধর ছেলে। লোকে বলত নদীর এপারে পুঁতলে ওপারে গাছ গজাবে। জীবনে দুটো জিনিস যে একসঙ্গে পাওয়া যায় না ডাক্তার ত, জানতো। ধর্ম আর অর্থ এক সঙ্গে হয় না। ধর্ম হলে অর্থ হবে না, অর্থ হলে ধর্ম নাস্তি। সেই কারণেই বোধহয় বিনোদ ডাক্তারের জীবন ধর্ম থেকে অনেক দূরে ছিল। তার আশ্রয়দাতার স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়ার সময় তার পা কাঁপেনি। বুড়ো কমপাউণ্ডার হেম বাবু তখন বিনোদকে নিজের ছেলের মত করে কাজ শেখাচ্ছিলেন। একই ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে দুজনে কাজকরতো। বেশি কি, হেমবাবুই বিনোদকে লাইন বাতলে ছিলেন। পয়সা আছে বাবাজী এই লাইনে। ইনজেকশান ড্রেসিং কাটাকুটি লেগেই থাকে আর সবেতেই নগদ পয়সা, বাকীর ব্যাপার নেই। হেমবাবু সবই বুঝেছিলেন, কেবল বোঝেন নি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা ভাগ্যে সয় না। হেমবাবু সবই সামলেছিলেন, কেবল নিজের ঘর বেসামাল হয়ে গেল।

বিনোদ তখন সবে এনাটমি পড়া শুরু করেছে। মানুষের শরীর চিনতে শিখছে। হেম বুড়ো হাঁপানীর রুগী, প্রথম রাতে

ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতো। শেষ রাতে বিছানায় বসে কাশতো খক্ খক্। প্রথম রাতে তাই বিন্দু, হেমের কাঁচা বৌ গায়ে গতরে আঁটসাঁট বিনোদের ঘরে খিল তুলে আর একবার এনাটমি চর্চা করতো। এনাটমির প্রাক্টিক্যাল ক্লাস। এখানেও বিনোদ ডাক্তারের একটা স্বতন্ত্র জীবন দর্শন ছিল। বিন্দুর কোলে শুয়ে শুয়ে ভাবতো সে, বিন্দুর শারীরিক প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা বুড়ো হেমের নেই, অতএব আশ্রয়দাতারব'কলমে তাঁর স্ত্রীকে আনন্দ দেওয়া অন্যায় কিছু নয় বরং পবিত্র কর্তব্য। সেই কর্তব্যটি দীর্ঘ দিন একনাগাড়ে করার পর, বিন্দুর পেটে কুসুম এলো। সকলে বলাবলি করলে বুড়ো হেমের হিম্মত আছে। বুড়ো হেম কিন্তু ব্যাপারটা সহজে হজম করতে পারলো না। ইতিমধ্যে বিন্দুর ভরা মাসে বিনোদ-এর পরীক্ষার ফল বেরোলো, সে পাশ করেছে, নামের আগে ডাক্তার। সেদিন রাতে ছোটখাটো একটা উৎসব হ'ল কেন বোঝা গেল না সেদিন সকলেই কিঞ্চিৎ লাল পানীয় পান করেছিল। হেম বুড়ো একটু বেশি খেয়ে বেসামালা। বিনোদ নিজে হাতে চুমুকে বিন্দুকে একটু খাইয়েছিল। তারপর হেম কমপাউণ্ডারের চোখের সামনে বিন্দুর গলা জড়িয়ে চুমো খেতে খেতে পেটে টুসকি মেরে বলেছিল—যে ব্যাটাই আসুক, শালা পয়মন্ত।

হেম বুড়ো সেদিন একটা কান্ডই করেছিল। ভাঙা বোতল হাতে বিনোদকে কোতল করতে গিয়ে, নিজে বমি করে ঘরে ভাসিয়েছিল, তারপর প্রায় উলঙ্গ হয়ে সেই বমির উপরই মূর্ছা গিয়েছিল, বিন্দু বাঁ পায়ে স্বামীকে একটা লাথি মেরে বিনোদের কোমর ধরে হিন্দি ছবির নায়িকার মত নেচেছিল। সেই রাতেই হেম কম্পাউণ্ডারের দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিনোদ আর বিন্দু নতুন জায়গায় নতুন করে ঘর বেঁধেছিল।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। বিনোদ ডাক্তার ইতি-মধ্যেই দু' কাপ চা খেয়ে ফেলেছে। ধীর পায়ে সন্ধ্যা এগিয়ে এগিয়ে আসছে। চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া প্যাচপ্যাচে কাদা। বিনোদ কদিন বড়ই চিন্তিত। টাকার দরকার অথচ টাকা আসছে না। বিন্দুর মতো মেয়েছেলেকে খেলাতে গিয়ে বিনোদ ডাক্তার কাবু হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে ভাবে হেম বুড়োর অভিশাপ। এদিকে

নিজের জলপথে যাতায়াত বেড়েছে, তারও খরচ আছে। সেই সঙ্গে জীবনের এক ঘেঁয়েমী কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে অন্য চিড়িয়া ধরার অভ্যাসও হয়েছে। সব কিলিয়ে পরিস্থিতি খুব জটিল।

কিভাবে এক মাঝ বয়সী দাইয়ের পাল্লায় পড়ে একটু অন্য রকমের চিকিৎসাও করতে হয় মাঝে মধ্যে। রুগী সবই কুমারী মেয়ে অথবা কমবয়সী বিধবা। পয়সা আছে এই লাইনে। এ কাজেও বিনোদ ডাক্তারের নৈতিক সমর্থন আছে। ভাবে এও এক ধরনের সমাজসেবা। অসুখীকে সুখী করা। কুমারী মায়েদের আত্ম-হত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনা।

ইদানীং নানারকম দাওয়াই বেরিয়ে এই রকম কেস বেশ কমে এসেছে। লক্ষ্মী দাইয়ের চেহারাতেও আর সে চটক নেই। আগে বিনোদ ঠাট্টা করে বলতো, তুমি লক্ষ্মী আমি নারায়ণ। দুজনের মধ্যে একটা বেশ বোঝাপড়া ছিল। মাঝে মধ্যে ভাল কেস উতরে যাবার পর বিনোদ এক আধ রাত লক্ষ্মীর ঘরে কাটাবার সুযোগ পেতো, অনেকটা পাওনার উপর উপরির মতো।

বিনোদ ভাবছিল এই রকম কেসও যদি একটা আসতো, তাহলে এই সময়টা কোন রকমে সামাল দেওয়া যেত। একটা সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই পাশের লাল বস্তি থেকে একটা মেয়ে এলো সঙ্গে মাসি। মেয়েটাকে মনে হ'ল নতুন লাইনে এসেছে। বিনোদ ভাবলো, যাক তবু যাহোক একটা কিছু এসেছে। সন্ধ্যের মুখে সময়টা কিছুক্ষণ ভালই কাটবে। পর্দাটা টেনে দিয়ে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে পরীক্ষা করতে লাগল। মেয়েটিও কম শয়তান নয়, এক সময় মুচকি হেসে বলল—ফি দেবো না তোমাকে, আমিই ফি চাইব। তারপর বলল—আসো না কেন আমার ঘরে। বিনোদ ডাক্তার গালে একটা ঠোনা দিয়ে বলল—এসেই তো রোগ ধরিয়েছিস আগে সেরে নে, তারপর দেখা যাবে। একটা সুঁই ফুঁড়ে দিয়ে চার টাকা আদায় করে নিল। হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে আর এক কাপ চা নিয়ে বসেছে কি বসে নি, লক্ষ্মী এল।

ওঃ অনেক অনেক দিন পরে। লক্ষ্মী এমনি আসে না, কাজের মানুষ, কাজ নিয়েই আসে। বিনোদ ভগবান বিশ্বাস করে না আজ কিন্তু মনে মনে বলল, হে ঈশ্বর বোধহয় তুমি মুখ তুলে চাইলে। ঘরে কেউই ছিল না তবুও লক্ষ্মী বিনোদের চেয়ারের

পাশে এসে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল—রাত আটটায় আমার ওখানে এসো, কেস আছে। ভালই দেবে। তৈরি হয়ে এসো। সবে ধরেছে, বেশি ঝামেলা হবে না। বিনোদ লক্ষ্মীর নিতম্বে হাত বুলিয়ে একটু আদুরে গলায় বলল, আচ্ছা গো, আচ্ছা, তাহলে আজ আর বাড়ী যাব না। লক্ষ্মী বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—সে দেখা যাবে। চেম্বারের সামনে রিক্শা দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্মী তার রিক্শা জোড়া চেহারা নিয়ে চলে গেল।

গলির মুখে আলো নেই। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে কাদা জমেছে। আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ উঠছে। সাদা বেড়াল একটা ছাইগাদার উপর মরে পচে ফুলে উঠেছে। ইটবাঁধানো রাস্তা। একপাশে খোলা ড্রেন। বিনোদের যেন কেমন ভয় ভয় করছিল। বেশ কিছুদিন আসেনি তাই বোধ হয়; কিম্বা বর্ষাবাদলার জন্যেও হতে পারে। যাই হোক সাহস করে ঢুকে পড়ল, একবারে শেষের বাড়িটাই লক্ষ্মীর! ভাঙা পুরোনো। ভেতরে খানকয়েক ঘর আছে, প্রয়োজন মতো সাজানো। লক্ষ্মীর যা পেশা তাতে অনেক লোককেই তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। এক এক দেবতা এক এক নৈবেদ্যে সন্তুষ্ট। বিনোদ আস্তে কড়া নাড়তেই লক্ষ্মী দরজা খুলে দিল—বিনোদ ঢুকতেই আবার খিল এঁটে দিল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, এসে গেছে। বিনোদ বলল, ঠিক আছে—কতক্ষণ আর লাগবে? গরম জলটল করেছ?

—সব রেডি!

—তাই নাকি, আর তুমি তো পাকা মেয়ে মানুষ।

—মেয়েটাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছি। ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছে। বলছে, বাচ্চাটাকে নাকি সে বাড়তে দিতেই চেয়েছিল, কেবল মার ভীষণ আপত্তি।

—সঙ্গে কেউ এসেছে?

—না, একেবারে একলা। জানাজানির ভয় আছে।

—বিনোদ, টেবিলের উপর ব্যাগ রেখে, হাতে দুটো গ্লাভস্ পরে নিল। প্রাথমিক করণীয় যা কিছু তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল! বিনোদ খুব সাবধানী লোক, নিজের মুখ সে দেখাতে চায় না, বলা যায় না কখন কি হয়? মাথায় একটা টুপি পরে

চোখ দুটো শুধু খোলা রেখে, মুখের বাকি অংশ সাদা কাপড়ে ঢেকে, হাতে একটা ছুঁচোলো স্টিক নিয়ে পশের ঘরে প্রবেশ করলো।

আলোটা কমই করা ছিল, তবুও মেয়েটি চিৎ হয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়েছিল। লক্ষ্মী তার পরনের সিল্কের শাড়িটা খুলে নিয়ে ভাজ করে চেয়ারে রেখেছিল। ঘরে স্টেরিলাইজারের গন্ধ। মেয়েটির পরনে শুধু পেটিকোট বয়স কত হবে, সতেরো আঠারো। বাড়ন্ত গড়ন। পুরুষ্টু-বুক নিঃশ্বাসে উঠা পড়া করছে। বিনোদ ডাক্তারের নিজেরই লোভ লাগছিল। সুইচ টিপে আলো জোর করে, দু'কদম এগিয়ে এসেই, বিনোদ ডাক্তারের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল। সে চমকে একলাফে ঘরের বাইরে ছিটকে চলে এলো। দরজার মুখে লক্ষ্মী আসছিল ট্রেতে তুলে নিয়ে, ধাক্কা লেগে ট্রে হাত থেকে ছিটকে চলে গেল।

প্রচণ্ড শব্দে মেয়েটি উঠে বসেছে, নেমে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। ভয় পেয়ে বলছে—কি হ'ল ? কি হ'ল ?

বিনোদের মাথার টুপি খুলে গেছে, মুখ থেকে কাপড় খসে গেছে—রুগী আর ডাক্তার মুখোমুখি ! কারুর মুখে কথা নেই। লক্ষ্মী অবাক ! সময় নিঃশব্দে অতিবাহিত হচ্ছে। হঠাৎ কুসুম চিৎকার করে বিনোদের গলা জড়িয়ে ধরলো—বাবা, আমি মা হবো।

একটি দুর্দ্ধর্ষ অভিযান

আমি তখন দেওঘরে এক বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করি। শীত প্রায় আসবো আসবো করছে। সকাল সন্ধ্যে হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডার কামড়। শিক্ষক ছাত্র এখানকার নিয়ম অনুসারে সকলেই সকলকে দাদা সম্বোধন করে থাকেন। রবিবার দুপুরে বেশ ভুরিভোজ হয়েছে। এইবার একটু গড়াগড়ি দিতে পারলেই হয়। এমন সময় একটা টাঙ্গা রোদ ঝলমলে মাঠ পেরিয়ে আমাদের শিক্ষকাবাসের সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীত শিক্ষক তুলসীদা লম্বা ছিপ ছিপে গৌরবর্ণ মানুষ, একেবারে ধোপ দুরস্ত হয়ে এসে আমাদের ঘাড় ধরেই প্রায় বিছানা থেকে তুলে দিলেন। আজ ত্রিকুট দর্শন করতেই হবে।

তুলসীদার কৃপায় আজ আমরা ত্রিকুট যাত্রী। সঙ্গে গেম টিচার বিদ্যুৎদা আর ইংরেজী শিক্ষক সুধাংশুদা। তুলসীদা আর সুধাংশুদা সমবয়সী। আমাদের দুজনের চেয়ে বয়সে বড়। তুলসীদার গলায় মাফলার। গাইয়েদের গলার অদৃশ্য শত্রু অনেক। বারোমাসই মাফলার দিয়ে প্যাক করে রাখতে হয়। নাদ ব্রহ্ম। তিনি নাভির কাছ থেকে বায়ু পিত্ত, কফ ভেদ করে উঠে আসেন কণ্ঠে। তুলসীদার ডোল ডায়েটে স্টার্চ কম, প্রোটিন বেশী, এক কেজি বিদ্যাপীঠের বাগানের পেঁপে, দুটো মাঝারি সাইজের পেয়ারা আর সকালের আধ হাত নিম দাঁতন কমপালসারি। চেহারাটি একেবারে কণিকা মাফিক। বিদ্যুৎদা বারবেল সাধেন বাইসেপ, ট্রাইসেপ, ডেলটয়েড সবই বেশ খেলে। খেলে না কেবল কোলোন। ইসবগুল, দু কেজি পালঙের সুরুয়া সবই ফেল করেছে। মাংসর যুসটি খান, মাংস ফেলে দিন এই তাঁর উপদেশ। দুশ্চিন্তা একটাই চুলে সাদা ছিট ধরছে আর, উঠে যাচ্ছে। অন্যথায় স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ সুধাংশুদার সমস্যা একটাই। ভুঁড়িটা আর কত বাড়তে পারে তিনি দেখতে চান। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতই উদার। বিদ্যুৎদার মতে এই উদারতা সব উদরে গিয়ে জমছে। সুধাংশুদার মস্ত বড় গুণ, ধীর, স্থির, মেজাজটি

অদ্ভুত ঠাণ্ডা এবং বেশীক্ষণ তিনি জেগে থাকতে পারেন না। এই তো কোলের উপর ভুঁড়িটি নিয়ে আয়েস করে বসে আছেন। মুদিত নয়ন। নাসিকায় গর্জন! আমাদের রসিকতা তাঁর শরীরের চর্বির স্তর ভেদ করতেই পারে না। তুলসীদা নাকি ৬৫ সালে একটা গণ্ডারকে সুড়সুড়ি দিয়েছিলেন, রিপোর্ট, সেটা ৬৭ সালে হেসে উঠেছিল।

তিনটে নাগাদ আমরা ত্রিকুটের পাদদেশে। তুলসীদার ফ্ল্যাস্কে চা। এক চুমুক করে হল। সুধাংশুদা ঘাড় বেঁকিয়ে পাহাড়ের মাথাটা একবার দেখবার চেষ্টা করে বললেন, ইমপসিবল, ওনলি এ গোট ক্যান ক্লাইম্ব দিস হিল। তুলসীদা বললেন, রাখুন মশাই আপনার ইংজিরি। ভাষাটা জানি না বলে যা খুশি তাই গালাগালি দেবেন। বিদ্যুৎদা বললেন বিদ্যাপীঠের ডাক্তারবাবু কি বলেছেন মনে নেই? পূর্ণকুম্ভের মত আপনি এখন পূর্ণগর্ভ। আরোহন এবং অবরোহন আপনার একমাত্র ওষুধ। ওসব চালাকি চলবে না। চলুন।

সুধাংশুদার প্রতিবাদ, কাকুতি-মিনতি, কে শুনবে। পর্বতশীর্ষে সুধাংশুদাকে আমরা, ভোলানাথের মত প্রতিষ্ঠিত করবই। প্রতিজ্ঞা ইজ প্রতিজ্ঞা।

ত্রিকুট খুব সহজ পাহাড় নয়। উঠতে গিয়েই মালুম হল। কাঁকরে পা স্লিপ করে। আঁকড়ে ধরার মত কিছুই নেই, একমাত্র নিজের প্রাণটি ছাড়া। পাশেই খাদ। পড়লে চিরশান্তি! পাহাড়েই প্রেতাত্মা হয়ে আটকে থাকতে হবে। ভ্যানগার্ড তুলসীদা, রিয়ার-গার্ড বিদ্যুৎদা। মাঝে আমি আর সুধাংশুদা। বললেন, এই প্রথম বুঝলুম ভুঁড়ির ওজন কত। বেশ ভারি মশাই। আগে ভাবতুম 'মাস উইদাউট ওয়েট, এখন দেখছি উইথ ওয়েট'।

একটা চাতাল মত জায়গা পওয়া গেল। একটু বসে, বাকি চাটা শেষ করতে হয়। একটু প্রকৃতি দর্শন না করলে পর্বতপ্রেম আসে কি করে। সুধাংশুদা বললেন, 'ভাই আমার উপর আর টর্চার কোরো না, তোমরা আমার ছেলের মত! আমি এখানে বসি তোমরা নামার সময় আমাকে নিয়ে যেও।' একটা রফা হল। আর একটু উঠলেই রাবন গুহা। গুহা দর্শন করে আমরা নেমে যাবো। আরে মশাই শরীর আগে না মাইথোলজি আগে। রাবনের রেলিকস

না দেখে চলে যাবেন ? তুলসীদার অনুপ্রেরণায় হাতের ওপর ভর দিয়ে সুধাংশুদা শরীরটাকে ওঠালেন।

গুহা দেখলেই ভয় ভয় করে। গুহার অন্তর্নিহিত সত্য সহজে জানা যায় না। কি যে মালমশলা ঘাপটি মেরে ভেতরে বসে আছে একমাত্র ঋষিরাই বলতে পারেন। মুখটা বিশাল। দুদিকে পাথরের দেয়াল। একটু যেন টেপারি হয়ে গেছে। আমাদের কনভয়ের সেই আগের অর্ডার। প্রথমে তুলসীদা, পায় ফাইন্ডার, হাতে টর্চ। নেকস্ট সুধাংশুদা, তারপর আমি! তারপর বিদ্যুৎদা। তুলসীদা বললেন, 'বাঘ যদি থাকে আগে আমাকে খাবে।' সুধাংশুদা বললেন, 'এ্যাম নট শিওর! খাদ্যের ব্যাপারে ওরা ভীষণ সিলেকটিভ। বোনস্ ওরা চিবোয় ঠিকই তবে ফ্লেশটাই আগে চায়।' কথা বলতে বলতে বেশ কিছুটা ঢুকে গেছি। এইবার সেই জায়গাটা দুই পাথরের দেয়াল চেপে এসেছে। তুলসীদা কাত হয়ে এগিয়ে গেলেন। সুধাশুদাও তাই করলেন। কেবল একটু মিস ক্যাল-কুলেসান। এ কি হল ? সুধাংশুদার গলা। আর তো যাচ্ছে না, মরেছে। কি যাচ্ছে না ? আমরা এপাশের দুজন সমস্যাটা বুঝতেই পারিনি। সুধাংশুদা বললেন আমি যাচ্ছিনা। দাঁড়িয়ে থাকলে যাবেন কি করে ? চলার চেষ্টা করুন। সুধাংশুদা বললেন, প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ভুঁড়িটা আটকে গেছে ডাইসের মত আমরা চিৎকার করলুম, তুলসীদা! দূর থেকে উত্তর এল। সুধাংশুদার ভুঁড়ি আটকে গেছে।

শেওলা ধরা দেয়াল! ভুঁড়ি তার গেঞ্জি আর আদ্দির পাঞ্জাবির কভার নিয়ে দুটো পাথরের মাঝখানে জম্পেশ! প্রথমে কিছুক্ষণ কমনসেনসের খেলা চলল—নিঃশ্বাস খালি করে পেট কমান। দেখা গেল, এ পেট সে পেট নয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাড়া-কমার কোনো সম্পর্কই নেই। সন্ধ্যের মুখে আবার উদরে বায়ুর সঞ্চার হয়। আপনার নিজের পেট নিজের কণ্ট্রোলে নেই ? একটু নামাতে পারছেন না ? তুলসীদা সুধাংশুদার অক্ষমতায় খুব অসন্তুষ্ট। কি করি বলুন কমছে না যে ? সুধাংশুদা হেল্পলেস। বিদ্যুৎ তোমরা ওদিক থেকে টেনে দেখো, আমিও এদিক থেকে ঠেলে দেখি। আউর থোড়া হেইও, বয়লট ফাটে হেঁইও। এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না। মোক্ষম আটকেছেন মশাই। কি করে

আটকালেন। একেবারে নিরেট থাম। আপনি কি রাবনের চেয়ে দশাসই! অতবড় একটা রাক্ষস সাঁ্যাট সাঁ্যাট গলে যেতো। আর আপনি সামান্য একজন মানুষ আটকে গেলেন।

রাবনের ফিজিওনমি নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা হল। সুধাংশুবাবু বললেন, তার মশাই নানারকম মায়া জানা ছিল। এইখানটায় এলে হয়তো মাছি হয়ে যেতো। বিদ্যুৎদা বললেন ধুর মাশই। তবু নিজের দোষ স্বীকার করবেন না! ব্যায়াম, ব্যায়াম। রাবন মুগুর ভাঁজতেন। পাঁচ হাজার ডন, দশ হাজার বৈঠক ডেলি। আর রাক্ষস হলেও রাক্ষুসে খাওয়া ছিল না আপনার মত। কোনো ছবিতে রাবনের ভুঁড়ি দেখেছেন। অন্য সময় হলে তর্কাতর্কি হত। বিপন্ন সুধাংশুদা রাবনের উপর লেটেষ্ট রিসার্চ অম্লান বদনে মেনে নিলেন।

আচ্ছা এখন তাহলে কাতুকুতু দিয়ে দেখা যাক। নিন হাত তুলুন। প্রথমে বিদ্যুৎদা। কোথায় কি? খ্যাত খ্যাত করে হেসে উঠলে ভুঁড়িটা হয়তো ধড়ফড় করে উঠতো, সেই সময় মোক্ষম ঠ্যালা। আমি বললুম 'দাঁড়ান ওভাবে ডিরেক্ট কাতুকুতুতে হবে না। টেকনিক আছে। দেখি হাতের তালুটা। এই নিন, ভাত দি, ডাল দি, তরকারি দি, মাছ দি. নিন মুঠো করুন, মুঠো খুলুন, যাঃ কে খেয়ে গেল অ্যা, ধর মিনিকে, ধর মিনিকে, কুতু কুতু।' কোথায় হাসি? 'না মশাই হবে না। আপনি এখানেই থাকুন ফসিল হয়ে। অপঘাতে মৃত্যু লেখা আছে কে খণ্ডাবে!' তুলসীদা বললেন 'আহা' আমি শুনাব সতীসাধ্বী স্ত্রী, যে সহমরনে যাবো? এই মালকে ক্লিয়ার না করলে, এ দিকে তো ট্রাফিক জাম হয়ে গেছে।' আপনি হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসুন। 'কাপড়ে শ্যাওলা লেগে যাবে যে?' বিদ্যুৎদা বললেন, 'জীবন আগে না কাপড় আগে' তুলসীদা অবশেষে হামা দিয়ে চলে এলেন আমাদের দিকে।

বসার চেষ্টা করে দেখুন তো। সুধাংশুদাকে যা বলা হচ্ছে, প্রাণের দায়ে তাই তিনি বাধ্য ছেলের মত করছেন। বসার চেষ্টা করলেন, হল না! আমরা বললুম, একটু জলত্যাগ করুন তো যদি পেটটা কমে। না, মরে গেলেও তিনি এই কাজটি করতে রাজি হলেন না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তুলসীদা বললেন, টাঙ্গাওলা চলে গেলে ফেরার দফারফা। টর্চ জেবলে তুলসীদা

একবার ভুঁড়িটা ইনস্পেকসান করে বললেন, বিদ্যুৎ এদিকে এস। ছুরি আছে? আমার পকেটে ছুরি ছিল। ছুরি কি হবে তুলসীদা? সুধাংশুদা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। ওপর থেকে একপোঁচ কেটে নেবো। সবটাই তো চর্বি লাগবে না। আর আপনার যা গ্রোথ দেখতে, দেখতেই গজিয়ে যাবে! তুলসীদা ছুরি দিয়ে পাশ থেকে গেঞ্জি আর পাঞ্জাবিটা ফালা করে ভুঁড়িটাকে খুলে দিলেন। ঠাণ্ডা লেগেছে। সুধাংশুদা একটু সিঁটিয়ে গেলেন। কাজ হয়েছে। তুলসীদা ফ্লাস্ক থেকে ওপর থেকে খানিকটা চা ঢাললেন 'জয় বাবা বদ্রী বিশালা। একটু লুব্রিকেট করে দিলুম। এবার মারো টান। আমরা চারজনেই জড়াজড়ি করে পড়লুম। সুধাংশুদার ভুঁড়ির ওপরের নুনছাল একটু উঠে গেছে। পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ভুঁড়িটা সম্পূর্ণ অনাবৃত। চা আর শাওলার পেস্ট মাখানো। বৃদ্ধ বয়সে গায়ে হলুদ।

টাঙ্গা যখন বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করল, রাত হয়ে গেছে। নামার আগে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সধাংশুদার একটিই খালি কাতর মিনতি—'ভাই দয়া করে ছাত্রদের বোলো না। বৃদ্ধ বয়সে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।' তবু এমন ঘটনা চেষ্টা করলেও চেপে রাখা যায় না। রাষ্ট্র হয়ে পড়বেই।

বৃষ্টি

আকাশ মেঘলাই ছিল। হঠাৎ দূরে ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি এল। বৃষ্টি আসছে, ক্রমশই এগিয়ে আসছে হু হু করে। আমরা দুজনে ছুটতে ছুটতে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম প্রথমে। জানি ভীষণ জোরে বৃষ্টি এলে মাথা বাঁচবে না; কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ফোর্টের পাশে এই ফাঁকা মাঠে আর কোন আশ্রয় আছে! সামনে গেরুয়া গঙ্গা। একটা দুটো মাঝারী জাহাজ বৃষ্টিতে ভিজছে। দূরে পাকিস্তান থেকে ধরে আনা প্যাটনের লোহার চাদরের উপর চটাপট বৃষ্টির ফোঁটা ছিটকোচ্ছে। দুপুরে সাধারণত এদিকে লোক খুবই কমই আসে। গ্রীষ্মের দুপুরে কে আর শখ করে বেড়াতে আসে ফাঁকা মাঠে। আমরা দুজনে এসেছিলাম মেঘলা দেখে। মেঘ-থমকানো দুপুরে ভরা গঙ্গা, জেটি আর জাহাজকে এক পাশে রেখে হাতে হাত ধরে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে মেরিন হাউসের দিকে যেতে চেয়েছিলাম। একটা দুটো বাস, কি মোটর হুস হুস করে চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। এখন বৃষ্টি আমাদের আটকে দিয়েছে। দুটো পাখির মত জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছি গাছতলায়। গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট লাগছে। বেশ বুঝতে পারছি মাথার উপর পাতার আবরণ আর বেশিক্ষণ আমাদের বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না! কল্পনা ইতিমধ্যে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে। নীল শাড়ি জড়ানো তার বাইশ বছরের শরীর এখন আমার খুব কাছে। আমি তাকে কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরে প্রায় বুকের পাশে টেনে এনেছি। বৃষ্টি ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে তার শরীরের গন্ধ মিশে নাকে আসছে। মনে হচ্ছে অনেক দূরের একটা ছবি বৃষ্টির দূরবীনে খুব কাছে এসে গেছে—সেই সেদিনের ছবি যেদিন কল্পনা আমার বৌ হবে।

আপাতত অনেক বছর আমাদের এমনি করে মাঝে মাঝে বাড়ি পালিয়ে শহরের এই সব প্রান্তসীমায় এমনি সব অদ্ভুত সময়ে চলে আসতে হবে, কারণ চলে না এসে পারব না। একটা চিঠি লেখা

কি দূর থেকে দেখে একটু মুচকি হাসার পর্যায় আমরা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়েই গেছে, যেদিন একটা চাকরি পাব, ঠিক তার একমাস পরেই বিয়ে করব। কোন ঘটা-টটা নয়। নিতান্তই সাদামাটা নিম্ন মধ্যবিত্তের বিয়ে। সানাই নয়, ভোজ নয়, তবে হ্যাঁ, হিন্দুমতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে। কল্পনার দীর্ঘ শরীর বেনারসীর আবরণে সেদিন কেমন দেখাবে যেদিন আমরা গাটছড়া বেঁধে সাতপাকে ঘুরব। কল্পনার দিকে আড় চোখে চেয়ে আমার মনে হ'ল, এখন যেমন দেখছি, এতটা স্নিগ্ধ নয় আর একটু দীপ্ত, কারণ উপোস আর হোমের আগুনে সেদিন তার মধ্যে একটা অন্য দীপ্তি আসবে! দৃশ্যটা চিন্তা করে তখনই একটা ইচ্ছে হ'ল। ডান হাতটা তখন কল্পনার কোমরের উপর একফালি অনাবৃত মসৃণ জায়গার উপর খেলা করছিল। আমি তাকে আর একটু কাছে টেনে এনে তার গালে একটা চুমু খেলাম। বৃষ্টি ভরা সেই ফাঁকা মাঠে ঝাঁকড়া গাছের তলায় জলে ভেজা কপোত-কপোতীর মত আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে। জলের ঝাপটা আর পশ্চিমের হু হু হাওয়ায় আমাদের শীত করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা একটু আশ্রয় খুঁজছিলাম মনে মনে। যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠ হয়ে একে অন্যকে বৃষ্টির ছাট থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলুম। যদিও ব্যাপারটা ছিল খুবই দুঃসাধ্য।

ইতিমধ্যে মনে হ'ল বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ একটু কমে গেল। যেন কোন এক অদৃশ্য প্রান্তে জলের সুতো ছিঁড়ে গিয়ে একটু ফাঁক পড়ে গেল। এই সুযোগ, ছুট ছুট করে আমরা দুজনে প্রিন্‌স অফ ওয়েলসের জন্যে কোন এক সময়ে তৈরি মেমোরিয়েলের তলায় আশ্রয় নিলাম। কল্পনার শাড়ির নিচের দিকটা ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গিয়েছিল। ছুটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। শাড়িতে, সায়াতে সপ্‌ সপ্‌ শব্দ। মনে আছে কল্পনা খুব হাসছিল। তার চটি, পা থেকে খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মেয়েরা যে কেন বৃষ্টিতে ভিজে এত আনন্দ পায়।

গোটা কতক বিশাল স্তম্ভের উপর একটা ছাত। চারদিক ফাঁকা, মাথাটাই কেবল আবরণে ঢাকা। ভিতরে কয়েকটা বসার আসন পাতা। জায়গাটাকে আগে কখন এত ভাল করে দেখার

সুযোগ হয়নি। এ জায়গাটা প্রায়ই বিশেষ এক ধরনের লোকের দখলে থাকে। আজ আর এত ভাবলে চলে না। কে ভিজবে গাছতলায়। আকাশের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। চারিদিক ঝাপসা যেন মধ্যাহ্নে আঁধার। আজ অবশ্য বেশি লোক ছিল না! বেশি; বলি কেন আদৌ কোন লোক ছিল না। আমি আর কল্পনা। একটা কুকুর তার একরাশ ছানাপোনা। ঢুকতে না ঢুকতেই আবার বৃষ্টি এল। এবার আরো জোরে। সঙ্গে এলোমেলো প্রচণ্ড হাওয়া।

শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে কল্পনা বলল, যাক আর ভয় নেই, এবার শালা কত বৃষ্টি আসবি আয়।

কল্পনা খুব খুশী থাকলে মাঝে মাঝে শালা বলে।

—তুমি তো একদম ভিজে গেছো। এক কাজ করো না, এখানে তো কেউ কোথাও নেই, শাড়িটা খুলে এস আমি একটা দিক ধরি, তুমি একটা দিক ধর লম্বা করে। যা হাওয়া এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।

—যাঃ কি যে বল তুমি, একেবারে ছেলেমানুষ। চারিদিক উদোম খোলা। আমি এখানে সায়া আর ব্লাউজ পরে শাড়ি খুলে শুকোবো। হিন্দি ছবি পেয়েছ না!

—হিন্দি ছবিরই তো বিষয়বস্তু আমাদের এই দুজনের বেরোনো, এই স্ট্যাণ্ডে ঘুরে বেড়ানো। এখন এই শাড়ির দৃশ্যটা জুড়ে এস ডুয়েট গাই-হাওয়া মে উড়তা যায় মেরে লাল দুপাট্টা মলমল।

—উঃ কত দিনকার গান! তোমার মনে আছে। নার্গিস, রাজকাপুর। কথাটি বলেই কল্পনা হাত দুটো মাথার উপর তুলে একটা নাচের ভঙ্গী করল। দৃশ্যটা এত দুর্লভ, মনে হ'ল মুহূর্তটাকে মুক্তো করে হাতে ধরে রাখি। পকেটে একটা তোয়ালে রুমাল ছিল তাই দিয়ে কল্পনার ঘাড়ের গলার বুকের কাছের জল মুছিয়ে দিলাম। মেয়েরা শুধু সেবা করে না, মাঝে মাঝে একটু সেবা পেতে চায়। সেই সময়টা ওরা কি রকম আদুরে বেড়ালের মত হয়ে যায়, কেবল ঘর্ঘর শব্দটাই করে না, বাকি সব এক।

—চল না বসি ঐ খালি বেঞ্চটায়—ঝেড়ে ঝুড়ে।

—চল।

গঙ্গার দিকে মুখ করে দুজনে বসলাম পাশাপাশি। বেশী দূরে দেখা যাচ্ছে না ঝাপসা হয়ে আছে। ওপার মাঝে মাঝে পরিষ্কার হচ্ছে, আবার বৃষ্টির আঁচলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কল্পনার ঘাড়ের কাছে গালটা রাখলুম, জলে ভিজে হাওয়ার ঝাপটায় কি সুন্দর ঠাণ্ডা হয়েছে, যেন পাথরের বাঁধান বেদী। ঠিক বুকের কাছ থেকে একটা মৃদু, দেহের উত্তাপ মেশান সুন্দর গন্ধ উঠছে। এই বয়সের মেয়েদের কারুর কারুর নাভীর কাছে মৃগনাভী থাকে না কি ?

শব্দটা প্রথমে কল্পনারই কানে এল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে সে ঠিকই শুনেছে মৃদু হলেও বোঝা যায় স্পষ্ট কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলছে—জল জল।

—কে বলত। কে যেন জল চাইছে। কোথায় কাউকে দেখছি না।

—চল উঠে দেখি। কে জল চাইছে।

ভিতরে কোথাও কেউ নেই। আওয়াজটা আসছে পশ্চিম দিক থেকে। কল্পনাই প্রথম দেখল। লোকটি মধ্যবয়সী। চেহারা বেশ ভালই। একটা হাত বুকের কাছে। নিজের গায়েরই জামাটা সেই হাতে জড়ানো, রক্তে লাল হয়ে গেছে। আঘাতটা ঠিক কোথায় মাথায় না বুকে বোঝা গেল না। মাথাটা একটা উঁচু ধাপের উপর। চোখ দুটো ফুলে গেছে ভিতরের সাদা অংশ অল্প বেরিয়ে আছে। ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে নড়ছে—জল, জল।

কল্পনা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি কল্পনাকে প্রশ্ন না করলেও দুজনের মুখেই এক কথা লেখা—কি ব্যাপার, ব্যাপার কি ?

—মার্ডার নয় তো ? চল পালাই। শেষে হাঙ্গামায় জড়িয়ে যেতে হবে। পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।

—কি যে বল না। একটা লোক এই অবস্থায় জল চাইছে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ ! তাকে ফেলে রেখে যাবে ! আমাদের একটা কর্তব্য নেই !

—জল পাব কোথায় এখানে ! গঙ্গায় অনেক জল কিন্তু আনবে কিসে করে ? হঠাৎ কল্পনা হাঁটু মুড়ে লোকটার পাশে বসে পড়ল। তারপর শাড়ির আঁচল নিঙড়ে একটু একটু করে বৃষ্টির জল তার ঠোঁটে ঢালতে লাগল। তালু বোধ হয় শুকিয়ে গিয়েছিল একেবারে। জিভ দিয়ে চেটে চেটে সেই জল খেল। খেয়েও যেন কিছু হল না, আরো চাই। এদিকে আঁচলে আর কত জল থাকে !

কল্পনা কোমরের উপরের শাড়ীর পুরো অংশটা খুলে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে নিঙড়ে নিঙড়ে জল বের করে লোকটার সেই ভীষণ তেষ্টা মেটাতে লাগল।

আমি কি দেখব? সেই লোকটাকে, নাকি হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকা কল্পনাকে। ঘাড়ের কাছে খোঁপা দুলছে। খাটো কাঁচুলি ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিঠের দিকে আরো উঠে যাচ্ছে, ভরা বুক সেইস্থান পাত্রেও তার স্বাভাবিক কিম্বা অস্বাভাবিক আকর্ষণ বিকিরণ করছে। এক সময় মনে হল এই অসাধারণ দৃশ্যটা দেখার জন্যেই আমি হলে উঠে বসতুম। মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে ফিরে আসতুম। কিন্তু লোকটা কিছুই করল না। জল খেতে খেতে এক সময় কাত হয়ে গেল তার ঘাড়। চোখ দুটো একেবারেই উল্টে গেল। একেই কি বলে মৃত্যু। দেখিনি। কল্পনা উঠে দাঁড়াল। শাড়ি আবার শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে। চোখের কোনে জল। কাঁদছে সে। কি আশ্চর্য! কোথাকার কে এক নাম না জানা লোক, তার শোকে কাঁদবার কি আছে!

—যাঃ মরে গেল। কথাটা এমন ভাবে বলল যেন এইমাত্র তার হাত থেকে একটা পাখি উড়ে গেল।

—তুমি আগে কখন কাউকে মরতে দেখেছে কল্পনা?

—দেখেছি বৈ কি আমার বোনটা মারা গেল সেবার সেই শীতকালে।

—চল এইবার এইখান থেকে সরে পড়ি এইবার পুলিস আসবে তখন মহামুস্কিল হবে। বৃষ্টি নেমেছে, বিকেল হয়ে গেছে। এখুনি অফিস ছুটি হবে, চারদিকে লোক গিস গিস করবে।

—তাতে কি হয়েছে? এমন ভাবে কথা বলছ যেন তুমি এই মাত্র লোকটিকে খুন করেছ!

—তুমি জান না কল্পনা, মরা মানুষ দেখতে আমার ভীষণ ভয় করে। তারপর পুলিস? বাবা বলা যায় না কখন কাকে কিসে জড়িয়ে দেয়।

—একটা কিছু না করেই চলে যাব? দাঁড়াও একটা ভিজিটিং কার্ড জামার পকেট থেকে গড়িয়ে পড়েছে।

কল্পনা নিচু হয়ে কার্ডটা তুলে নিল। আমি কার্ডটা নিয়ে দেখলাম। লেখা আছে, বিকাশ চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার,

রেনবো ইনডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিমিটেড। তলায় এণ্টালির অফিসের ঠিকানা, বাড়ির ঠিকানা নিউ আলিপুরে। ছোট্ট করে ফোন নম্বর।

—তার মানে এই ভদ্রলোকের নাম বিকাশ চৌধুরী, একটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর। বল কি? এত বড় লোক।

—হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটা অন্য কারুর কার্ড হতে পারে, পকেটে ছিল হয়ত।

আমি তখন ভাল করে সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তন্ন তন্ন করে তার গায়ে ম্যানেজিং ডিরেকটারের চিহ্ন খুঁজতে লাগলাম। পায়ের জুতো, বেশ দামী ট্রাউজার, হ্যাঁ, কম দামী নয়, গেঞ্জি তাও বেশ দামী, চেহারা যথেষ্ট সুন্দর, হাতে একটা আংটি রয়েছে, পাথরটা নীল। নীলাও হতে পারে। চেহারা, বেশ ভূষা বেশ সম্মানজনক। কল্পনা আমার মনে হচ্ছে হয়ত বিকাশ চৌধুরী হলেও হতে পারেন। না হলেই বা কি? একজন মানুষ মারা গেছেন, এখন আমাদের অবশ্য কিছু করতে হবে!

—কল্পনা, একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়না বাঁচান যায় কিনা?

—কি ভাবে?

—কোন রকম আর্টিফিসাল ব্রিদিং ট্রিদিং বা অন্য কিছু করে।

—ছেলেমানুষ তুমি! ওভাবে কাউকে এই অবস্থায় কোন কালে বাঁচান গেছে।

—একবার দেখব চেষ্টা করে। কলেজে আমার এন, সি, সি, ট্রেনিং ছিল। ফার্ষ্ট এড কিছুটা জানা আছে।

—হঠাৎ তুমি এত উৎসাহী হয়ে উঠলে? এই তো বলছিলে সরে পড়বে।

—ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না। ভদ্রলোককে কোন ভাবে বাঁচাতে পারলে উনি খুব খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে আমাকে ঐ প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি দিতে পারতেন।

কল্পনা হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। পশ্চিমে গঙ্গার দিক থেকে রেলের লাইন পেরিয়ে একটা কড়া চেহারার লোক আসছে এই দিকে। আমরা জোরে পা চালিয়ে দিলাম, ফোর্টের পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমির উপর দিয়ে। বৃষ্টি থেমে গেলেও চারিদিক বেশ একটু বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব সন্ধ্যেটাকে মধুর শীতল করেছে। পশ্চিমে মেঘের ফাটলে সূর্য রঙের খেলা খেলছে।

রাত শেষ হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে। সমুদ্রের দিকের জানালাটা খোলা। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিষ আসবাবপত্র ক্রমশ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। সমুদ্র এখন শান্ত। দীঘার সমুদ্র অবশ্য সাধারণত শান্তই। কিন্তু এই ঘুমভাঙা ভোরে সমুদ্র এখন প্রশান্ত। ঠাণ্ডা ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে। সারারাত একটুও ঘুম হয়নি। এখন যেন বেশ খারাপ লাগছে। পুরো ব্যাপারটাই যেন অসুস্থতায় ভরা। এমন সুন্দর পাখী ডাকা ভোর, ঐ সমুদ্রের অনন্ত নীল বিস্তার কোন কিছুর পক্ষেই একাত্ম হতে পারছি না। ঘটনাটা এমন আকস্মিক। এই হঠাৎ দীঘায় আসা। ইত্যাদি। মাথার মধ্যে সব কিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে, ঘুলিয়ে যাচ্ছে, ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে।

বিছানার এককোণে লীনা এখন পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। আমি শিল্পী নই, কিন্তু এমন সুঠাম শরীর প্রকৃতই দুর্লভ। সেই কারণেই হয়ত এখন খারাপ লাগলেও চোখ ফেরাতে পারছি না। দিনের আলোয় ব্যাপারটা যত স্পষ্ট হচ্ছে ততই নানারকম আশঙ্কা মাথায় ভীড় করে আসছে সত্যি কিন্তু এখনও যেন মনে হচ্ছে যা ঘটে ঘটুক এরাত ভোলার নয়। আমি কোন রাজা মহারাজা অথবা বিজেতা হলে বলতুম, ঠিক হ্যায়, রাজত্ব চলে যায় যাক্, তবু এ জিনিষ ফেরাবার নয়।

সমুদ্রের দিকে জানালা বন্ধ করে দিলে এখনও ঘরে নামবে ফিকে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে, এখনও আমরা দুজনে সাঁতার কাটতে পারি। কিন্তু আপশোষ হয়। আজ থেকে পাঁচ বছর আগ যৌবন ফেলে এসেছি। এখন দেহ প্রৌঢ়ত্বের দরজায়। এ দেহ দিয়ে আর সব মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবুও অনেক-দিন পরে এমন একটা রাত জীবনে ফিরে এল।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি নিজেকে। হঠাৎ নজরে পড়ল, খাটের উলটোদিকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারা ধরা পড়েছে। মধ্যবয়সী স্থূলকায় একটি মানুষ, ফোলা ফোলা মুখ, বুকে কাঁচা-

পাকা চুল, মাথার মধ্যে একটি ছোট টাক, চোখের কোন দুটো ফোলা। খুব তারিফ করার মত চেহারা নয়। অথচ মাত্র দশবছর আগে কি ছিলুম। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কলকাতার বাড়ীতেও ভোর হচ্ছে। হয়ত সেখানে দক্ষিণে সমুদ্র নেই, কিন্তু দেবদারু গাছ আছে। জাফ্রির ওপারে প্রশান্ত ছাদে নিজের হাতে তৈরী বাগান আছে। সেখানে এই মুহূর্তে খাটে শুয়ে আছে, আমার স্ত্রী, সেও ঘুমোচ্ছে! কিন্তু সে অসুস্থ্যপ্রায় পঙ্গু আর্থ্রাইটিসে। —খাটের উপর বুককেসে বসান আছে ফোটোষ্টাণ্ড। আমাদের যৌবনের ছবি। সবে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি। গর্বোদ্ভাসিত চোখা সুন্দর যুবকের পাশে, বিশ্ব সুন্দরী না হলেও বেশ সুন্দরী মহিলা। মার পাশেই শুয়ে আছে আমাদের একমাত্র মেয়ে। এই বারোয় পড়েছে। মার চেয়ে সুন্দর, ফুলের মত টাটকা, দেবালয়ের মত পবিত্র।

কিন্তু আমি কি করে হঠাৎ দীঘায় চলে এসেছি ছিটকে। সঙ্গে এই আগুনের টুকরোই বা কে। হঠাৎ একাই হাসতে ইচ্ছে করল। আর্সির আমিও হেসে উঠল। মনে হল আমি যেন মিশরের রাজা ফারুক িস বিচে, সুইমিং কষ্টিউম পরে বসে আছি এই মুহূর্তে আমার কোন পরিচিত জন যদি ঐ জানালা দিয়ে উঁকি মারে কিম্বা একটা ছবি তুলে আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেয়, অথবা বেশ এনলার্জ করে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে কেমন হয়। এতে কি আমার স্ত্রীর বয়স এককথায় দশ বছর বেড়ে যাবে। আমার মেয়ে কি আমায় বাবা বলে ডাকবে না, আমার অফিসের কর্মচারীরা আমার গায়ে থুথু দেবে! কাগজের পাতায় পাতায় ঊর্দ্ধতন একজন কর্তৃপক্ষের হঠাৎ দীঘা সফরের কাহিনী ফলাও করে ছাপা হবে! সেণ্ট্রাল ইনভেসটিগেসনে ফাইল উঠবে! চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হব! সামান্য একটা রাতের জন্যে বড় বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে নাকি!

চাদরটা পায়ের কাছ থেকে তুলে লীনার শরীরটা ঢেকে দিলুম। সে একটু আড়ামোড়া ভাঙতে গিয়ে একটা হাত মাথার উপর তুলে পা দুটো ছড়িয়ে টান টান করল। শরীরের যত্ন নেয়. চুল থেকে নখ অবধি যত্নে বেড়েছে। এমন একটি রচনার মধ্যে নিজেকে যে কোন মূল্যে হারিয়ে ফেলা চলে। আমার অবস্থায় পড়লে বোধহয়

অনেক মহাপুরুষই ভেসে যেতেন। না লীনা এখন জাগবে না। সে কারুর স্ত্রী নয়, সে কারুর মা নয়। কারুর প্রতি তার কোন কর্তব্য নেই কোন দায়িত্ব নেই। বিশেষ কোন সময়ে তাকে ঘুম থেকে উঠতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

এখন সাতটা বাজতে অনেক দেরী। আটটা বাজবে আরো অনেক পরে। অতএব এখনও স্বচ্ছন্দে বিছানায় থাকা যায়। নরম, কোমল, উষ্ণ। দীঘায় আমি ভ্রমণে আসিনি সমুদ্র স্নানেরও বাসনা নেই। আবার পরে আসব কিনা তাও জানি না। বর্তমানের কথা চিন্তা করলে এইটুকুই বলা যায় সময় ফুরিয়ে আসছে, যৌবন চলে গেছে। অতএব সময় আর সুযোগের শেষ বিন্দুটুকুর সদ্ব্যবহার করতে হলে আমার এখনই এই জর এই শয্যা ছাড়া উচিত নয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সব কিছু ছিল প্রচ্ছন্ন, দিনের আলোয় তা যেন বড় বেশী প্রকট। তাছাড়া সেই উন্মাদনা, সেই নেশাটাও যেন কেটে গেছে। এখন যা কিছু করতে চাইব সে ঐ জোর করে পাওনা আদায়েরই সামিল হবে, মনের যোগ থাকবে না তবে একথা ঠিক দাতার কোন কৃপণতা নেই কেবল গ্রহিতাই শক্তিহীন।

চিন্তধারা যখন এলোমেলো বল্গাহীন ঘোড়ার মত ছোটে তখন একটা সিগারেট কিছু সাহায্য করতে পারে ভেবে একটা সিগারেট ধরালুম। আচ্ছা লীনা কি সত্যি একলাই এসেছে আমার সঙ্গে, না অন্য কেউ আমার অলক্ষ্যেও আমাদের উপর নজর রাখছে। এই সব পেশাদার মেয়েকে বিশ্বাস নেই। বলা যায় না সাগর সৈকতের এই নির্জ্জনতা হয়ত এতটা নির্জন নয়। দরজা, অথবা জানালার ছিদ্রে চোখ রেখে হয়ত কেউ রাতের উদ্দাম দৃশ্য দেখেছে। ক্যামেরার চোখে একের পর এক ধরে রেখেছে। পরে কোনদিন একটি একটি ছবি চোখের সামনে তুলে ধরে আমাকে স্বর্বশান্ত করে দেবে। না তাকি সম্ভব! পরিমল সেদিন বলছিল এদের ব্যবসারও একটা 'কোড অফ কনডাক্ট' একটা গুডউইল আছে। হতে পারে। জীবনে এই রকম একটা বিশ্রী ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব কোনদিন ভাবিনি। বর্তমানে আমরা সকলেই 'ফ্রাসট্রেটেড'। আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যা করতে চেয়েছি, দেশকে যা দিতে চেয়েছি তা পারিনি। টাকা দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে দিনের পর দিন একদল লোক আমাকে নিয়ে পুতুল খেলছে। বাড়ীতেও আমার

স্ত্রীর কাছ থেকে যা দাবী ছিল যে কোন কারণেই হোক পাইনি। আমারও যা দেবার কথা ছিল দিতে পারিনি। প্রচণ্ড হতাশা থেকে মুক্তি খুঁজেছি আমরা পান পাত্রে। কিন্তু মদ তো অনেকেই খায় তা বলে একটা নাচিয়ে ক্যাবারে গার্ল এনে কেউ কি দীঘায় রাত কাটায়? এই মুহূর্তে ঐ আসি'তে যদি আমার মত সমান পদ-মর্যাদা সম্পন্ন কোন মানুষ এসে বলত, হ্যাঁ আমিও তোমার দলে, তাহলে একটা 'মর্যাল সাপোর্ট' পেতুম। লীনাকে আরো ভাল লাগত। কিন্তু এ যেন কেমন নিজেকে নিঃসঙ্গ অপাঙ্‌তেয় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

পারিবারিক জীবনের ব্যার্থতাকে কাজ দিয়েই ভুলতে চেয়েছিলুম। নারী সঙ্গের বাসনা জাগতনা বললে ভুল হবে। কিন্তু এর ভিতর থেকে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন একটা পিতা, একটা স্বামী, একটা সামাজিক মানুষ সব সময় হঠকারীতাকে বাধা দিয়েছে; কিন্তু শেষকালে কি যে হল। ছাত্রজীবনে একবার দুবার কলকাতার কিছু কিছু লাল আলোর এলাকা দিয়ে ইচ্ছে করেই হেঁটে গেছি। কেমন একটা উত্তেজনা জাগতো। রাস্তাটুকু পেরোতুম মাথা নীচু করে নানা মন্তব্য আর ছুঁড়ে মারা গানের কলির মধ্যে দিয়ে। অবশেষে মনে হত ভীষণ ক্লান্ত, ঘাম জমে যেতো কপালে, কণ্ঠ তালু শুকিয়ে যেত ভয়ে। অথচ আজ এই যৌবনের শেষ ধাপে সেই রকমই একটি চরিত্রের মূল্যবান সংস্করণকে এই মুহূর্তে নাড়াচাড়া করছি, অ-পটু অনভ্যস্ত হাতে।

এই টোপ ঠিক কে আমাকে গিলিয়েছে, কার হাতে সুতো বা আমি নিজেই গিলেছি কিনা বলতে পারব না। কোন একটা 'বারে', কোন এক রাতের পরিচয়। সঙ্গে কে ছিল, আর কে কে ছিল মনে নেই। লীনা একটু পরেই ডায়াসে উঠে গিয়ে দুলে দুলে নেচেছিল শরীর অনাবৃত করেছিল। অনেক হাততালি কুড়িয়েছিল, শেষ রাতে মাতাল হয়েছিল।

জ্যোৎস্না তখন প্রায় পঙ্গু। একমাত্র অকৃত্রিম ভালবাসা ছাড়া তার আর কিছুই দেবার ছিল না। তখন লীনার একমাত্র ভালবাসা ছাড়া আর সব কিছুই দেবার ছিল অবশ্য যথোচিত মূল্যে। একবার দুবার দেখতে দেখতেই আলাপ। একদিন না দুদিন তাকে লিফ্‌ট দিয়েছিলুম। একটা দুটো উপহার। কেন দিয়েছিলুম জানি

না। দেবার আনন্দেই বোধহয় অথবা দেবার ক্ষমতা আছে বলে, নাকি, এই দীঘায় আসার প্রস্তুতি, আমার নিয়তিই বলতে পারবে।

কাঁচা সোনার মত রোদ উঠেছে। লীনা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, আমি একটু লাউঞ্জে বসে চা খেয়ে আসি। ঘরে চা দিয়ে যাক এটা আমি চাই না। ঘরটা এত অগোছালো হয়ে আছে। যেই আসুক না কেন চট করে বুঝে নেবে এটা স্ত্রীর ঘর নয়। অবশ্য ওরা অভ্যস্ত এ সব দেখে দেখে। কিন্তু আমি তো একেবারে আনকোরা নতুন এ লাইনে। লীনাই আমার হাতে খড়ি।

বীচ আমব্রেলার তলায় বসে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি পাশ থেকে গগ্‌লস চোখে এক সুন্দর ভদ্রলোক বল্লেন—সকালটা ভারি সুন্দর তাই না। কলকাতায় এমন একটা সকাল পাবেন না।

না তাতো পাব না, কেমন করে পাব।

নতুন নতুন কোন জায়গায় রাতে ঘুম আসে না। তারপর পুরোনো হলেই সব সয়ে যায়। কি বলেন ?

—হ্যাঁ সে তো ঠিক কথাই। উত্তর দিয়েই কেমন যেন সন্দেহ হল। কথাটার মধ্যে যেন অন্য একটা মানে আছে। তাকিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক মুচকি হাসছেন। ফর্সা মুখে সরু গোঁফ। কেমন যেন শয়তান শয়তান চেহারা, সাপের মত হিল হিলে। অবশ্য আমিও কিছু কম শয়তান নই। আমি কাঁচা আর ও যেন পাকা শয়তান।

চা-টা গরম। তা-না হলে এক চুমুকে শেষ করে ফেলে উঠে যেতুম। ভদ্রলোক বল্লেন 'সমুদ্র মানুষকে সজীব করে, যৌবন ফিরিয়ে দেয়। সমুদ্রের ধারে তাই পুরোনো সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই, সব সময় নতুন সাথী নিয়ে আসতে হয়, বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সেই শয়তানের ক্রুর হাসি। হঠাৎ নিজেকে মনে হল কাঁচের মানুষ, লোকটি যেন আমার ভিতরটা একোয়ারিয়ামের মত দেখছে। নিজেকে যেন কেমন অসহায় মনে হল।

ভদ্রলোক যেন অনেক দূর থেকে বল্লেন—'সমুদ্র আমাদের কাছে কিছু নেয় না। তাই সমুদ্রের ধারে আমরা যা খুশী তাই করতে পারি, যা খুশী তাই ফেলে যেতে পারি।' আর একবার সেই ধারালো হাসি।

বীচ আমব্রেলার তলা থেকে উঠে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। যা ভেবেছি তাই। লীনা একলা আসেনি।

এই সেই লোক যে আমাদের উপর নজর রেখেছে। ছায়ার মত অনুসরণ করছে। আমাদের সমস্ত গোপনীয়তা যার হাতের মুঠোর মধ্যে। এমনও তো হতে পারে আমার স্ত্রীর পাঠানো লোক অথবা অফিসের কোন শত্রু। কিম্বা আমার কোন প্রতিবেশী।

এই মুহূর্তেই আমাকে চলে যেতে হবে ঐ লোকটির থেকে দূরে। আজকের সমস্ত প্রোগ্রাম মাটি। ভেবেছিলাম শনিবার, রবিবার দুদিন থেকে চলে যাব। সেই ব্যবস্থাই ছিল। লীনার সঙ্গে একটা রাত কি যথেষ্ট! না, সারাদিন, সারারাত, এমনি করে যতক্ষণ না একেবারে পুরো ব্যাপারটার উপর বিতৃষ্ণা আসছে। তারপর কিছুদিন হয়ত বিরতি। আবার সেই ফিরে ফিরে আসা রক্তের উন্মাদনা। কান পাতলে যেন শোনা যাবে ধমনীতে ধমনীতে সমুদ্রের গর্জ্জন।

আলোর বন্যা বইছে ঘরে। লীনা এখনও শুয়ে আছে। একটা প্রচণ্ড ইচ্ছেকে মনের মধ্যে চেপে রেখে, জামা কাপড় পরে ফেল্লুম, দাড়ী কামানো ইত্যাদি পরে হবে। অন্য কোথাও অন্য কোনখানে। সেই সরু গোফ, রঙীন কাঁচ, ইস্পাত হাসি যেন আমাকে পেছন থেকে তাড়া করছে। লীনার সঙ্গে আর একসঙ্গে ফেরা যায় না, কারণ আমাদের উপর নজর রেখেছে। আমরা নজরবন্দী। লীনার জন্যে ভাবনা নেই, সে ঠিক ফিরে যাবে হয়ত ঐ লোকটির সঙ্গেই। কিম্বা তৈরি হবে কোন গভীর ফাঁদে আমাকে ধরাবার জন্যে।

'আমি চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কথা কটি একটা চিরকুটে তাড়াতাড়ি লিখে কয়েক শো টাকা সমেত তার বালিশের তলায় রেখে বেরিয়ে এলুল। ব্যালকনি থেকে সমুদ্র কত সুন্দর। তরঙ্গশীর্ষে সোনারোদ ঝলকাচ্ছে। দেখার সময় নেই, মন নেই। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলুম। বেরোবার মুখেই সেই ভদ্রলোক, সেই হাসি। 'গাড়ীতে এসেছেন তা ভালই। তবে ঐ দীঘা রোডে ভয়ানক এ্যাকসিডেণ্ট হয়।' খুব চিন্তা করতে করতে অথবা সমুদ্রের কথা ভাবতে ভাবতে কিম্বা সমুদ্র থেকে পালাতে চাইলে, কখন কি হয় বলা যায় না। গাড়ী ছুটছে, ছুটছে। মনে হচ্ছে আমার দেহ থেকে আমি মুক্ত হয়ে আরও আগে ছুটে চলেছি, কানের কাছে এখনও শুনিছ সমুদ্রের গর্জন।

আমি জানি, এই সময়টা আমার পক্ষে আর এক মুহূর্তও বাড়ি থাকা চলে না। যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে। তা না হলে নীতা হাতের কাছে যা পাবে তাই ছুঁড়ে মারবে। ঘরের সমস্ত জিনিস তছনছ করে ভাঙবে। আনলা থেকে কাপড় জামা নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে। তারপর আমাদের একমাত্র মেয়ে নীপাকে ধরে নির্দয়ভাবে মারবে। সবশেষে দেয়ালে কিম্বা মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে অজ্ঞানের মত হয়ে যাবে। পুরো ব্যাপারটা ঘটে যাবে খুব সহজে, পরপর, নাটকের সাজান দৃশ্যের মত। নীপা প্রথমে কাঁদবে মারের যন্ত্রণায়, তারপর কাঁদবে মা মরে গেছে ভেবে। মার পিঠের উপর ভয়ে ভয়ে মুখ রেখে মা মা বলে ডাকবে, দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে নীতার পিঠ ভিজিয়ে দেবে। কিন্তু নীতা এতই নিষ্ঠুর যে কিছুতেই সে কোন উত্তর দেবে না বরং নীপার এই ফুঁপিয়ে কান্নাটাকে উপভোগ করবে।

ওই রকম একটা দৃশ্যে আমি খুব বেমানান। আমার কিছুই করার থাকে না। নীতাকে শান্ত করতে গিয়ে আহত হয়েছি। কোন কোন দিন রাগ বেড়েছে। নীতার প্রচণ্ড জেদ, রাগ, অসভ্যতা যাই বলি না কেন, দেখে চরম একটা করার মুখ থেকে নিজেকে অতি কষ্টে ফিরিয়ে এনেছি। নীপাকে নিজের কোলের কাছে আনতে চেয়ে অবাক হয়েছি। দেখেছি নীপা যেন আমাকে কোন অচেনা লোকের মত দেখেছে। ভয়ে ভয়ে কাছে এসেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। বুঝেছি, একটা বয়স পর্যন্ত শিশুদের কাছে মায়েরাই বেশি নির্ভরশীল। সে মা যেমনই হোক।

আমি এখন সেই কারণেই ঝড়ের মেঘ দেখলেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। অন্তত এটুকু দেখেছি আমি নীতার চোখের সামনে থেকে সরে গেলে সে একটু শান্ত হয়েছে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর যে কোন একটা হাল্কা বই টেনে নিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়েছে। তারপর হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওই সময়টা নীপা জানালার উপর বসে বসে আপন মনে খেলেছে। আমি অনেক পরে ফিরে এসে দেখেছি ঘরে চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলছে, রেডিওর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর কেউই বন্ধ করে নি, চড় চড় করে আওয়াজ হচ্ছে। নীপা মেঝের উপর তার জন্মদিনে কিনে দেওয়া বড় মেয়ে পুতুলটাকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা আরশোলা তার ঠোঁটের পাশে শুঁড় নেড়ে নেড়ে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়া লালা চেটে চেটে খাচ্ছে। রান্না ঘরে বাসন, কাপ, গেলাস, চামচে, চায়ের কেটলি ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। দুধের ডেকচির ঢাকনা ফাঁক করে একটা বেড়াল দুধ চেটে নিচ্ছে। খাবার ঘরের টেবিলের উপর একটা ইঁদুর কোথা থেকে একটা রুটির টুকরো খেতে খেতে আমার আসার শব্দ শুনে পালিয়েছে।

আগে প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে, নিত্যানন্দের বাড়িতে গিয়েই বসে থাকতুম। নিত্যানন্দের কোয়ার্টার আমার বাড়ি থেকে মাত্র সিকি মাইলের পথ। যেখানে বিশাল জলের ট্যাঙ্কটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তারই গায়ে। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাগান মত আছে। নিত্যানন্দের বৌ শিখার নিজের হাতে তৈরি কেয়ারি করা বাগান। ছোট হলেও সুন্দর: ছোট্ট ছিমছাম পরিবার। জানলা, দরজায় সুন্দর পর্দা ঝুলছে। বসার ঘর সৌখিন করে সাজানো। কোণে একটা রেকর্ড প্লেয়ার। বুক কেসের উপর একটা রেডিও। শিখা ভীষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। ওদেরও একটি মাত্র ছেলে, আমার মেয়ের বয়সী।

নিত্যানন্দের এই সাজান শান্তির সংসারে দু দণ্ড বসতে ভালই লাগত। ভিতরের ঘরে শিখা ছেলেকে পড়াত। তারই ফাঁকে কফি করে দিত, কৌটো থেকে নিমকি বের করে ডিশে সাজিয়ে দিত। আমরা দুজনে বসে বসে শিকারের গল্প করতুম। কবে সেই রিজার্ভ ফরেস্টের কাছে একটা ম্যানইটার বেরিয়েছিল, সেই গল্প। গল্পটা হাজার বার শোনা, তবুও শুনতে ভাল লাগত। নিত্যানন্দ চুরুট ধরাত, আমি সিগারেট। শিখা এক সময় নিত্যানন্দের পায়ের তলায় গরম জলের একটা বাথটব বসিয়ে দিয়ে যেতো পা ডোবাবার জন্যে। নিত্যানন্দ ইদানিং আর্থাইটিসে একটু কাবু হয়ে পড়েছিল। এই সময়টা সে একটু স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করত।

দেখতে দেখতে রাত বাড়ত। শিখা ছেলেকে নিজে হাতে খাইয়ে কপালে একটা চুমু দিয়ে বিছানায় মশারি ফেলে শুইয়ে দিয়ে আমাদের কাছে এসে একটু বসত। একটা তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে নিত্যানন্দের পা মুছিয়ে পাউডার দিয়ে দিত। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলত একদিন সস্ত্রীক মেয়েকে নিয়ে আসুন না। কিম্বা চলুন না একদিন নদীর ধারে শাল বনে গিয়ে পিকনিক করি। আর তখনই আমার নীপার কথা মনে পড়ত। কী করছে এখন মেয়েটা, বাড়িতে একা একা। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্যে উঠে পড়তাম। নিত্যানন্দর বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশান ঘুরে আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ঢুকতাম আর সেই একই দৃশ্য চোখে পড়ত।

ইদানিং নিত্যানন্দর বাড়িতে আর যাই না। ওর ওই শান্তির সংসারের সঙ্গে নিজের সংসারের তুলনা করে বড় কষ্ট পেতে আরম্ভ করেছিলুম। তাছাড়া সে সেময় নিত্যানন্দ হয়ত একলা গৃহসুখ পেতে চাইছে সেই সময় তৃতীয় কোন ব্যাক্তির উপস্থিতি অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুখ ফুটে বলতে পারে না চক্ষুলজ্জায়।

এখন আমি সোজা স্টেশনে চলে আসি। প্রথমে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াই। খালি বেঞ্চি পেলে মাঝে মাঝে বসি। আশে পাশে যাত্রীরা অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্যে। সকলেই যাবার জন্য ব্যস্ত। মোটঘাট সামলাচ্ছে, সিগন্যালের দিকে তাকাচ্ছে। আবার যারা ট্রেন থেকে নামে তারাও দাঁড়ায় না। প্ল্যাটফর্মে কেউই থাকে না, থাকতে চায় না। ভিড় খালি হয়ে যাবার পর দেখতাম, দুটো কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একেবারে শেষ মাথায় একটা বুড়ি গাছের তলায় আস্তানা নিয়েছে। ভাঙা টিনের মগ, চটা উঠা এনামেলের থালা পাশে ছড়ানো।

স্টেশনের ব্যস্ততা, ট্রেনের আসা যাওয়া কমে এলে, আমি সোজা সিঁড়ি ভেঙে ওভারব্রিজে উঠে যেতাম। মনে হত আকাশের অনেক কাছে চলে এসেছি, হাত বাড়ালেই নাগাল পাব। চোখের সামনে পুরো রেল টাউনটা ভাসছে। ওইতো সেই বড় জলের ট্যাঙ্কটা, কদিন হল অ্যালুমিনিয়াম রঙ করেছে! ছবির মত সাজান বাড়ি। সোজা সোজা পরিষ্কার পিচের রাস্তা চলে গেছে। এক একটা বাড়ির সামনে ছোট বাগান, কাঠের গেট। সমস্ত বাড়িতেই

আলো জ্বলে উঠেছে। ওভারব্রিজে লোক চলাচল খুবই কম। পা ঝুলিয়ে বসতে বেশ ভালই লাগে। নিচে সারি রেল লাইন বহু দূরে চলে গেছে। আকাশের গায়ে ঝাপসা একসার পাহাড়ের রেখা আটকে আছে। ওই পাহাড়ের কোলে একটা নদী আছে। আমি যখন প্রথম এই রেল শহরে আসি, নীপা তখন খুব ছোট। নীতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখনও এতটা তিক্ত হয়ে ওঠে নি। আমরা সকলে মিলে এক শীতের সকালে ওই পাহাড়ের কোলে পিকনিক করতে গিয়েছিলুম। সেই সব দিন কোথায় হারিয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় সেবার এক সাধুর আস্তানা দেখে এসেছিলুম। একেবারে মৌনী। মাঝে মাঝে সিগারেট খান দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পাশে একটা স্লেট পেন্সিল ছিল। কোন দেশের মানুষ তিনি, বোঝা শক্ত ছিল। আমার মনে হয়েছিল তিনি দক্ষিণ ভারতের। কি খেয়াল হয়েছিল স্লেটে প্রশ্ন লিখেছিলাম— ঈশ্বর কি? তিনি উত্তরে লিখেছিলেন—শান্তি। আমি লিখেছিলাম কিসের অনুসন্ধান? উত্তর পেয়েছিলাম শান্তির অনুসন্ধান। অস্পষ্ট মনে পড়ে আরো যেন কি সবলেখা হয়েছিল। অতীত হল, বিস্মৃতি। ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত। বর্তমানটাই সব। মানুষ হল, পরিস্থিতির দাস। ঈশ্বর হলেন পরিস্থিতির স্রষ্টা।

ওভারব্রিজে বসে বসে সবার আগে আমার সেই সাধুর কথা মনে পড়ত। চোখেভাসত তাঁর সেই অনায়াস বসে থাকার ভঙ্গি— হাতের ফাঁকে সিগারেট, চোখ দুটো কোন সুদূরে আটকান। সেই সময়ে তিনি এই রকম একটা কথা বলেছিলেন—সাধুরা কোন ঘটনাকে আশ্রয় করে থাকে না। ঘটনার স্রোত অনেকটা দূর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। ওভারব্রিজে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে থাকতে মনে হত কথাটা খুব সত্যি। ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে এই যে জগৎ সংসারের মাথার উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছি কেমন শান্তি! মাথার উপর ঝুঁকে আছে আকাশ যেন তারার চাঁদোয়া। হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়া। অথচ ওই রেল শহরের কোন এক খুপরিতে যে ঘটনা ঘটতে চলেছিল তার মধ্যে থাকলে এই অনায়াস বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

বসে বসে অনেক কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের ঘর

তার সংসার, মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। নিত্যানন্দের ফুলো ফুলো তৃপ্ত চেহারা। ছিমছাম সাজান ঘর। হাসি খুশী বৌ। ফুটফুটে ছেলে। সাধু বলেছিলেন—সুখের অনুভূতি বড় ভোঁতা। সুখের মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষের অনুভূতি ঘুমিয়ে পড়ে! নিত্যানন্দকে দেখে অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। দুঃখের অনুভূতিকে তিনি বলেছিলেন ধারালো। সব সময় মানুষকে ধারালো ফলার উপর দাঁড় করিয়ে রাখে। মানুষ তখন ঘুমিয়ে পড়ে না।

হঠাৎ সিগন্যাল নামল। ট্রেন আসছে। একটু পরেই আমার পায়ের তলা দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেন তার বিরাট সরীসৃপ দেহকে গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। অসংখ্য জীবন তার জঠরে। সকলেই একটা জায়গায় পৌঁছোতে চায়। সেই জায়গাটাই কি শান্তি? বহুদিন ধরে এই শেষ এক্সপ্রেস আমার পায়ের তলা দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ট্রেনটা চলে গেলেই আমার কি রকম মনে হয়, একদিন কেউ একজন এই স্টেশানে নামবে। নেমে আমার খোঁজ করবে। আমাকে নিয়ে স্টেশানের একটা বেঞ্চিতে বসে বলবে— এই তোমার জন্যেই খুঁজে খুঁজে এলাম। শোন জীবনে যে সব ঢিল তুমি ছুঁড়ে দিয়েছ—সেই সব ঢিল ফিরিয়ে আনার কৌশল আমার জানা আছে। যে সব দুধ তুমি ছড়িয়ে ফেলেছ সে সব দুধ আবার আমি বোতলে ভরে দেবো। তখন তোমাকে আর এভাবে ওভারব্রিজে বসে থাকতে হবে না। তুমি নিত্যানন্দের মত নিজের বাড়িতে চেয়ারে বসে বসে গান শুনবে, হাত বাড়িয়ে তোমার স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে পারবে। তোমার সব স্বপ্নকে পাশাপাশি রেখে একটা অসাধারণ জাজিম বুনতে পারবে।

দু চোখ আশায় ভরে এল। তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শুধু আকাশ দেখেছি, দেখেছি অজস্র তারার ছড়ানো চোখ। শেষ ট্রেন সেই কখন চলে গেছে। নিঝুম প্ল্যাটফর্ম। একটা একটা করে সিঁড়ি গুনে গুনে ওভারব্রিজ থেকে নেমেছি। আমার আগে আগে চলেছে একটি ছোট্ট মেয়ে।

তোর জন্যেই নামতে হল। আর একটু বড় হয়ে যা। তখন ওই যে ট্রেনটা যেখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, নদীর জলে ছায়া ফেলে ফেলে চলে গেল, ওই পথে আমিও যাব। দেখবি সেখানে

হয়ত আমি খুঁজে পেয়ে যাব একটি শান্তির জলাশয়, সেখানে সারা রাত শান্ত জলে হাঁসের মত ভাসব, দেখব সারা রাত নিঝুম পৃথিবীতে কেমন করে ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ে, কেমন করে একটি পদ্মের কুঁড়ি সারা রাত ধরে একটি একটি করে পাপড়ি খুলে সূর্যের জন্যে চোখ মেলে। আমি তখন বলতে পারব কেমন করে এই পৃথিবীর আকাশের তলায় সারা রাত ধরে ফুল ফোটার আয়োজন। সব শব্দ কেমন করে এক শব্দহীন সাগরে আস্তে আস্তে ডুবে যায়।

ট্রেন

শীত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন শুধু শেষ রাতের দিকে হাওয়ায় একটু কামড় থাকে। তা না হলে দিনের বেলায় বেশ গরম। ধুলো ওড়ে চারিদিক ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাছেরা এখন কেমন শ্রী হীন, বিরল পত্র। আর কিছুদিন পরে নতুন পাতা আসবে, তরল সবুজ নিয়ে। তখন সব সবুজে সবুজ। এদিককার বনানীতে আগুন ধরে যাবে।

এদিকে ট্রেন কখনই সময়ে আসে না। এক আধ ঘণ্টা লেট তো কিছুই নয়। মাঝে মাঝে তিন চার ঘণ্টাও লেট থাকে। আজ বোধহয় সেই রকম একটা দিন। ঘড়িতে এখন রাত একটা। কালো বোর্ডে সাদা খড়ির লেখায় বোঝা গেল, রাত তিনটের আগে এখান ছেড়ে যাবার কোন আশা নেই। নিঝুম স্টেশান। এই সব স্টেশানের তেমন গুরুত্ব নেই। লাইনের পাশে পড়ে থাকে। সারাদিনে একটা দুটো ট্রেন কিছুক্ষণ থেমেই চলে যায়। একজন, দুজন যাত্রী কখন নামে, কখন ওঠে। কোনো কোনো দিন যাত্রী থাকেই না। ট্রেনের থামা নিয়ম তাই প্রথামত থামে। অথচ এই রকম একটা জায়গায় জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়ে যাচ্ছি ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

টিনের চালা গৌরবে যার নাম ওয়েটিং রুম, সেখানে আজ দুজন যাত্রী, কি ভাগ্য! ফাঁক ফাঁক কাঠের বেঞ্চিতে বিছানার পুঁটলি ভর করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দূরে বকুল গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে আপাদ-মস্তক সুতোর কম্বল জড়িয়ে কে একজন শুয়ে আছে। সে বোধহয় যাত্রী নয়, ভবঘুরে মানুষ। তাই টিকিটকাটা যাত্রীদের ওয়েটিং চালার বেঞ্চি দখলে নৈতিক সঙ্কোচ।

ঘণ্টা দুয়েক মাত্র মেয়াদ। তারপর আমি চলে যাব। আর কি কোনদিন আসবো এখানে? মনে হয়, না। কেন আসবো এখানে! কি করতে আসবো! এতো বেড়াতে আসার জায়গা নয়। অথচ ছেড়ে যেতে এখন যেন কেমন মায়া লাগছে। প্রথম যখন এসেছিলাম তখন কি ভীষণ খারাপ লাগতো! কলকাতার ছেলে। মন বসত

না কিছুতেই। মনে হত যেন নির্বাসন। তারপর সব কিছুই কেমন সয়ে গেল।

একটু মুচকি হাসলুম। অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গেই যেন অনেক কালের পুরোনো কথা! অনেক দূরে থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকল—অশোক! চমকে উঠলাম। গলাটা মনে হল খুব চেনা। তারপর বুঝলাম, এ আমারই গলা! আমার সেই তরুণ বয়েসের গলা। তরুণ অশোক প্রৌঢ় অশোককে ডাকছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিলুম—কি বলছ? বলেই যেন হাসতে ইচ্ছে করল, কি পাগলামী! ফেলে আসা জীবন কি কখনো ডাকতে পারে! মানুষ কি কখনো সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে! এক একটা টুকরো কা ফুলের মত কিম্বা খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে সময়ের স্রোতের ভাঁটি পথে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলে! কি জানি। আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনেছি, কে আমাকে ডেকেছে!

সারা প্ল্যাটফর্মে একটা কি দুটো আলো জ্বলছে, মিট মিট করে। গাছের তলায় একটা খালি বেনচি। কতক্ষণ দাঁড়ানো যায়! কতক্ষণ পায়চারি করা যায়। বসে পড়লুম। বসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল পাশে যেন আর একজন কেউ বসল, শুধু বসল না, বসেই একটা হাত রাখল আমার কাঁধে। কে তুমি? তুমিও অশোক। অশোক আবার হাসল। বকুল গাছের পাতার ছায়া নিয়ে আলো কাঁপছে তার মুখের ওপর।

—তোমাকে তো বেশ সুন্দর দেখতে ছিল অশোক!

—বলছো? তাহলে সুন্দরই ছিলাম হয়তো! এককালে শরীর চর্চা করতুম- তাছাড়া তোমার মাও তো ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন।

—ঠিক বলেছো! কেয়াতলার বাড়িতে হয়তো এখনো তাঁর ছবি ঝুলছে! তোমার মুখে এখনো কিন্তু আমার মুখের ছাপ লেগে আছে। তবে চুলগুলো তোমার ভীষণ পেকে গেছে!

—তা বয়েস হয়নি আমার! বয়েসে ওসব হবেই।

অশোক শরীরটা তোমার বেশ দুর্বল হয়ে গেছে, তাই না!

—তা ঝড় ঝাপটা তে জীবনের উপর দিয়ে কম গেল না হে। তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার ছেলে!

—আপত্তি কি! তাই না হয় ভাবলে। তবে তোমাকে দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

—সে কি! কষ্ট হচ্ছে কি! এ অশোক তো তোমারই সৃষ্টি। এক অর্থে বলতে গেলে তুমিই তো আমার আর এক পিতা। হাসছো কেন? আজকের আমি তো কালকের আমিরই সৃষ্টি। তাই না? আমি তোমাকেই দোষী করছি। তুমি, তুমি, তুমিই তো!

—উত্তেজিত হয়োও না। তোমার সিগারেট নিভে গেছে। ধরিয়ে দোবো।

দুই অশোক পাশাপাশি বসে আছি সেই নির্জন স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায়।

—আচ্ছা অশোক তোমার কি মনে হয় না, তুমি জীবনে অনেক ভুল করেছো, এমন সব রাস্তায় মোড় নিয়েছো, যার ফলে তোমার আজ এই অবস্থা।

—হাসালে অশোক। ভুল করি আর যাই করি না কেন সব তো তোমাতেই ফেলে গেলাম। আমি এখুনি চলে যাবো, এক ঘণ্টা, কি দু ঘন্টা পরে। আমি তো তোমাকে ছেড়েই চলেছি, বাকিটা পথ তো আমাকেই যেতে হবে, ভুল করি আর ঠিক করি তোমার তাতে কি এসে যায়!

—অশোক, তুমি একবার এই অশোকের দিকে ফিরে তাকাও, দেখ এক সময় তুমি কি রকম ফুলের মত টাটকা নবীন ছিলে। তোমার আশাগুলোকে কী একবার তোমার সামনে ছড়িয়ে দেবো তাসের মত!

—না না এই অন্ধকার রাতে ওই সব পুরোনো জিনিস নিয়ে নাই বা আর ঘাঁটাঘাঁটি করলে। সব গাছেই কি সব ফুল ফোটে? সব পাখিই কি আর মিঠে সুরে গান গায়!

—আচ্ছা, আচ্ছা তোমার কথাই না হয় মানছি। তোমাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখছি। বড় ইচ্ছে করছে তোমার মা হয়ে তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দি।

—সে কি অশোক? তোমার মধ্যে একসময় এতো মমতা ছিল? এখন তো সে কথা বিশ্বাস করাই শক্ত।

—মানুষের স্মৃতি বড় বিশ্বাসঘাতক অশোক! শক্ত মাটির

দিকে তাকালে একবারও কি মনে হয়· গভীরে স্বচ্ছ শীতল জলের ধারা আছে।

—তা ঠিক, তা ঠিক অশোক, কিন্তু তুমি যে এককালে এত গভীর তাত্ত্বিক ছিলে তাতো জানতুম না।

—সেইটাই তো মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, অশোক। তোমার মনে পড়ে কি ? আমি একটা গান গাইতুম যার একটা লাইন ছিল এই রকম—'আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া আঁধারে মরি গো ঘুরিয়া।'

—ঠিকই তো। এক সময়ে তুমি গান গাইতে, অভিনয় করতে, কবিতা, গল্প লিখতে, এমন কি প্রেম করতে !

—তোমাকে দেখে এখন কিন্তু তা মনে হয় না। কি তোমার চেহারা হয়েছে ! সামনের চুল পাতলা, গাল ঢুকে গেছে, চোখ বসে গেছে। থেকে থেকে ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাসছো।

—তোমার কিন্তু একটা ভীষণ দোষ ছিল অশোক, সব কিছুই তুমি মাঝপথে ছেড়ে দিতে কেন ? পড়াশোনায় ভাল ছিলে অথচ যতদূর লেখাপড়া করা উচিত ছিল করলে না। নিজের কেরিয়ারটা নষ্ট করলে। যার ফলে এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে আমাকে এনে ফেললে সামান্য চাকরির সামান্য মাইনেতে জীবন কাটালে কোনো রকমে।

—আপশোস করছ কেন ? তখন তুমিও তো ঘুরতে ফিরতে বলতে, কনটেণ্টমেণ্ট, কনটেণ্টমেণ্ট।

—কি করবো, তখন ঐ বলেই নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতুম।

—তাই নাকি ! কি সাংঘাতিক কথা। তোমার মধ্যে তাহলে ফ্রাসট্রেসান এসে গিয়েছিল, আর সেইটাই তুমি এখন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে।

—তুমি তো আমারই সৃষ্টি ! অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে কি ! পাছে ভুলে যাও তাই যাবার আগের মুহূর্তে তোমার পাশে এসে কাঁধে হাত রেখে বসেছি।

—আমি কিন্তু তোমাকে ভুলে যেতে চাই। তুমি আমার ভুল, তুমি আমার হতাশা, তুমি আমার আলস্য।

—সে কি ! এখন এ কথা বলছো কি করে ! স্টেশনের অদূরে ওই টিনের ঘরে জীবনের এতগুলো বছর ফেলে যাচ্ছ, তখন তো

নিজের মধ্যে কেমন একটা সুখ সুখ ভাব ফুটিয়ে তুলতে ! তুমি তা হলে একজন অভিনেতা ছিলে বল !

—তোমার দিকে তাকিয়ে আমার তোতাই মনে হচ্ছে। তোমার সেই চন্দ্রা এপিসোড ! ভাবলে হাসি পায়। সারাটা জীবন একটা মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে করে কাটিয়ে দিলে ! কি তোমার অদ্ভুত রোমান্টিকতা ! এখন কেমন লাগছে ! এই তোমার নিঃসঙ্গ জীবন, একা একা ঘুরে বেড়ানো।

—'তোমার' বলছ কি. বল আমার। তুমিই তো আমাকে উপহার দিয়েছো আমার এই জীবন। আমি এখন যা সে তো তোমারই খেয়ালের সৃষ্টি। তুমি তো চলতে চলতে আমাকে এইখানে এনে ফেলেছো। তোমার ওপর এখন আমার অসহ্য রাগ হচ্ছে তুমি আমাকে এতদিন ধাপ্পা দিয়ে এসেছো. আজ এসেছো আমার সঙ্গে রসিকতা করতে ! তোমার হাতটা আমার কাঁধ থেকে সরিয়ে নাও।

—এখন আর রাগারাগি কেন ? এখনও কেন নিজেকে এইভাবে বোঝাওনা—পাষ্ট ইজ পাষ্ট, অতীত অতীতই। অতীতের জন্যে অনুশোচনা কেন ?

—আমার কি মনে হচ্ছে জানো, আমি তোমার হাতেই বন্দী ছিলাম এতকাল, এখন মুক্তি পেয়েও বন্দী। এ বন্ধন দশা আমার ঘুচবে না। আমি যেখানেই যাই না কেন তুমি আমার পাশে পাশেই থাকবে।

চেষ্টা কর আমাকে ভুলতে, আমার কাছ থেকে পালাতে। তুমিই তো বলতে, না আমি বলতাম ? মুক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কটা বাজলো ?

—তাই তো বাজল কটা ? এতক্ষণ ঘড়ি দেখিনি। একটার বেশী সিগারেট খাইনি। শীত শীত করছে, তবুও ব্যাগ থেকে চাদর বের করে গায়ে জড়াইনি। অল্প আলোয় ঘড়ি দেখে মনে হল সময় প্রায় কাটিয়ে এনেছি। এখুনি দূরে আউট সিগন্যালের কাছে ইঞ্জিনের লাল চোখ দেখা যাবে।

—অশোক ?

এ কি ? কখন সে পাশ থেকে উঠে চলে গেছে। এই তো একটু আগে সে কাঁধে হাত রেখে বসেছিল।

—অশোক ?

রাতের হাওয়ার ঝাপটায় বকুল কাঁপল। কোথায় কোন ঝোপ থেকে পেঁচা ডাকল। দূরে স্টেশনের ওপার থেকে একটা কুকুর কেঁদে উঠল। চারিদিক কাঁপিয়ে ট্রেন এসে ঢুকলো স্টেশানে। অশোকের কোন সাড়া পেলুম না। সে কখন নিঃশব্দে উঠে কতদূরে চলে গেছে। ট্রেনে উঠে জানলার ধারে বসে শেষবারের মত বাইরে তাকাতেই দেখলুম, বকুল গাছের আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে অশোক হাসছে দূরে পশ্চিম আকাশে একফালি চাঁদ হেলে আছে।

—এসো উঠে এস তুমিও। আমি একলা যাবো নাকি!

অশোক শব্দ করে হাসল, তাতে কি হয়েছে! আমিও তো একলাই এসেছিলাম, এখানে একলাই থেকে যাবো তোমার স্মৃতি নিয়ে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সে চেঁচিয়ে বলল, চন্দ্রাকে বোলো আমি তোমাকে উপহার দিলাম তার কাছে।

—কোথায় তার দেখা পাবো ?

—যদি কোনদিন কোনো মানুষের মিছিলে তাকে খুঁজে পাও, এই কথা বোলো যদি চিনতে পারো নিঃশব্দে তার সামনে দু দণ্ড দাঁড়িয়ো তাহলেই সে বুঝে নেবে ঠিক।

এরপর আর কিছু শোনা গেল না। ট্রেন একটা ব্রিজে উঠে গম-গম শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল।